শিবরাম চক্রবর্তী

শিব্রাম সংগ্রহ ২



ভূমিকা

বইখানি ভালো কি মন্দ, উপন্যাস এবং art হিসাবে ইহার স্থান কত উচ্চে বা কত নিম্নে এসকল সম্বন্ধে আমি কিছুই এখানে বলিব না। তাহার বিচার সমালোচকেরা করিবেন, ভূমিকা সমালোচনা নহে। কিন্তু এই পুস্তকে এমন কতকগুলি কথা আছে—ছেলেদের কৈশোর- জীবনের কথা, তাহাদের নির্ম্মল এবং অনাবিল ভালবাসার কথা এবং তাহাদের নানারূপ কদর্য্য অভ্যাসের কথা—যাহা সকলের, বিশেষতঃ ছেলেদের অভিভাবকগণের জানা এবং আলোচনা করা বিশেষ আবশ্যক। অভিভাবক, শিক্ষক এবং গুরুস্থানীয়গণ যে ইহা জানেন না তাহা নহে; কিন্তু কেহই মুখ ফুটিয়া এবিষয়ে কিছু বলিতে চাহে না; শুধু বলিতে চাহেন না এমন নহে এ বিষয়ে ভাবিতে বা ইহার কোনও প্রতিবিধানের উপায় উদ্ভাবন করিতেও চাহেন না। চোখের সামনে অহরহ যেটা ঘটিয়া যাইতেছে শিক্ষক ও অভিভাবকগণ দেখিয়াও তাহা দেখিতেছেন না, তাহার দিকে সকলে চোখ বুজিয়া আছেন, যেন জিনিষটা নাই। ফলে পাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া জটিল সমস্যার আকার ধারণ করিতেছে। ছাত্রগণের স্বাস্থ্য, শক্তি, মেধা ও অন্তরের তেজ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে; এবং আজ ইহার সম্যক আলোচনা না করিলে ভবিষ্যতে বিপদের কথা।

ব্যাপারটা শুধু moral তাহা নহে, ইহা কতকটা physiological-ও বটে। ইহাকে শুধু দুর্নীতি বলিয়া তাড়না করিলে চলিবে না, রোগ বলিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে অনেক চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছেন; আমাদের শিক্ষক ও অভিভাবকগণের উচিত যে তাঁহারাও এই চিন্তারাশির সহিত নিজেদের পরিচিত করেন।

কথা উঠিতে পারে উপন্যাসের আকারে এরূপ প্রকাশ্যভাবে ইহা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা কি ইহার প্রতিবিধানের প্রকৃষ্ট উপায়, ইহাতে কি দুর্নীতি আরও বাড়িয়া যাইবে না? একপক্ষে এরূপ অভিযোগ সমস্ত উপন্যাসের বিরুদ্ধেই আনা যাইতে পারে, এবং ইহার সোজাসুজি কোনও জবাব নাই। সত্যকে গোপন না করিয়া তাহার যথাযথ প্রকাশে কুফল অপেক্ষা সুফলেরই বেশি সম্ভাবনা। গ্রন্থকার জানেন যে এরূপ বই লেখার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট গালাগালি খাইতে হইবে; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সত্য এবং কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। আমি তাঁহার সাহস ও সত্যপ্রিয়তার প্রশংসা করি।

ছেলেদের মধ্যে ভালোবাসা হইলেই যে সেটা কদর্য্য হইবে এমন কোনও কথা নহে, তাহা পবিত্র, সুন্দর ও মনোরম হইতে পারে। লেখক প্রশান্ত ও মোহনের ভালবাসায় ইহা দেখাইয়াছেন, এবং এই চিত্রটি আমার কাছে বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে।

লেখক schoolএর boarding house-এর যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা কতকাংশে সত্য হইলেও উৎকট, ইহাতে prportion ঠিক রক্ষা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা যে কম ইহা যেন কেহ না মনে করেন।

কিরূপে ছেলেরা বিপ্লববাদীদের দলে মেশে লেখক তাহারও আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু boarding house এবং ছেলেদের ভালবাসার চিত্র যেমন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এ অংশ তেমন জমে নাই। বোধ হয় এখানে লেখকের so-called imagination. বাঙ্গালার ছেলেরা যাহাতে বিপ্লববাদীদের কবলে পড়িয়া ভুলপথে পরিচালিত না হয়, এবং নিজেদের জীবনে সর্ব্বনাশ না ডাকিয়া আনে ইহাই গ্রন্থকারের আন্তরিক উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিপ্লব ও পল্লীসংগঠন বইখানির ভিতরের কথা নহে। ছেলেদের ভালবাসা এবং তাহার অমৃত ও বিষময় ফল ইহাই গ্রন্থকারের প্রধান আখ্যান বস্তু, —কল্পনা ও লিপিচাতুর্য্যের সাহায্যে তিনি ইহার উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সামনে ধরিয়াছেন। আমি পুস্তকের সাফল্য কামনা করি।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচয়

(১)

বাঙালীর তরুণ বয়সের রহস্যময় পৃষ্ঠাটি এই গ্রন্থে যথাযথ ও যথার্থ ভাবে আঁকতে চেষ্টা করেছি। আমাদের সাহিত্যে এর আগে এবিষয়ে হয়ত কেউ লেখেননি। সাধারণত নায়ক-নায়িকার যৌবন থেকে শুরু হয়ে বিয়ের পরই উপন্যাস জমে উঠে,—কিন্তু তার আগেও যে মানুষের জীবনে রহস্য-দেবতার দানের কার্পণ্য কিছুমাত্র নেই এইটেই আমি দেখাতে চেয়েছি। প্রত্যেক ঘরেই কিশোর ও তরুণ রয়েছেন, —প্রত্যহ এক সঙ্গে বাস করেও আমরা তাদের বিচিত্র মনস্তত্ত্বের সন্ধান পাই না, তাদের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের রহস্যালোকে যে পরিণত মানুষের পরিপূর্ণ চরিত্রখানি নিয়ত আকার পাবার চেষ্টা করচে, অনুক্ষণ রূপ ও রসে সঞ্জীবিত হতে চাচ্চে তা আমরা জানিনে। অনেক সময়েই হয়ত তাদের আমরা বুঝতে পারি না, এবং তার জন্য অনেক সময়েই তাদের বিকাশ ও প্রকাশ লাভের আবেদনকে ব্যর্থ করে দিই।

মানুষের জীবনে পরম সার্থকতা ও চরম ব্যর্থতার সূচনা হয় এই ছেলে বয়সেই; নানা ঘটনার মধ্যে নানাভাবে চালিত হয়ে ছেলেদের বিচিত্র চরিত্র গড়ে ওঠে—তারা ছেলেবয়সে যা ভাবে, যা পড়ে, যেমন জীবন যাপন করে, পরবর্তী জীবন যেন তারই ছায়া তারই অনুসরণ,—যেন ছেলেবেলার অগোচর অস্পষ্ট কামনাটিকেই তারা সারাজীবন রেখায় রেখায় রঙীন রূপ দিয়ে চলে। তরুণ জীবন দুহিসেবে দামী,—(এক,) একবার গেলে আর পাওয়া যায় না, (দুই,) তার বিনিময়েই আমরা ভাবী জীবনের ভালোমন্দ যা কিছু পাই। জাতির কৈশোরেই জাতির ভবিষ্যতের আভাস, জাতির অনাগত পরিচয়।

(২)

যেমন সব বয়সে, তেমনি ছেলেবয়সেও (মানুষ বড় বড় ভুল করে) যার জের তাকে মৃত্যু পর্য্যন্ত টেনে চলতে হয়। যে সব ছেলে নিতান্ত ভাগ্যবশে Heredity-র ফাঁড়া কাটিয়েও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য নিয়ে পৃথিবীতে আসে, তাদের অনেকেই ছেলেবয়সের environment-এর চাপে পড়ে আর অক্ষত থাকেনা,—জীবনের দুর্লভ সম্পদ জীবনের গোড়াতেই বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। ছাত্রাবাসের ছেলেদের যে ছবি এই বইয়ে এঁকেছি তা হয়ত অনেকেরই অস্বাভাবিক ও অতিরঞ্জিত মনে হবে, তার একমাত্র কারণ তাঁরা বর্তমান ছাত্রজীবনের সঙ্গে পরিচিত নন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই সর্বনাশের যতটুকু

আভাস ইঙ্গিতে দেওয়া চলে তার বেশি কিছুই আমি প্রকাশ করিনি, করতে সাহস করিনি। আমার মনে হয় আমাদের দেশে দৈহিক মানসিক ও অন্যান্য দিক দিয়ে ছেলেদের জীবনের সমস্যাটা যত জটিল হয়ে পড়েচে এবং সকলের আন্তরিক সাহায্য দাবী করচে এমন আর কিছু নয়। এদিকে চিন্তাশীল, দেশকর্মী এবং সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমি প্রয়োজন মনে করেছিলাম।

তারেসের চরিত্র একটা আজগুবি কিছু নয়ত মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান এই ধরনের চরিত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে বলেই নয়, বাস্তবিকই এটা সত্য— রক্তমাংসে সজীব। আমাদের সমাজ-জীবনের কোথায় গলদ রয়েচে যাতে করে তারেশের মত একটি দুটি নয়, অসংখ্য লোকে আমাদের সমাজ ছেয়ে গেচে, তা আমাদের অবিলম্বেই খুঁজে বের করতে হবে। এই বিষয়ের যদি উপযুক্ত অনুসন্ধান ও প্রতিকার না হয় তাহলে এই জীবনের-গোড়ায় ঘুনধরা জীর্ণ জাতি, তার অতীত গৌরবের সব স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের মহিমার সব স্বপ্ন নিয়েই একদিন একান্ত ব্যর্থতায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবে। দুর্নীতি বা অনুরূপ অন্য কিছুর অজুহাতে সমাজ-শরীরের মৃত্যু-ক্ষতকে আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখার কোনোই সমর্থন নেই, বরং সময়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুচিকিৎসায় তাকে বাঁচাবার সমূহ প্রয়োজন আছে।

যা সত্যিসত্যিই সত্য তাকে নেই বল্লেই বা চোখকান বুজে থাকলেই তো তা আর মিথ্যা হয়ে যায় না। বরং এই অস্বীকারের ভাবী বিপদ কতখানি সেইটে উপলব্ধি করে এর সংস্কারে হাত দেওয়াই আমাদের উচিত নয় কি? হয়ত এই বাস্তবিক সত্য কথা বলার গুরু অপরাধে সাহিত্যের আদালতে আমাকে অভিযুক্ত হতে হবে এবং হয়ত গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবু আমার এই অনুরোধ, ইবসেনের Enemy of the people এর বাঙলা অভিনয় করেই যেন সমালোচকদের দায়িত্ব শেষ না হয়,—বরং আমার যথেষ্ট নিন্দা করেও এই বিষয়ে যা আমার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য—সেই ছেলেদের যাতে সত্যিকার কল্যাণ হয়, ছাত্রাবাসগুলির প্রকৃত সংস্কার ঘটে, ছাত্রদের দৈহিক মানসিক পরিপূর্ণতা সাধিত হয় সেদিকে তাঁদের সহানুভূতি ও ব্যবস্থা দিয়ে যেন যথার্থ কর্তব্য পালন করেন এই আমি একান্ত মনে আকাঙ্ক্ষা করি।

(৩)

তারপরে সুধীরের জীবনের ট্র্যাজেডি। ছেলেদের জীবনের একদিকে যেমন আসক্তি ও লালসা, অন্যদিকে তেমনি মৈত্রী ও ভালোবাসা। একদিকে যেমন দেশভক্তি ও জনসেবার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তেমনি দুঃসাহস ও বিপ্লবের দিকে ঝোঁক,—সতীশ ও সুধীর দুজনে এই দুটি ধারার বিকাশ ও পরিণতি। সুধীর ছেলেবেলা থেকে বিপ্লবের ভ্রান্ত পথে চলে অবশেষে গুপ্ত হত্যার ফলে ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিল,—কেবল বৃথা বীরত্বের মোহে মুগ্ধ না হয়ে তার তরুণ জীবনের করুণ ব্যর্থতার দিকে আমি বাঙলার ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। অবশ্য আজকাল বাঙালী ছেলেদের মধ্যে বিপ্লবপ্রকৃতির বড় বেশি কেউ আছেন আমার মনে হয়না,—তবে যে সময়ের ঘটনা নিয়ে এটি লিখিত সে সময়ে এই ধরনের একটা মোহ ছেলেদের যেন ছিল। যদি সেই মোহ সম্পূর্ণ না গিয়ে থাকে তাহলে সুধীরের দৃষ্টান্তে কেটে যাক আমার এই আকাঙ্ক্ষা।

বিপ্লবের গুপ্ত পন্থায় আমাদের দেশের মুক্তি কিছুতেই হতে পারেনা, এ বিষয়ে সন্দেহের আর এতটুকু অবকাশ নেই। পাশাপাশি সুধীর ও সতীশের জীবনে এই সত্যের কিছু আভাস দিতে আমি চেষ্টা করেছি। বিপ্লবীদের যে যৎসামান্য কাহিনী এতে লিখিত হয়েছে তা রাউলাট কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে অনেকটা কল্পনার সৃষ্টি। বাঙ্গালীর ছেলেবয়সে এই বিপ্লবের মোহও একটুখানি স্থান অধিকার করে আছে, তাকে অস্বীকার করা চলে না,—এবং তার কিছু উল্লেখ না করলে ছেলেবয়সের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলেই, সত্যের খাতিরে আমাকে সুধীরের চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে। ছেলেদের যাদের মনে সত্যিকার দেশসেবার প্রেরণা রয়েছে তারা যাতে সুধীরের মত ভুল পথে গিয়ে নিজের ও আরো দশজনের জীবন ব্যর্থ না করে, সতীশের আদর্শই অনুসরণ করেন এই আমার আন্তরিক উদ্দেশ্য।

(৪)

অশান্ত ও মোহন এই দুটি ছেলের সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। বার্ণার্ড শ' তাঁর Man and Superman নাটকে নর-নারীর ভালোবাসার আকর্ষণে মিলিত হবার কারণ বলেছেন Life force,— সেটা সৃষ্টির জন্যে দরকার। তরুণ বয়সে ছেলে ও মেয়েদের নিজেদের মধ্যেই যে অনুরূপ একটা প্রেমের আকর্ষণ দেখতে পাওয়া যায় তাও আমার মনে হয় সেই Life force এরই আর একটা বিচিত্র বিকাশ,— সেটা স্রষ্টার জন্যই দরকার—অর্থাৎ সেই ভবী সৃষ্টির স্রষ্টাদের অন্তরের পরিপূর্ণ জাগরণের জন্যই অনিবার্য আবশ্যক।

(৫)

সাহিত্যরথী শরৎচন্দ্র তাঁর অবসরের একান্ত অভাবহেতু এই বইটির ভূমিকা লিখতে পারেননি, তবে ভবিষ্যতে তাঁর অভিমত প্রকাশ করবেন ভরসা দিয়েছেন ; শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল-মহাশয় অনুগ্রহ করে একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এজন্য তাঁদের কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্নেহবশে একদা যে চিঠিখানি আমাকে লিখেছিলেন, ব্যবসাদারি হিসেবে সেটি প্রকাশ করার জন্য তাঁর মার্জনা পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করব, আমি আশা করি। ইতি—

গ্রন্থকার

ছেলে বয়সে

শিবরাম প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র

এই বইখানির একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে গ্রন্থকার আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ভূমিকা লিখিতে পারি না বলিয়াই তাঁহার এই অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারি নাই।

শ্রীমান শিবরামের বাঙ্‌লা লেখার সহিত আমার পরিচয় ঘটে বছর দুই পূর্ব্বে। বোধ হয় 'যুগান্তর' বা 'আত্মশক্তি' এমনি কোন একটা সাপ্তাহিক পত্রের স্তম্ভে। তখন হইতে যখনই এই ছেলেটির রচনার সাক্ষাৎ পাই, আমি যত্নের সহিত পড়ি।

ছেলেবয়সে গ্রন্থখানির সবটুকু পড়িবার এখনও সময় পাই নাই, মাঝে মাঝে পড়িয়াছি মাত্র। আমার আন্তরিক বিশ্বাস শিবরামের যে কোন রচনা পড়িয়াই কাহাকেও হতাশ হইতে হইবে না। আমার আরও একটা বিশ্বাস এই যে এই নবীন গ্রন্থকারের সাহিত্য সেবা উত্তর কালে সফল ও সার্থক হইবেই।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৯ই চৈত্র ১৩৩২।

১

শ্রীকান্ত বড় হলে, লোকে তাকে জিজ্ঞেস করল যে তার জীবনে কাকে এবং তাকে কে প্রথম ভালবেসেছে,—শ্রীকান্ত দুটি চোখে স্মৃতির স্বপ্ন ভরে নিয়ে প্রশ্নকর্তার চোখে চোখে চেয়ে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, রাজলক্ষ্মী। সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকান্ত আরও ধীরে একটু মাথা নেড়ে নিজের কথাটারই অব্যক্ত সায় দিল ;—সেটা তার পুরনো স্মৃতির দোলা।

প্রশ্নকর্তা উত্তর শুনে বিমুগ্ধই হলেন, বিশেষ করে উত্তর-কর্তা যখন তাঁকে রাজলক্ষ্মীর স্বহস্তে তৈরি এক পেয়ালা চা ও পর্যাপ্ত সন্দেশ দিয়ে সম্বর্ধনা করলেন। কিন্তু বিক্ষুব্ধ হলেন কেবল বিধাতা—হতভাগা ইন্দ্রনাথকে স্মরণ করে।

শ্রীকান্ত সারাজীবন ধরে রাজলক্ষ্মীরই পূজা করে চলল, এবং তার জীবনে ইন্দ্রনাথের ঋণ-স্বীকারের আর কোনো চেষ্টা এপর্যন্ত দেখা গেল না বটে, কিন্তু এটাও ত অস্বীকার করা চলে না যে ছেলেবয়সে ইন্দ্রনাথই তাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে এবং যার আকর্ষণে মৃত্যুর মুখ পর্যন্ত সে বারবার অভিসারে বেরিয়েছে, সেই প্রথম-প্রিয়ের প্রতি তার প্রথম প্রেম যে প্রথম প্রিয়ার চাইতে কিছুমাত্র কম ছিল তাই বা কে বলবে ?

কেবল চোখে নয়, মুখে নয়, মস্তিষ্কে নয়, হৃদয়ে নয়—সমুদয় স্নায়ু-শিরা-মজ্জায় জড়ানো ছেলে বয়সের এই ভালোবাসা। ছেলেরা যাকে যেমন ভালোবাসে তেমনি অগোচর ও একান্ত। ছেলেবেলার এই স্বপ্নের কাহিনী বড়বেলার স্মৃতির বাহিনীর মধ্যে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যায় না, এটা সত্য।

শ্রীকান্তর বয়সে, আমাদের এই আখ্যায়িকার প্রশান্তকে যদি একই প্রশ্ন করা যেত তাহলে সেও তার মোহনের কথা ভুলে গিয়ে কোনো মানসীর নামই করত হয়ত, কিন্তু সেই বয়সটা আসতে এখনও তার কিছু বাকি আছে, এখন তার বয়স চৌদ্দ কি পনের।

এখন, মোহনের সঙ্গে তার প্রথম দেখা কি করে ঘটল, তাই আরম্ভ করা যাক, তাহলে।

ঘটনার দিন সন্ধ্যায় প্রশান্ত, কর্নওয়ালিস থিয়েটারে বসে একটা রোমাঞ্চকর ছবি দেখছিল। তখন বড়দিনের ছুটি, রোজই নতুন নতুন ভালো ভালো ছবি। গল্পের নায়ক, কখনো বাঘের কবলে পড়ছে, কখনো জ্বলন্ত ঘরের ভেতর থেকে নায়িকাকে উদ্ধার করে আনছে, কখনো বা ডিনামাইটের মুখে নিঃশব্দে উড়ে যাবার অপেক্ষায় আছে—তারই পাকচক্রে প্রশান্তর মন অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে ; এমন মুহূর্তে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল, 'ইন্টারভ্যাল' ঘোষণা হল ও 'ড্রপ' পড়ল।

প্রশান্ত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বাইরে যাবার জন্য উঠে পড়তেই, এক জায়গায় বাঁধা পড়ে তার পা ও চোখ দুটি অচল হয়ে গেল। ছেলেটি চার-পাঁচ সারের পিছনে

দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তার সামনাসামনি। তারই সমবয়সী, ছেলেটি সুন্দর। তাকে তার হঠাৎ কেমন ভালো লেগে গেল যে, একটু বাধ-বাধ ঠেকলেও, কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না।

ছেলেটির আশেপাশে আরও কয়েকটি ছেলে ছিল—তাদের সঙ্গে হেসে গল্প করছিল—ঐ ছবিরই গল্প। হঠাৎ একটা ছেলে অশান্তকে দেখিয়ে তাকে বল্লে—দেখছিস ভাই, ওই ছেলেটা তোর দিকে তাকিয়ে আছে!

অশান্তর দিকে মোহনের চোখ পড়ল, তার চোখ দুটি আনন্দের আলোয় গলে পড়ছিল, অশান্তর মনে হল সে যেন তার দিকে চেয়ে হাসলে।

আর এক জন বল্লে—মোহন, ও বোধহয় তোর সঙ্গে ভাব করতে চায়।

মোহন বল্লে, বেশ ত, ডাক না ওকে এখানে। একটু চেপে বসলে সবারই জায়গা হবে।

এক জন বল্লে, না না, ডেকে কাজ নেই। অচেনা ছেলে।

অশান্ত কিন্তু লজ্জা পেয়ে ইতিমধ্যে নিজের জায়গাটিতে বসে পড়েছে। কিন্তু ঐ কালো ছেলেটির প্রতি তার বড় রাগ হচ্ছিল। সে কেন তাকে দেখিয়ে দিলে।

যথাসময়ে আলো নিবে গেল, ড্রপ উঠল, ছবি দেখানো শুরু হল। চোখের ওপর অনেক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে লাগল—কিন্তু অশান্তর মনের চোখে ভাসতে লাগল ছেলেটি তার দিকে চেয়ে কেমন মিষ্টি হাসলে! গল্পের নায়ক উঁচু পাহাড়ের রাস্তায় মোটর সাইকেলে তীব্র বেগে ছুটে যেতে যেতে, দুর্জয় দুঃসাহসে নিচের চলন্ত রেলগাড়ির ছাদে লাফিয়ে পড়ল এবং গাড়িও থামল না, ট্রেনের ছাদেই সাইকেল চালাতে শুরু করল—তখনও অশান্তর মনে এই চিন্তাই জাগ্রত এইটা বায়োস্কোপ শেষ হলে কি সূত্রে কেমন করে ঐ ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবে।

কিন্তু পালা যখন শেষ হল, তখন বাইরে ঝম্ ঝম্ করে পৌষের অকাল বর্ষণ নেমেছে! সেই মুহূর্তে অশান্তর মনে হল, ঐ যা, ছাতা আনে নি! বিকেল থেকেই ত আকাশটা মেঘমেদুর করেছিল। কিন্তু ছেলেটিকে দরজা পেরিয়ে বাইরে বেরুতে দেখেই সে সচেতন হয়ে উঠল, এবং বৃষ্টির মধ্যেই বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

ভিড়ের মধ্যে যথাসম্ভব পা ও চোখ চালিয়ে, অবশেষে গেটের কাছে এসে দেখতে পেল, একটিমাত্র ছাতার তলায় সেই ছেলেটি ও আরো দুজন অতিকষ্টে মাথা বাঁচিয়ে কোন ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে। তার মনে হল, হায়, যদি ছাতা আনত তাহলে আজ সহজেই ছেলেটিকে ছাতার তলায় ডাকতে পারত, তাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবার সুযোগে বেশ তাদের ভাব জমে উঠত।

অশান্ত ঠিক করল, যাহোক ছেলেটিকে ছাড়া নয়, ভিজেই হোক আর যে করেই হোক, তার বাড়ি দেখে আসতে হবে। কিন্তু অতগুলি লোকের ভীড়ের অত্যাচারে আর গাড়ি ঘোড়ার আড়ালে একটু পরেই সে যে কোথায় হারিয়ে গেল তার কোনো খোঁজই পেল না। তখন হতাশ হয়ে, বৃষ্টির জোর-ছাঁট থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য সামনে যে ট্রাম আসছিল তাতেই উঠে আশ্রয় নিল।

বিডন স্ট্রীটের মোড়ে তাকে নামতে হল, কারণ তাদের বাড়ী সেই পথে যেতে হয়। তখন বৃষ্টিটাও এসেছে খুব জোর। একটি পথিকের ছাতার তলায় দৌড়ে গিয়ে বল্ল, মশাই, আপনার সঙ্গে একটু যেতে পারি কি?

তিনি বিরক্ত হয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু অশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর একটু মায়া হল, সহানুভূতিভরে বল্লেন, আচ্ছা, এস। পথে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় তিনি করলেন না, এবং যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করে যেটুকু ছাতা তাকে দিলেন তার বেশি দিলেন ছাতার জল।

বিডন স্ট্রীটে কিছুদূরে একটি বাড়ি বর্ষার অশ্রুধারাকে উপেক্ষা করে আলোকমালায় হাসছিল, সেই বাড়িতে বিয়ে। ভদ্রলোকটি বাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন এবং জানালেন এই বাড়িতেই তাঁকে পথশেষ করতে হবে। অশান্ত কি করে? বৃষ্টির তুফানে পথঘাট ঝাপ্সা হয়ে উঠেছে, সেও বল্লে, আমারও এই বাড়ি। ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে সেও বাড়ির ভেতরে গেল, একটি প্রশ্নও কেউ তাকে করল না।

খোঁড়া কাকের মত, একপ্রান্তে একটি কাঠের চেয়ার দখল করে সে চুপ করে ভাবতে লাগল, কখন বৃষ্টি ধরবে, কখন বাড়ি গিয়ে মাসিমার বকুনি আর সেজদার প্রহার ভোগ করবে। এই দুর্ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে কেবল একটি হাসিমুখ মাঝে মাঝে উঁকি মেরে তার সব ভাবনা ভুলিয়ে দিচ্ছিল।

একটি ছেলে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে দেখে দাঁড়িয়ে বিস্মিত-কণ্ঠে বলে উঠল, একি, অশান্ত যে?

অশান্ত তার দিকে চেয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল; বল্ল, আপনি এই বাড়িতে থাকেন নাকি?

দেবেন বল্লে, হ্যাঁ, এই আমার বাড়ি। আজ আমার বোনের বিয়ে। তুমি এলে কি করে?

অশান্ত বল্লে, এসে পড়েছি। আপনি এখানে থাকেন আমি জানতুম না। খুব আশ্চর্য ত!

দেবেন বল্ল, আশ্চর্য বই কি। এসেচ বেশ করেচ। তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে যাবো আজ কবার ভেবেচি, কিন্তু কাজের তাড়ায় গিয়ে উঠতে পারিনি। কিন্তু মনে মনে যে ডেকেছিলাম তাই তোমাকে আসতে হয়েচে।

অশান্ত উত্তরে শুধু একটু হাসলে। এতক্ষণ এই লোকজন, সমারোহ, গান-বাজনা, যা তাকে একটুও আকর্ষণ করতে পারেনি, একমুহূর্তে সবকিছুর সঙ্গে যেন তার আত্মীয়তা হয়ে গেল।

২

তার কয়েকদিন আগের ঘটনা বলা দরকার।

দেবেন ছেলেটির বয়স সতের-আঠারো, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, বলিষ্ঠ উন্নত গঠন, যৌবনশ্রী-প্রদীপ্ত চেহারা।

সেদিন সন্ধ্যায় স্টার থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে সে একজন লোকের প্রতীক্ষায় ছিল, দু'খানা থিয়েটারের টিকিট কিনেচে, নিজের জন্য ও তার জন্য;—কিন্তু যখন পালা আরম্ভ হবার নির্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট আগে পর্যন্ত তার দেখা পাওয়া গেল না, তখন সে বাকি টিকিটির সদ্ব্যবহারের হেতু মনোমত সঙ্গী নির্বাচনে মন দিল। কিন্তু ঐ অনেক লোকজনের মধ্যে পরিচিত একজনও তার চোখে পড়ল না। একটি ছেলে তার চোখে

লাগল বটে, কিন্তু সে অচেনা—ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আগ্রহে থিয়েটারের বিজ্ঞাপনগুলো পড়ছিল। সে তার কাছে গিয়ে বললে, কি ভাই, থিয়েটার দেখবে?

ছেলেটি তার দিকে অবাক চোখে চাইল।

"আমার একখানা টিকিট বেশি হয়েচে, একজন লোকের আসার কথা ছিল সে আসেনি। তুমি দেখবে থিয়েটার? ফার্স্ট ক্লাস সিট।"

"কই, দেখি টিকিট।"

দেবেন টিকিট দেখাল, ছেলেটি বল্লে, কিন্তু আমার কাছে ত টাকা নেই।

দেবেন বল্লে, তোমার টাকা লাগবে না, আমার এ টিকিটটা তো নষ্টই হত, তুমি দেখলে এটা কাজে লেগে গেল, এই আমার লাভ।

ছেলেটি রাজি হয়ে বল্লে, আচ্ছা দেখতে পারি, একঘন্টা কি দুঘন্টা। বেশি দেরি করলে কিন্তু বাড়িতে বকবে।

"বেশ তাই দেখো। তোমার নামটি কি ভাই?"

"অশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"অশান্ত? বেশ নামটি ত। আচ্ছা এস থিয়েটার শুরু হয়ে গেছে।"

দুজনে গিয়ে রঙ্গমঞ্চের সামনের দুখানি চেয়ার অধিকার করে বসল। দেখবার অবসরে অশান্ত বিবিধ প্রশ্ন করতে লাগল, দেবেন তার উত্তরে কে কি অভিনয় করচে, কোন্ অভিনেতার কি নাম, তাদের পরিচয়কাহিনী বলে যেতে লাগল। প্রথম সে যখন জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগচে? উত্তরে অশান্ত বল্লে, মন্দ না। কিন্তু আধঘন্টা পরে প্রশ্ন করতেই সোৎসাহে বল্লে, বেশ লাগছে।

"তুমি এর আগে আর কি কি নাটক দেখেচ?"

"এর আগে আমাদের দেশের থিয়েটার দু'তিনবার দেখেছিলাম, কলকাতায় এই প্রথম। এ থিয়েটার অনেক ভালো তার চেয়ে।"

"কোথায় তোমার দেশ?"

"মালদহে। বড়দিনের ছুটিতে সেজদার সঙ্গে বেড়াতে এসেচি। আর তিন চারদিন বাদেই চলে যাব।"

"এখানে কোথায় আছো?"

"বলরাম দে স্ট্রীট। মাসিমার বাড়িতে।"

"আমাদের বাড়িও ঐ দিকে। তোমার ভয় নেই, বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবো।"

"আমার একটুও আর ভয় করে না।"

"তোমার সেজদা কি করেন?"

"তিনি মালদার সাব পোস্টমাস্টার।"

"তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?"

"থার্ড ক্লাসে। আমি বোর্ডিংএ থেকে পড়ি। সেজদাকে মফঃস্বল পোস্টাপিসে ঘুরে বেড়াতে হয় কি না।"

"তোমার বাবা কি করেন?"

"বাবা, মা আমার ছোটবেলাতেই মারা গেছেন। আমার আর দুই দাদা পশ্চিমে চাকরি করেন।"

"বাবা মা নেই?" দেবেন আস্তে আস্তে ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে

বল্লে, "তোমাকে বাড়ির সবাই খুব ভালবাসে, না? কে তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে?"

"সেজদা আর মাসিমা। কিন্তু কোনো দোষ করলে আর কেউ কিছু বলে না, মাসিমাই খুব বকেন, আর সেজদার কাছেই মার খেতে হয়। তবু আমি সেজদাকেই বেশি ভালবাসি।"

অভিনয়ের এক অঙ্ক শেষ হল। দেবেন বল্লে, "তোমার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে, এসো কিছু খাওয়া যাক।

"না, খিদে পায়নি। আপনি বসুন।"

"না—তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

থিয়েটার-সংলগ্ন কেবিনে গিয়ে দুজনে চা-রুটি-মাখন ও পুডিং খেল। এই সুশ্রী ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেবেনের মনে হল, তার যে ভাইটি ছেলেবেলায় মারা গেছে অশান্ত দেখতে ঠিক তারই মত। তাই অশান্ত যখন পুডিং আর খেতে পারবে না বলে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল তখন অসঙ্কোচে তার মুখটি কাছে টেনে খানিকটা পুডিং খাইয়ে দিতে তার একটুও বাধা ঠেকল না। ছেলেটিও সহজে তার হাতে খেল।

আবার দুজনে পাশাপাশি গিয়ে বসল। দেবেন বল্লে, "নটা বাজে, এবার তোমাকে রেখে দিয়ে আসি।"

"আপনি আর দেখবেন না?"

"তোমাকে বাড়িতে বকবে, তার চেয়ে একদিন নাই দেখলুম।"

"না, তা কেন? আমার ভালো লাগচে, শেষ পর্যন্ত দেখব।"

"তুমি নাটকের গল্পটা ধরতে পেরেচ?"

"গল্পটা এখনও বুঝতে পারিনি। তবু বেশ লাগচে।"

দেবেন একটুমাত্র হাসল, ও আদর করে তার গাল দুটি টিপে দিল। অশান্ত কোনো কথা না বলে, দেবেনের মাথায় মাথা ঠেকিয়ে চুপ করে দেখতে লাগল।

আরো দুটি অঙ্ক হয়ে গেল। অশান্ত একবার দেবেনের কাঁধে মাথা রাখতেই, দেবেন বাহু দিয়ে তার গলা জড়িয়ে বল্লে, ঘুম পাচ্ছে না কি? ঘুম তার পাচ্ছিল সত্যি, কিন্তু সে তখনই সোজা হয়ে বসে বল্লে, ঘুম কি পায়? পঞ্চম অঙ্কের গোড়াতে করুণ রসের অবতারণা ছিল, সেই জায়গাটির অপূর্ব অভিনয় দেখে দর্শকদের অনেকেই কাঁদছিল, অশান্তর চোখেও জল এল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। দেবেন সেই ছেলেমানুষটিকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, কাঁদচ কেন, এসব কি সত্যি? ও যে অভিনয়। তার চোখ মুছিয়ে দিল, মুখে হাত বুলিয়ে দিতে খানিকক্ষণে অশান্ত শান্ত হল।

অবশেষে রাত বারোটার পরে পালা শেষ হল, দেবেনের হাত ধরে অশান্ত বেরিয়ে পড়ে বল্লে, এবার তাড়াতাড়ি চলুন। সেজদা আজ মিনার্ভা থিয়েটারে গেছে, তিনি বাড়ি ফিরবার আগে আমাকে পৌঁছতে হবে।

"তোমার ভয় নেই। মিনার্ভা শেষ হতে এখনো একঘণ্টা দেরি। আমি প্রায়ই থিয়েটার দেখি, আমি জানি।"

অশান্ত অনেকটা ভরসা পেল, এবং দেবেনের হাতটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল। তাদের বাসার গলিপথের মোড়ে এসে দেবেন থমকে দাঁড়াল, "কি অন্ধকার!"

"কদিন থেকে এই গলির গ্যাসটা জ্বলছে না, তাই এমন।"

"আচ্ছা, আমি তা হলে এখান থেকেই আসি ভাই।"

"না, আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিন, ভয় করছে।" দুজনেই অতি সন্তর্পণে পরস্পরকে অবলম্বন করে ঐ নাতিদীর্ঘ সঙ্কীর্ণ পথটুকু, এখানে ওখানে হোঁচট খেয়ে, কোনোমতে অতিক্রম করে বাড়ির দরজায় এল। ভয়গ্রস্ত অশান্তকে বাহু-বেষ্টনের মধ্যে রক্ষা করে দেবেন অগ্রসর হচ্ছিল, এবং অশান্তও এই পরনির্ভরযোগ্য পথের বন্ধুটিকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছিল।

জোরে কড়া নাড়াতে চাকর এসে দরজা খুলে দিল। বিদায় নেবার সময় অশান্ত ক্ষণেকের জন্য, দুটি হাত মালার মত করে দেবেনের গলায় জড়িয়ে দিল, এবং দেবেন অভিভূত হয়ে ক্ষণেকের জন্যই তার কোঁকড়া চুল ভরা নরম মাথায় গাল পেতে রাখল।

৩

অশান্ত প্রশ্ন করল, সত্যি আপনি আমাকে মনে মনে খুব ডাকছিলেন? কেন? আচ্ছা, মনে মনে ডাকলেই কি দেখা পাওয়া যায়?

দেবেন হেসে জবাব দিল, যায় বই কি। তুমি ধ্রুবর গল্প পড়োনি? সে তো মনের ডাকে ভগবানকে পেয়েছিল।

অশান্ত বল্লে, আচ্ছা মনে করুন, এই কলকাতার পথে অচেনা কেউ হারিয়ে গেলে তো আর কোনো জন্মে পাবার যো নেই। মনের ডাকে কি তাকেও ফিরে পাওয়া যায়?

"নিশ্চয়। মনের টান এমনি আশ্চর্য রহস্য। নইলে, তুমি তো আমার বাড়ি দেখোনি, আমাকে চেনো না, কেমন করে এলে বল দেখি?"

অশান্ত মাথা নেড়ে বল্লে, তা বটে।

"তা ত বটে!" দেবেন হেসে বল্লে, "কই কাছে, এসো ত দেখি মাথাটা। অ্যাঁ, এ যে জলে চব্‌চব্ করচে, কাপড়জামা সব ভিজে। কতক্ষণ এই ভিজে কাপড়ে আছ?"

"বেশিক্ষণ না। এই ত এলাম।"

"এসো আমার ঘরে। জামা কাপড় ছাড়িয়ে দিই। কি ভয়ানক! অসুখ না করলে বাঁচি।"

নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুখ গা হাত মুছিয়ে দিয়ে, গরম কাপড়জামা পরিয়ে দেবেন তাকে পড়বার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে বইভরা আলমারির পাশে ইজিচেয়ারে বসিয়ে রেখে বল্লে, অনেক ছবির বই আছে তুমি বসে বসে দেখ। ততক্ষণ আমি বাইরে একটু কাজ দেখিগে। শীগ্রিই ফিরব।

সে বেরিয়ে যেতেই অশান্ত ব্যগ্র হয়ে বলল, "আপনার নামটা কি তা তো বল্লেন না?"

"আমার নাম? আমাকে আর 'আপনি' বলে ডাকবে না, 'তুমি' বলবে, আগে বল তবে।"

অশান্ত একটু হেসে বললে, আচ্ছা তাই বলব।

"আমাকে দেবেনদা বলে ডেকো, তুমি আমার ছোট্ট ভাইটি হলে, কেমন? তোমার এখানে কোনো ভয় নেই; কেউ কিছু বলবে না",—কাছে এসে আদর করে অশান্তর মাথাটা নেড়ে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

অশান্ত কিছুক্ষণ ছবির বই এর- দুএকটা পাতা উলটে দেখল, কিন্তু—বাড়ির ভাবনায় তার মন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাইরেও বৃষ্টি থরবার নামটি নেই। আধঘন্টা পরে দেবেন ফিরে আসতেই, অশান্ত ডাকল, দেবেনদা—

"বলো ভাইটি।"

"যদি রাগ না করো ত বলি, দেবেনদা!"

"না রাগ করব কেন?"

"আমার তো আর এখানে থাকা চলে না। বাড়ি না গেলে মাসিমা সেজদারা ভেবে অস্থির হবেন যে। কি করি বল, আমাকে একটা ছাতা দাও, এই বৃষ্টিতেই বেরুতে হবে।"

"তোমার বাড়ির কথাই ত বলতে এসেচি। আমি লোক পাঠিয়েছিলুম এই বলে যে ভাবনার কিছু নেই, অশান্ত আমাদের বাড়িতে আছে। তাকে বিয়ের উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছি, আজকের এই বাদলায় তো পাঠানো চলে না, কাল সকালে দিয়ে আসব। তোমার মাসিমা আর সেজদা খুশিমনে রাজি হয়েছেন।"

"সত্যি? রাজি হয়েচেন?" অশান্ত চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দুই হাতে দেবেনকে জড়িয়ে ধরল। তার আনন্দ দেখে দেবেনের মন অপূর্ব সুখে ভরে উঠল। সে অশান্তর নিটোল গালে গাল চেপে বল্লে, তোমার এখানে ভাল লাগছে, ভাইটি?

মুখ না টেনে সেইভাবে জড়িয়ে ধরেই সে উত্তর দিলে, আমার খুব ভালো লাগচে।

"চল আমরা নীচে যাই। কত আলো, লোকজন, গান বাজনা হচ্ছে।"

"চল। ব্যাণ্ডের লোকেরা সব বসে আছে। তারা বাজাবে না? আমার বেশ লাগে শুনতে।"

"বাজাবে কাল, বর কন্যার শোভাযাত্রায়। তুমি যদি শুনতে চাও ত আমি তাদের বাঁশী বাজাতে বলে দিচ্ছি চল।"

নরনারীর জীবনে চোদ্দবছর বয়স একটা বিশেষকাল। এই সময়ে প্রথম ভালোবাসতে শেখে, আত্মহারা হয়ে ভালোবাসে, আদরের স্পর্শে একেবারে গলে পড়ে; এমন কি, পরিচয়হীন লুব্ধ-শিকারীর লালসার ফাঁদেও সহজে ধরা দেয়। এই জন্য এই বয়সেই মানুষের পরম পরিপূর্ণতা ও চরম সর্বনাশের সূচনা হয়—যার জের তারা সারাজীবন টেনে চলে। অশান্তর এখন এই বয়স।

প্রথম যৌবন আর এক বিচিত্র কাল। এই বয়সে সুন্দরের পূজা, সৌন্দর্যের স্বপ্নই সমস্ত মন জুড়ে থাকে। চোখে যাকে দেখতে ভালো লাগে, তাকেই একান্ত করে ভালোবাসতে চায়। এই বয়সে সহজেই পরাজয় মানে, তাই জয় করাও এই বয়সে সবচেয়ে সহজ। সহজেই আকৃষ্ট হয়, তাই সহজেই আকর্ষণ করে। এই বয়স হচ্ছে দেবেনের।

অশান্তকে নিয়ে দেবেন চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তাকে এঘর ওঘর সবঘর একে একে দেখাল। বাড়ির লোকজন ও মা-রা সবাই ব্যস্ত তাই কারু সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে পারল না। তবু, বাইরের লোকজন যে-ই অশান্তকে দেখে প্রশ্ন করেচে, এটি কে? দেবেন তাকেই তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েচে, আমার ভাই।

সকলের খাওয়া দাওয়া হতে বেশ একটু রাত হবে জেনে সে অশান্তকে নিয়ে ভেতরে গেল,—এসো তোমাকে খাইয়ে দিই। বড্ড রাত হয়ে যাচ্চে।

"আমি একলা খাবনা, তোমাকেও সঙ্গে খেতে হবে।"

"বেশ, আমিও খাব। কিন্তু খেয়ে দেয়ে তুমি একলাটি আমার বিছানায় শুয়ে থাকতে

পারবে ত? আমি শীগ্রি শুতে আসবো। দাদারা সব কাজ করচেন, আমাকে না দেখতে পেলে রাগ করবেন।”

“আমি কিন্তু বেশিক্ষণ একলা শুয়ে থাকতে পারব না।”

“আচ্ছা সে হবে। যদি ঘুমিয়ে পড়ো, তা হলে ত আর কথা নেই?”

তারা খেয়ে নিল, তারপরে অশান্তকে শুইয়ে, তার গায়ে লেপ ঠিকঠাক করে দিয়ে দেবেন বল্লে, এবার আমি যাই ভাইটি?

“একটু বসো দেবেনদা।”

একটুক্ষণ মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই চোখ বুজে এসেছে দেখে ঘুমিয়েছে মনে করে দেবেন উঠে দাঁড়ালো, অশান্তর শুভ্র কপালে একটা চুমু দিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। অশান্ত কিন্তু ঘুমায় নি, এই অভাবিত আদরে তার সারা দেহ মন কেমন করে উঠল, তার চোখের ঘুম পালিয়ে গেল, সে কত কি ভাবতে লাগল।

সহসা তার মনে একটা হারানো স্মৃতির ছবি ভেসে উঠল—একটি ছেলের কথা। তখন তার বয়স দশ। একবার মাসিমার সঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে সেই সমবয়সী ছেলেটির সঙ্গে ভাব হয়েছিল। তার সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয়নি, আলাপও বেশিদূর গড়ায়নি, শুধু মনে পড়ে যে ছেলেটি তারপর থেকে সোজারাস্তায় না গিয়ে একটু ঘুরে তাদের রাস্তা দিয়ে স্কুলে যেতো; আর সে প্রতিদিন দশটার সময় বাড়ির দরজায় তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতো। চোখোচোখি হলেই দুজনে হাসি দিয়ে দুজনকে খুশি করত এবং কোনোদিন পাঁচ, কোনোদিন দুই, কোনোদিন পনের মিনিট তাদের গল্প চলত, দরজার পাশের ইঁটেগাঁথা সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চিতে বসে।

তারপর একদিন থেকে সে আর এলো না, রোজ যথাসময়ে প্রতীক্ষা করে যখন দেখা মিলত না, তখন অশান্তর সমস্ত মন অশ্রুময় হয়ে যেতো; কখনো কখনো সেই বাষ্প তার দুই চোখে ভারি হয়ে আসত, দূরের পথের বাঁক চোখের ওপর ঝাপসা হয়ে উঠত, সে বিছানায় গিয়ে, চুপ করে শুয়ে থাকতো। সেই ছেলেটির-বিরহের ভুলে-যাওয়া বেদনা আজ নতুন করে তার মনে জাগল। তার কথা, আজকের বায়োস্কোপে দেখা ছেলেটির কথা, দেবেনদার কথা—এই সব অশান্তর মনে তোলপাড় করতে লাগল। বিশেষ করে এই কটি দিনে তার জীবনে, বায়োস্কোপের মত, এ কি আশ্চর্য ঘটনা সব ঘটতে শুরু হয়েচে—তাই ভাবতে লাগল।

একঘন্টা পরে দেবেন ফিরে এসে বিছানায় আশ্রয় নিল। শয্যা-পার্শ্বের বাতিটা তখনো জ্বলছিল, সেই আলোতে ছেলেটির কচি মুখখানি ভালো করে দেখে নিল; দেখে দেখে চোখ যেন ভরে না। হাত বাড়িয়ে বাতিটা কিছু কমিয়ে দিয়ে, তারপর অতি আস্তে ছেলেটির নরম গালে একটি চুমু দিল।

অশান্ত বল্লে, তোমার ফিরতে বড্ড দেরি হয়েছে দেবেনদা।

দেবেন চকিত হয়ে বল্লে, এ কি, এখনো তুমি জেগে আছো?

“ঘুম আসচে না যে। তুমি গল্প বল।”

“এত রাত্রে গল্প? আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চি, ঘুমোও।”

“ঘুম আসবে না। চোখ জ্বালা করচে!’

“আচ্ছা, আমি চোখের জ্বালা সারিয়ে দিচ্চি।’ দেবেন চোখ দুটিতে আদর করে চুমু দিল, বল্ল, এইবার নিশ্চয় ঘুম আসবে।

অশান্ত বাহু দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল, দেবেন তাকে আরও বুকের কাছে টেনে আনল, বুকের মধ্যে, মুখের মধ্যে, সারা অঙ্গের মধ্যে একটা অননুভূত-পূর্ব আনন্দের আস্বাদে তন্ময় হয়ে, বৃষ্টির ঝরঝরানি সুরের মধ্যে পৌষমাসের একটি রজনী তারা প্রভাত করলে।

৪

বড়দিনের ছুটির পর কয়েকমাস কেটে গেছে, এখন সত্যিই বড় দিন পড়েছে, এখন জ্যৈষ্ঠর শেষাশেষি।

দেবেনের বিশেষ সখ ছিল ভূ-ভারত ঘুরে বেড়ানোর এবং বিশিষ্ট সখ ছিল বিনা টিকিটে। রেলপথের ছোট বড় কর্মচারী, গার্ড, চেকার, ফ্লাইং চেকার, সবাইকে বেমালুম ফাঁকি দিয়ে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ কোনো জায়গা ভ্রমণের তার বাকি নেই। তার যে টাকার বড় অভাব ছিল তা নয়, বরং সব সময়েই যথেষ্ট টাকা তার কাছে থাকতো এবং ধরা পড়লে, টিকিটের দ্বিগুণ কেন চারগুণ দাম সানন্দে ধরে দিতে সে প্রস্তুত ছিল—কিন্তু কেউই কোনো দিন তাকে ধরতে পারেনি।

বিপদের দিকে সঙ্কটের দিকে তার প্রবল প্রলোভন ছিল, ফাঁড়া ভয় করত না, ফাঁড়া কাটিয়ে যেতেই সে ভালোবাসত, তার অন্তরের দুঃসাহসী ভাবটা এইভাবে তবু কতকটা তৃপ্ত হত। তাই নেহাৎ বাধা না থাকলে, চলার পথে এইভাবে বাধা সৃষ্টি করাই ছিল তার রুচি।

এবার সে মধুপুর-মুখে বেরিয়েছিল, হাওড়ায় একটি প্ল্যাটফর্ম টিকিট মাত্র কিনে অম্লান-বদনে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় চড়ে বসেছে। সেই কামরায় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটি কিশোরী ও দুটি বালক তার সহযাত্রী। লেমোনেডওয়ালা এসে লেমোনেড দিতে চাইলে, যদিচ তার একটুও পিপাসা ছিল না, কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসোপযোগী প্রেস্টিজ বজায় রাখবার জন্য চার গ্লাস লেমোনেড কিনে, এক গ্লাস নিজে নিল, বাকি তিন গ্লাস ছেলেমেয়েদের হাতে দিল। ভদ্রলোক ঈষৎ আপত্তির উপক্রম করতেই সবিনয়ে বাধা দিয়ে বল্লে, ওরা আমার ভাই বোন।

ঘণ্টা দুই পরে, মাঝে কি একটা স্টেশনে, সহযাত্রীরা নেমে গেলে দেবেন ঘড়ি খুলে দেখলে দশটা বেজে গেছে। আলোর আধারে নীল আবরণটা টেনে দিয়ে সে নিদ্রার সাধনায় মন দিল। তারপরে অনেকক্ষণ কেটে গেছে, কোন্ কোন্ স্টেশন অতিক্রম করে চলেছে সে সম্বন্ধে সজাগ প্রাণীর সংখ্যা সমস্ত গাড়িতে তখন মুষ্টিমেয়, কি একটা স্টেশনে গাড়ি অল্পক্ষণের জন্য ধরতেই, একটি ইউরোপীয় তরুণ সেই কামড়ায় প্রবেশ করল। যদিচ দেবেনের গায়ের রঙ, রূপের বিচারে, সাহেবের সাদা চামড়ার তুলনায় কোনো অংশে হীন ছিল না তবু এই কালা আদমিটাকে নির্বিচারে এতখানি জায়গা জুড়ে অকাতরে ঘুমোতে দেখে তার মনে অত্যন্ত বিরাগের সঞ্চার হল। সে গিয়ে দেবেনের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বল্লে, ওহে, উঠে পড়, উঠে পড়।

দেবেন একবার চোখ মেলে চেয়ে বল্লে, ঐ ত জায়গা আছে, বসে পড় না, বাবা!

“উঠবে না তবে নাকি?” সাহেব তার বুকের উপর চেপে বসল। নেটিভ লোক দেখে তার ঝগড়া বাধাবার দুষ্টু-ইচ্ছাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

এবার সত্যিই দেবেনের চোখের ঘুম ছুটে গেল। তার সর্বাঙ্গ রাগে জ্বালা করে উঠল। সাহেবকে ধাক্কা দিয়ে দাঁড় করিয়ে সোজা খাড়া হয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ তার কপালে এক ঘুষি ঠুকল। সাহেব ঘুষির টাল সামলে নিয়ে, চকিতের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে, দেবেনকে আক্রমণ করল। দেবেনও তৈরি ছিল, কিছুক্ষণ মুষ্টি বিনিময়ের পর সহসা একটা প্যাঁচ কসে টান দিতেই সাহেব সজোরে ঘুরে পড়ল,—তার মাথা ঠুকে গেল, বেঞ্চের খুরোয় লেগে কপালের একাংশ কেটে গেল, ক্ষণেকের জন্য বিভ্রান্ত চোখে সে অন্ধকার দেখলে।

এতক্ষণ পরে দেবেন তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখবার অবসর পেল, পরিপুষ্ট গঠন বটে, কিন্তু ইউরোপীয়ানটি যুবক নয়, তরুণ; বয়সে তার চেয়ে এক-আধ বছরের বড় হলেও, দৈহিক শক্তিতে তার সমকক্ষ নয় বলে তার মনে হল। চোখদুটি নীল, চুলগুলো সোনালি, মুখখানি বড় সুন্দর,—বিবর্ণমুখ দেখে তার মায়া হল। তার দুচোখ যদি রাগে অন্ধ হয়ে না থাকত, এবং চকিতের জন্যও প্রতিদ্বন্দ্বীকে—দেখবার নয়—হেরবার অবকাশ ঘটত তাহলে এই বিগ্রহের পূর্বে, যুদ্ধ ঘোষণা না করে সে সন্ধি কামনাই করত।

যাক, যা হয়ে গেছে! দেবেন অর্ধমূর্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে সামান্য আয়াসে তুলে, সে যে আসনে ঘুমোচ্ছিল, সেইখানেই শুইয়ে দিল এবং নিজে তার পাশে বসল।

ছেলেটি একটুক্ষণেই উদ্যম ফিরে পেয়ে উঠে বসবার উদ্যোগ করতে গেল, কিন্তু সতর্ক দেবেন তাকে চেপে শুইয়ে রাখলে। ছেলেটি এবার দুই হাতে ঘুষি ছুড়তে লাগল, দেবেন, তাকে চেপে ধরে রাখবার অবসরে, কোনটা কোনটা আটকাবার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু অধিকাংশ ঘুষিই হাসিমুখে হজম করল; একটি মারেরও প্রতিদান দিল না। একতরফা লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে ছেলেটি অবশেষে নিরস্ত হল।

দেবেন ছেলেটির মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, ছেলেটি একটা বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে ক্ষণেক চেয়ে থাকল, তার পরে সজোরে দেবেনের হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। দেবেন তার কপালের ক্ষত পরীক্ষা করে দেখছে—এমন সময়ে গাড়ি একটা অজানা স্টেশনে থামলো।

দেবেন নেমে গিয়ে খানিকটা বরফ কিনে নিয়ে এল, এবং নিজের কাপড় ছিঁড়ে একটা ব্যাণ্ডেজ তৈরি করে কপালে বরফ-জলের পটি বেঁধে দিল। দেবেনের এই অভাবিত ব্যবহারে ছেলেটি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে ইচ্ছা থাকলেও এই কাজে বাধা দেবার শক্তি তার এতটুকু ছিল না। একটুকরো বরফ ভেঙে তার ঠোঁট দুটির উপর ধরতেই ছেলেটি হাঁ করে বস্তুটি মুখের মধ্যে নিল।

সস্নেহে তার কপালের চুলগুলি দুপাশে সরিয়ে দিতে দিতে দেবেন প্রশ্ন করলে, আমার নাম দেবেন, তোমার নামটি কি বলবে ভাই?

ছেলেটি এবার আর তার হাতের কাজে বাধা দিল না, শুধু বল্লে, সিগার্ড।

"সিগার্ড? সেই পৌরাণিক বীর? ইব্‌সেনের নাটকে যার গল্প পড়েছি। তুমিই সেই, তাই নাকি?"

ছেলেটি উত্তরে একটুমাত্র হাসলে। খানিকক্ষণ চোখ বুজে ললাটে আদরের স্পর্শ অনুভব করলে। তার পরে চোখ খুলে বল্লে, কিন্তু সিগার্ডের চেয়েও তোমার গায়ের জোর বেশি।

"কিন্তু সিগার্ডের মনের জোরও কম নয়। সে সহজেই প্রতিদ্বন্দ্বীর অপরাধ ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করতে পারে!"

এটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীরই গুণ তার ঘাড়ে আরোপ করা হয়েছে সিগার্ড বুঝল; এবং এতক্ষণে সত্যিই তার সব আঘাত জুড়িয়ে গেল, দেবেনকে তার ভালো লাগল। সে কেবল বল্লে, তাহলে তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ? তার উত্তরে দেবেন কিছু না বলে মুঠোর মধ্যে সিগার্ডের হাত দুটিতে একটু চাপ দিল। তাদের কথাবার্তা ইংরেজিতে চলছিল।

"যদি কিছু না মনে কর ত একটা প্রশ্ন করি। তুমি কি ইংরেজ? না আমেরিকান? এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তুমি কখনই নও।"

"আমি আইরিশ।"

"আইরিশ!" বিস্মিত হয়ে দেবেন বল্লে, তাই তুমি দেখতে এত সুন্দর! একটুক্ষণ কি ভেবে বলে উঠল, আইরিশ ও আমাদের একই উদ্দেশ্য।

"তুমি কি বলতে চাও যে তুমি একজন বাঙালী বিপ্লববাদী?"

"না, না, তা আমি বলছিনে। আমি বলতে চাই যে, আইরিশদের মত আমরাও পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।"

"আমার বড় ভাইরা সবাই সিনফিন্। আমার বাবা দেশের মুক্তি-যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। আমি নিজেও সিনফিন্। সিনফিন্‌দের পথ ছাড়া কখনো দেশের স্বাধীনতা হতে পারে না।"

"তুমি সিনফিন্? এত অল্পবয়সে?"

"আমার মত এমন কতশত আছে। রবার্ট এমেট একুশবছর বয়সে আইরিশ বিদ্রোহী দলের নেতা ছিলেন। আমি তোমাদের বারীন ঘোষের নাম শুনেছি।"

"হ্যাঁ, আমাদের দেশেও যাঁরা বিপ্লব শুরু করেন তাঁদের বয়স খুব বেশি ছিল না।"

"তা হবে। কিন্তু তাঁরা কি এখনো আন্দামানে আছেন? ইংরেজরা কি তাঁদের ছেড়ে দেবে না?"

"এই যুদ্ধের সময়? এখন টাটকা অনেক যুবককে ধরে ইন্‌টার্ন করছে। যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হবে বলে তোমার মনে হয়? জার্মানরা নিশ্চয় বাঙালীদের সাহায্য করবে।"

দেবেন এই প্রশ্নের কোনই জবাব দিল না দেখে সিগার্ড বলল, ওহে, আমার ভুল হচ্ছে। এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বা তার উত্তর দেওয়া নিয়ম নয়।

একটি স্টেশনে গাড়ি থামল, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্টেশনের নাম জেনে দেবেন বলল, এর পরেই জসিডি জংশন। আমাকে সেইখানেই নামতে হবে।

সিগার্ড দেবেনের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, তোমার ভাব দেখে মনে হয় সেখানে তোমার মিলনের জন্য কেউ অপেক্ষা করছে? তোমার কোনো বন্ধু, নয়?

দেবেন হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বল্লে, তা হতে পারে। তুমি বেশ কল্পনা করতে পারো, দেখছি।

"তোমার অনেক বন্ধু আছে, নয় কি? এবং তুমি তাদের সকলেরই প্রিয়, কি বল?"

"হাঁ, আমার অনেক মিষ্টি বন্ধু আছে, এবং তাদের মধ্যে আজ আর এক জনকে হয়ত পেলাম।" বলে তার দিকে চেয়ে হাসল।

সিগার্ড কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, ছেলেবেলায় গল্প শুনেছিলাম যে বাঙালীরা ছেলে বয়স থেকেই খুব ভালোবাসতে শেখে। আজ তার সত্যি পরিচয় পেলাম।

ট্রেন জংশনের মধ্যে ঢুকল। দেবেন সিগার্ডের দিকে ছেড়ে-যাওয়ার বেদনা-ভরা চোখে

চেয়ে বললে, এখন আমাকে বিদায় নিতে হবে। সিগার্ডের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে কিছুক্ষণ তার কপালে কপাল ঠেকিয়ে রইল।

ট্রেন থামল। কুলীরা "জসিডি জংশন, কুলী চাই" হেঁকে ফিরচে। সিগার্ড ও দেবেন উঠে সোজা হয়ে বসল। দেবেন কি ভেবে, একটু ইতস্তত করে বলল, তুমি কি ভায়ের মত একটি বিদায় চুমু দেবে না?

সিগার্ড হাসিমুখ বাড়িয়ে দিল, দেবেন মুখটি ধরে তার আহত কপালে একটি চুমু খেল। বিনিময়ে সিগার্ড তার নিটোল গালে নিবিড় চুমু দিল।

দেবেন উঠল, তার হাতটি হাতে ধরে বল্লে, ভগবান করুন, আমরা আবার মিলব।

'ভগবান তাই করুন' বলে সিগার্ড জোরে হাত ঝাঁকি দিল। দেবেন গাড়ি থেকে নামতেই ট্রেন ছাড়ল, চেয়ে দেখে সিগার্ড রুমাল নাড়চে, প্ল্যাটফরমের অতি প্রান্তে প্রায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে, তাই তার কাছে মনে হল গার্ডের আলোকসঙ্কেত।

৫

সেইখানে দাঁড়িয়েই সে দেখতে লাগল, যাত্রীর তাড়াতাড়ি পাণ্ডাদের কাড়াকাড়ি, আর রেলওয়ে কর্মচারীদের বাড়াবাড়ি। দূরে কাকে লক্ষ্য করে সে হাতের একটা অদ্ভুত সঙ্কেত করল, সেই ইঙ্গিতে আকৃষ্ট হয়ে লোকটি চটপট তার দিকে এগিয়ে এলো।

"সুধীর, তোমার এতো দেরি?"

"আমি তোমাকে ভিড়ের মধ্যে খুঁজছিলাম, তুমি যে এখানে দাঁড়িয়ে আছো তা কে জানে?"

"কি করব বল? আমার যে টিকিট নেই। সদরপথে গেলে কি অসভ্যরা সহজে ছাড়বে তুমি ভাবো?"

"না তা ভাবিনে। তবে এই দিক দিয়েই, অন্ধকারে, লাইন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলে যাই, এসো।"

কতকগুলো লাইন পেরিয়ে গিয়ে যেমনি এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছে, অমনি, অন্ধকারে অজগরের মত জ্বলন্ত চোখ মেলে, একটা খালি ইঞ্জিন তাদের কানের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

"সুধীর, গায়ে গরম জলের ছিটে পড়েছে ভাই।"

"একটুর জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছ, এই ভেবে খোদাকে ধন্যবাদ দাও।"

"তা দিচ্ছি, কিন্তু আমাদের কি ভগবান আছে?"

ততক্ষণে তারা তারের বেড়ার কাছে পৌঁছেচে, দুজনে উঁচু লাফ দিয়ে তারের বেড়া ডিঙিয়ে গেল। সুধীরের কাপড় আটকে খানিকটা ছিঁড়ে গেল।

"দেখচ সুধীর, কেবল আমি নয়, সবাই তোমাকে ভালবাসে। এই অপদার্থ তারের বেড়াটাও তোমাকে ধরে রাখতে চায়!"

"ঠিক বলেচ দেবেন। আমাদের চলবার পথে ভালবাসাটা এই তারের কাঁটার মতই অনাবশ্যক বাধা।"

দেবেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ফেলল, এবং চুপ করে তার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

কোপের পাশে এসে তারা দাঁড়াল, সেখানে একটা চালকবিহীন মোটর অপেক্ষা করছিল। সুধীর কয়েকবার হাতল ধরে ঘুরোতেই, অতি প্রত্যুষের শান্তি ভঙ্গ করে গাড়িটা যাবার অনিচ্ছা বারবার সশব্দে জানাতে লাগল। দেবেনকে পাশে বসিয়ে সুধীর মোটরে স্টার্ট দিল।

মোটর চলচে, দুজনেই চুপ। ভোর হয়ে আসচে। ছোট বড় পাহাড়ের চূড়াগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠচে, একটা গোপন পথ দিয়ে তারা মধুপুরের দিকে চলেচে। দেবেন এতক্ষণে কথা বল্লে, আকাশের গায়ে পাহাড়ের ছবি কেমন সুন্দর দেখাচ্চে, দেখচ সুধীর।

সুধীর তার কোনো উত্তর দিল না, স্টিয়ারিং হুইলটা চেপে ধরে ঈষৎ সংশয় প্রকাশ করে নিজের মনে বল্লে, পেট্রল ঠিক আসচে ত?

"তুমি কি মধুপুরেই আছো? বৈদ্যনাথে যাও না কখনো?"

হেড লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে সুধীর এই কথার জবাব দিল, যাই মাঝে মাঝে।

"বৈদ্যনাথ আমার বেশ লাগে। মনে পড়ে ছেলেবেলায় যখন প্রথম এসেছিলাম তখন মন্দিরের সিংহদ্বার খুঁজে বের করাই ছিল আমার প্রত্যহের কৌতূহল, ওটা খুবই শক্ত কাজ।"

স্টিয়ারিং হুইল্ ঘুরিয়ে গাড়িটাকে বাঁমুখো নিতে নিতে সুধীর বল্লে, হুঁ।

"কথা বলচ না কেন, তুমি কি ভাবচ?"

"কই, কিছু ভাবিনি ত? হাঁ, এবার তুমি কতজনকে দলে 'কনভার্ট' করলে?"

"খুব বেশি নয়, বাইশ তেইশ-জন হবে। তবে এমন ছেলে বেছে করেচি, যারা অপরদের দলে টানবার শক্তি রাখে। তারাও অনেককে করেচে। সব বৃত্তান্ত ও নামের তালিকা পরে পাঠাবো।"

"ডাকে পাঠিয়ো না। লোকের হাতে পাঠাবে, সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখে, বুঝেচ।"

"আচ্ছা।"

"আজ সন্ধ্যার পর তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো। কোথায় জানো? আমাদের গুপ্ত আড্ডায়, সেখানে দলের কর্তাদের সামনে আজ তোমার দীক্ষা হবে, এবং তুমি হবে দলের বিশেষ সভ্য।"

"দলের কর্তা? তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হবে?"

"কতকটা হবে বই কি। তোমাকে হয়ত তাঁরা দায়িত্বপূর্ণ নতুন কাজের ভার দিতে পারেন। তবে তার আগে তোমাকে হয়ত সেই ভাবে পরীক্ষা করতেও পারেন।"

"আমি তো বলেছি কাউকে খুনটুন করতে আমি পারব না, ওদিকে আমার মন বড় দুর্বল। তুমি কি তা বলো নি তাঁদের?"

"বলেচি, তাই তাঁরা তোমাকে রিক্রুটিংএর কাজই হয়ত দেবেন এমন আশা করচি। সহজে ছেলে পটাতে তুমি পারো আমি জানি। এবং এখন ছেলে যোগারই আমাদের সব চেয়ে দরকার—ধনবল আর জনবল।"

"কেন, এবার কি বড় রকমে কিছু শুরু হবে তুমি ভাবো?"

"তাই ত মনে হয়। যেমন টিকটিকিতে সারা দেশ ছেয়ে গেছে, আপনজনকে বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না, তেমনি শহরে পাড়াগাঁয়ে সব স্কুলে ও কলেজে এবার আমাদেরও জোর রিক্রুটিং চলচে। যত ইনটার্ন করচে, তার চারগুণ দলে আসচে, যদিও তাদের অধিকাংশই কাঁচা মাল, আর হয়ত প্রথম ধোপেই টিকবে না।"

সুধীর ডানদিকে হুইল ঘুরাল, গাড়িও ডাইনে ফিরল।

"সত্যি, এবার বড় বিস্তৃতভাবে কাজ হচ্ছে। শহরের বা পাড়াগাঁর কোনো ছেলেকে 'কনভার্ট' করতে গেলেই দেখি, তারা আগে থেকেই 'কনভার্টেড', এমন ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। একটা কিছু যে চলছে তার আঁচ সবাই যেন পাচ্ছে।"

"গোপনতার একটা রহস্যময় আকর্ষণ আছে তার শক্তি বড় কম নয়। তাইতো ছেলেরা দলে দলে এই দিকে ঝুঁকছে—"

এমন সময়ে সশব্দে সামনের টায়ার ফেটে মোটর থেমে গেল। 'এ আবার কি বিপদ!'—সুধীর নেমে গিয়ে টায়ার খুলে নতুন 'টায়ার' লাগাবার কাজে মন দিল ; এবং দশমিনিটের মধ্যেই মোটর চলতে শুরু করল।

চারিদিকে পরিষ্কার হয়ে এসেছে, কাঁচা রোদ পাহাড়ের মাথায় পড়ে ঝক্‌মক্‌ করছে। সুধীর 'ক্লাচের' সাহায্যে মোটরের গতি কমিয়ে দিতেই, দেবেন জিজ্ঞেস করলে, "আবার কি হল? পেট্রল ফুরিয়েছে নাকি?"

'ফুট্‌ব্রেক' চেপে গাড়ি থামিয়ে সুধীর বল্লে, "ঠিক তা নয়। তবে কি না, আমি রোজ সকালে চা খাই, এবং সঙ্গী যিনি থাকেন তাঁকেও দয়া করে চাখাই! এখন তারই আয়োজন হবে।"

গাড়ির আরেক কোণ থেকে স্টোভ্, কেটলি, চায়ের কাপ, লিপ্টনের কৌটা, বিলিতি জমাট দুধ, ইত্যাদি সব সরঞ্জাম বেরিয়ে এল, অল্পক্ষণেই দূরের পাহাড়ের রঙের মতো অপূর্ব চা তৈরি হল—ঘ্রাণে, পানে ও দানে তৃপ্তি!

পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সুধীর বল্লে, গোটা উত্তর ভারত জুড়ে সর্বত্র একই দিনে বিরাট বিপ্লব ঘোষণার দিন পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে, এ পথ হচ্ছে তারই উদ্যোগ—

দেবেন উৎসাহে লাফিয়ে উঠল, সমস্ত গরম চা তার হাতে গায়ে ও কাপড়চোপড়ে উথলে পড়ল। "তুমি জানো, সত্যি তুমি জানো—?"

"এবং এও জানি যে বিপ্লবের রক্ত-চাকা প্রথম আমাদের চূর্ণ করে, আমাদের বুকের উপর দিয়েই যাবে। সেই জন্যে প্রস্তুত হও।"

৬

দেবেন আবার ট্রেনে। বেলা প্রায় নটা। দূরে ছোটখাটো পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে সে গত রাতের কথা ভাবছিল।... সুধীর তাকে চোখ বেঁধে মোটরে করে কোন্ অজানা জায়গায় নিয়ে গেল, সেই কক্ষের মধ্যে একটা গোল টেবিলের পাশে কয়েকজন বসেছিলেন, সবারই মুখোসে মুখ ঢাকা—চোখের আবরণ খুলে তাদের দেখেই তার অন্তর অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিউরে উঠেছিল। তারপরে যে সব সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা হল সেই সব। অবশেষে রিভলবার হাতে করে ভারতবর্ষের মানচিত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকে শপথ করতে হল, যতদিন বেঁচে থাকবে এই গুপ্তদলের কাজ করতে হবে, তার কর্তার আজ্ঞা নির্বিচারে মেনে চলতে হবে, কোনোদিন এই দল ছাড়বে না বা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না—করলে রিভলভারের গুলিতে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত থাকবে।

এই ভয়ানক শপথ কি করে উচ্চারণ করল ভেবে সে আশ্চর্য হল। সুধীরের মোহময় মুখের দিকে চেয়ে সে নিশ্চয় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল, তাই দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের

স্বাধীনতা অত সহজে চিরদিনের মত বিসর্জন দিতে পেরেচে। আর সুধীর? সে তো জানে আমি তাকে কি রকম মনে মনে পূজা করি। সে কিনা অনায়াসে হেসে বলতে পারলে, এই শপথ ভাঙলে নিজের হাতে গুলি মেরে আমার মাথার খুলি ভেঙে দেবে? এত বড় আত্মদানের ফলে কি আমি তার কাছে এতটুকু আদর পাবার দাবি করতে পারি না? আমার এতো শ্রদ্ধা, এতো ভালোবাসার কি চিরদিন সে এই ভাবে প্রতিদান দিয়ে যাবে?

তার নতুন দায়িত্ব, নতুন কার্যভারের কথা চিন্তা করল। রাজসাহীর একটা গোটা বিভাগের সমস্ত কর্মীকে সংঘবদ্ধ করার কাজ এখন তার ঘাড়ে। সে এখন কলকাতা যাবে, সেখানে বাড়িতে থাকার তার একদিন মাত্র ছুটি, তারপরে রাজসাহী হয়ে তাকে কাটিহারে সুধীরের সঙ্গে মিলতে হবে। সুধীর সেই দিনই ডাউন ট্রেনে ভাগলপুর রওনা হয়েছে; প্রয়োজন হলে ভাগলপুরের এক ঠিকানায়, আরেক লোকের নামে, তার কাছে সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম করতে হবে। কাটিহার থেকে ফিরে তাকে রাজসাহী আর মালদায় কাজ করতে হবে।

এই সব কথা সে ভাবছিল, কিন্তু সব চেয়ে তাকে বেদনা দিচ্ছিল, আজ সকালে সুধীরের কাছে বিদায়-বেলার ঘটনা। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে গাড়ি ছাড়বার এক মিনিট মাত্র আগে, সুধীরের হাতটি হাতের মধ্যে চেপে ধরে দেবেন মিনতি করে চেয়েছে, তোমার হাতে একটি চুমু দিই ভাই? বন্ধুর অধিকারের এইটুকু দাবি! সুধীর তার উত্তরে হাত টেনে নিল, এবং দেবেনের গালে ছোট্ট একটা চড় মেরে বল্লে, এখনো দুষ্টুমি গেল না? সেই সামান্য অবহেলা ও আদরটুকু এখন দেবেনের সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে রয়েছে।

ক্রমশ গাড়ির বিপুল গতি তার এই সব তুচ্ছ সুখ-দুঃখ ভুলিয়ে দিল, চলার গতিছন্দ তার চিত্ত অধিকার করল। গ্রহ উপগ্রহ-সঙ্কুল চলিষ্ণু এই বিরাট বিশ্বজগতের বিপুল আকর্ষণ তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে অপূর্ব অনুভূতি জাগিয়ে দিল। তার কেবলি মনে হতে লাগল চলতে হবে, চলতে হবে! এমনি বিপুলবেগে বিরাট পথে। তার নাড়িতে নাড়িতে ঝঙ্কার দিয়ে অনাদি সুরে বাজতে লাগল—চলাই সত্য! জন্মে জন্মে যুগে যুগে লোকে লোকে! এই চলা হচ্ছে আত্মদান—নিজেকে দিয়ে দিয়ে যাওয়া, এবং দানেই মুক্তি। মানুষকে চলার পথে মুক্তি দিতে হবে, মানুষের বন্ধন মোচন করতে হবে। এই তো ব্রত সে নিয়েছে, তার নিজের সুখ-দুঃখের তুচ্ছ কথা ভাবনার অবসর তার কই,—তাকে যে মানুষের সেবায় নিঃশেষে আপনাকে ঢেলে দিতে হবে এখন।

সন্ধ্যার পর গাড়ি ব্যাণ্ডেল জংশনে দাঁড়াল, এইখানে তাকে গাড়ি বদল করে নৈহাটির গাড়িতে চাপতে হবে, হুগলি স্টেশনে একটি ছেলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে—হুগলি থেকে নৈহাটি হয়ে শিয়ালদহে নেমে বাড়ি গিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার বিশ্রামের ছুটিটা যথাসম্ভব পুরো ভোগ করবে, এই ছিল তার মতলব। কিন্তু বিপ্লবপন্থী যা ঠিক করে, পুলিশে তা ভেঙে দেয়—এই সনাতন কাহিনী।

ব্যাণ্ডেলে এসে দেবেনের প্রথম সন্দেহ হল সি-আই-ডি তার পিছু নিয়েছে, হয়ত মধুপুর থেকেই, সে লক্ষ্য করেনি। যে লোকটিকে সে সন্দেহ করেচে, সে খোলাখুলিই তার ওপর দৃষ্টি রাখচে এবং তার সঙ্গ ছাড়চে না। দেবেন একটা সন্দেশের দোকানে গিয়ে সামান্য কিছু জলযোগ করে, টিফিন ক্যারিয়ারে লুচি ও সন্দেশ ঠেসে নিয়ে, নৈহাটির গাড়িতে উঠল, সেই লোকটিও সেই গাড়িতে উঠল।

পরের স্টেশনে সে অন্য কামরায় গেল, লোকটিও একটা ছুতো করে সেই কক্ষে

উঠে বসল। এই পষ্ট ইঙ্গিতের পরে দেবেন, হুগলি স্টেশনে তার ছেলেটিকে দেখতে পেয়েও, আর ডেকে আলাপ করতে সাহস করল না। অবশেষে গাড়ি নৈহাটি স্টেশনে দাঁড়াল।

দেবেন জানালা গলিয়ে মুখ বার করে দাঁড়িয়েছিল, এবং কি করে টিক্‌টিকির দৃষ্টি এড়াবে তাই কল্পনা করছিল—এমন সময়ে ডাউনযাত্রী একটা গাড়ি এসে তাদের গাড়ির পাশেই দাঁড়াল। তার সামনাসামনি কামরায় একটি কিশোর বসেছিল তাদের গাড়ির দিকেই তাকিয়ে,—তার অপরূপ সৌন্দর্যে আহত হয়ে ক্ষণিকের জন্য দেবেন বিশ্বজগৎ বিস্মৃত হল।

ইতিমধ্যে টি-টি-আই তাদের কামরায় টিকিট পরীক্ষা করতে ঢুকেচে, দেবেনের সেদিকে খেয়াল নেই। চেকার তার কাছে এসে চাইল,—টিকিট। দেবেনের চমক ভাঙলো এবং একমুহূর্তেই ব্যাপারটা তার পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম হল যে এতদিন পরে এবার সত্যিই হাতে হাতে ধরা পড়েচে এবং সি-আই-ডি বেটার সামনে এখন এই ফিরিঙ্গি চেকারটার কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে।

তার পকেটে চার পয়সা দামের একটা বহু পুরোন টিকিট ছিল, সেইটে বের করে যেন চেকারের হাতে দিতে যাবে—এই সময়ে টিকিটটা হাত থেকে জানালা গলে মাটিতে লাইনের কাছে পড়ে গেল। চেকার তর্জন করে বললে, জলদি নিয়ে এস।

সামনের ডাউনযাত্রী গাড়ি তখন ছেড়েচে, এবং তাদের গাড়িরও বিদায়ের ঘন্টা বেজেচে, দেবেন নিচে নেমে গিয়ে, সামনের চলন্ত গাড়ির লোহার ডাণ্ডা ধরে উঠে পড়ল, এবং হাতল ঘুরিয়ে গাড়ির ভেতরে ঢুকল। গাড়ির লোকে এই নবাগতের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হল, বিশেষ করে সেই সুন্দর ছেলেটি, যে দরজার মুখেই বসেছিল।

দেবেনের পরিত্যক্ত গাড়িও চলতে শুরু করেছিল, দেবেন ও সি-আই-ডি যতক্ষণ দেখা যায় বিচিত্র চোখে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল; কেবল চেকারটা, এমন হতভাগা শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল দেখে তার অসৌজন্যে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল।

দেবেন স্থির হয়ে প্রথম প্রশ্ন করলে, এ গাড়ি কোথা যাবে?

সেই রাঙা ছেলেটি উত্তর দিল, লালগোলা। আপনি ও গাড়ি থেকে চলে এলেন কেন?

"আমাকে এই গাড়িতেই যেতে হবে।"

"আপনি কোথায় যাবেন?"

"আমি? কোথায় যাব ঠিক নেই, তবে রাজসাহী যাবার ইচ্ছা আছে। তুমি কোথা যাবে?"

"আমাকে এই নৈহাটিতে নামতে হত, যার আসবার কথা ছিল সে এল না। এখন আমি মালদায় যাব। আমায় নৈহাটি থেকে মালদার একটা টিকিট করতে হবে, কোন্ স্টেশনে করি বলুন তো?"

"ব্যস্ত কেন? রাণাঘাটে অনেকক্ষণ গাড়ি থামবে। সেইখানে কোরো।"

"তা তো করব। কিন্তু—কিন্তু একটা অসুবিধা আছে। আমার নেমে গেলেই ভালো ছিল।"

"টিকিট করার আবার অসুবিধা কি? তুমি ভেব না, আমি করে দেব। তোমার নাম কি? কি পড়?"

"এবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছি। আমার নাম মোহনলাল বসু।"

"সেকেণ্ড ক্লাসে পড়, তোমার বয়স কত? তেরোর বেশি হবে?"

"অন্তত পনের।" বলে মোহন একটু হাসলে।

"মালদায় কি আম খেতে যাচ্ছ?"

ছেলেটি হেসে বল্লে, অনেকটা তাই বটে। সেখানে আমার মামা রেজিস্ট্রী আপিসে কাজ করেন, আমাদের স্কুল খোলার এখনও দেরি আছে তাই যাচ্ছি। জানেন তো বেশি দাম দিয়েও ভালো আম কলকাতায় কম মেলে।

দেবেন প্রশ্ন করল, এর আগে তুমি মালদা যাওনি আর কখনো? বেশ ছোটখাটো সুন্দর শহরটি, নদীর ধারে ধারে বাঁধা রাস্তা চলে গেছে, আমার বেশ লাগে।

"এবার প্রথম যাচ্ছি। যদি ভালো লাগে, আর শরীর ভালো থাকে তবে মালদার স্কুলেই ভর্তি হব, বাবা বলেছেন। কেন জানি না, কলকাতায় রেখে পড়াতে বাবার বড় ইচ্ছে নেই।"

"মাকে বলোনা কেন যে আমি পাড়াগাঁয়ে থাকবো না।"

"মা তো নেই, ছোট মা আছেন। তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন, আদর করেন। বাবা বলেন যে আমি কলকাতায় থাকলে খারাপ হয়ে যাব তাই। আমার তো কখনই তা মনে হয় না। খারাপ হওয়া কি সোজা?"

দেবেন তার কথা শুনে একটু হাসলে,—"না, খারাপ হতে যাবে কেন? তুমি বেশ ভালো ছেলে; আমি দেখলেই বুঝতে পারি।" মোহনের নরম হাতখানি দেবেন নিজের হাতের উপর নিল। মোহন ষ্টেশনের গ্যাসের বাতির দিকে তাকিয়ে, মোহনের মতই হাসল, দেবেনের চোখ জুড়িয়ে গেল। ছেলেটি ঈষৎ দূরে বসেছিল, এবার দেবেনের পাশে ঘেঁষে এল। ঐ সুন্দর পোশাকে সাজানো সুকুমার তনু দুর্দম আবেগে বুকের মধ্যে টেনে নেবার একান্ত আকাঙ্ক্ষা দেবেন অতি কষ্টে সম্বরণ করল।

৭

নৈহাটি থেকে রাণাঘাট পৌঁছবার মুখে তাদের আলাপ বিচিত্রপথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। ভালবাসা—কখনো রেলপথে অঙ্কুরিত হলে, ক্ষণিকের মধ্যে এবং ক্ষণিকের জনাই তা লতায় পাতায় পল্লবিত ও ফলে ফুলে সফল হয়ে ওঠে। গাড়ির গতিবেগ যেন প্রেমেরও পাল্লা বাড়িয়ে দেয়। মিলন অভাবিত, পুনর্মিলন অনিশ্চিত, এবং বিদায়ের সময় কাঁটায় কাঁটায় সুনির্দিষ্ট—এই জন্যেই হয়ত পথিকের প্রেম সব বাধা লজ্জা ও সঙ্কোচ সহজে অতিক্রম করে আত্মপ্রকাশ করে।

দেবেনের মনে বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল রাণাঘাটে টিকিট চেক করবে। এবং সেই সি-আই-ডিটাও এতক্ষণে তারযোগে নিশ্চয় খবর দিয়েছে, এবং হয়তো রাণাঘাট থেকেই নতুন কেউ তাকে চোখে চোখে রাখবে। দেবেন ভেবেছিল যতক্ষণ না ট্রেন রাণাঘাট ছাড়ে ততক্ষণ স্টেশনে নেমে পায়চারি করলেই দুটো বিপদ একসঙ্গে এড়ানো যাবে, কিন্তু রাণাঘাটে ট্রেন থামতেই মোহন বল্লে, বড় খিদে পেয়েছে। কি খাওয়া যায় বলুন ত?

খিদে দেবেনেরও পেয়েছিল, আগের ট্রেনে লুচি ঠাসা টিফিনবাক্স ছেড়ে আসতে

বাধা হয়েছে—সেই শোক তার মনে জাগল, মোহনকে বললে, দেখছি কি পাওয়া যায় এখানে।

ওধারের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্লাটফরমের একজন মিঠাইওয়ালার কাছে সন্দেশ কিনছে, এমনসময় যা আশঙ্কা ছিল, টিকিটচেকার সেই কামরায় প্রবেশ করল। সেই ধারের টিকিট দেখতে দেখতে যখন চেকারটি তার পাশের প্রৌঢ় ভদ্রলোকের টিকিট দেখছেন, তখন সেই আসন্ন দুর্যোগে দেবেন সন্দেশটা একটু চেখে দেখলে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির টিকিটে ও হাফটিকিটে সাত-আটখানা ছিল, এবং তাঁর পুত্রপরিজন ছত্রাকারে সমস্ত কামরার এখানে-ওখানে ছড়িয়ে বসেছিল, তিনি হাতের ইঙ্গিতে একবার তাদের দেখিয়ে দিলেন।

দেবেনের সন্নিকটে এতগুলি টিকিট একসঙ্গে পেয়ে গিয়ে, সন্দেশক্রয়ে নিযুক্ত ছেলেটিকে প্রৌঢ়েরই আত্মীয় ভেবে তার কাছে স্বতন্ত্র টিকিট চাইবার কল্পনাও চেকারের মনে এল না। তার মনস্তত্ত্বের এই সুযোগ লাভ করে পাশের ত্রাণকর্তাকে দেবেন মনে মনে ধন্যবাদ দিল। কিন্তু দেবেন পেলেও, মোহন উদ্ধার পেল না, তার মাত্র নৈহাটি পর্যন্ত টিকিট করা ছিল, চেকার তার কাছে পেনালটি ইত্যাদি সহ দ্বিগুণ ভাড়া দাবি করে বসল।

দেবেন চেকারকে গিয়ে বল্লে, দেখছেন ত ছেলেমানুষ এবং ছাত্র,—সঙ্গে কোনো অভিভাবক নেই। একে ছেড়ে দেওয়াই আপনার উচিত।

চেকার বল্লে, তা আমরা পারিনে। তাতে আমাদের কর্তব্যের অবহেলা হয়। তবে আমি অন্য ব্যবস্থা করতে পারি যদি—

অন্য ব্যবস্থাটা কী তা দেবেন ও মোহন দুজনেই বুঝল, মোহন তার মানিব্যাগ খুলে দেখাল মাত্র একটা আধুলি আছে, তাতেই অন্য ব্যবস্থা সম্ভব হবে কিনা জানবার প্রত্যাশায় করুণ চোখে চেকারের দিকে চাইল।

দেবেন বল্লে, অন্য ব্যবস্থাতে কাজ নেই আপনি ওকে নৈহাটি থেকে মালদা পর্যন্ত ভাড়া নিয়ে রসিদ দিন, আমি টাকা দিচ্ছি।

"এতে আপনার পেনালটি দিতে হবে, কিন্তু অন্য ব্যবস্থায়—"

"তাহলে আপনি যান। যাতে পেনালটি না দিতে হয় সেই অন্য ব্যবস্থা আমরা গার্ডের সঙ্গে করে নেব। যে স্টেশনে নামব সেই স্টেশনে বা এখনই, গার্ডকে পুরো ভাড়া চুকিয়ে নিয়ে রসিদ নেব।"

অগত্যা চেকার টাকা নিয়ে রসিদ দিয়ে, অন্য ব্যবস্থার আশায় অন্য কামরায় গেল।

"আপনি টাকাটা দিলেন যে?"

"তাতে কি হয়েছে? যদি আমি না হয়ে তুমি হতে, তা হলে কি তখন তুমি আমাকে, বড় ভায়ের মত, এমনি সাহায্য করতে না? আচ্ছা, তুমি বসো, এক্ষুনি একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ে আমি আসছি।"

সুধীরকে তার করে দেওয়া দরকার, এবং রাণাঘাটে গাড়ি কিছুক্ষণ থামে, এ সুযোগ এই লাইনে আর কোথাও নেই। দেবেন এই তার করল—সুনির্মল দেব, প্রোফেসার, ভাগলপুর। রাজসাহী যাচ্ছি। এক হপ্তা পরে কাটিহারে যথাস্থানে মিলব। সুরেন্দ্র।

সুনির্মল দেবের নামে তার করলে সুধীরের পাবার কথা, আর সুরেন্দ্র হচ্ছে দলের দেওয়া দেবেনেরই সাঙ্কেতিক নাম। তার করে বেরুতে তার একটু দেরি হয়ে গেল,

ততক্ষণ ট্রেন চলতে শুরু করেছে,—গাড়ি ছেড়ে দিল অথচ দেবেন ফিরে এল না দেখে, ঠাসাঠাসি এত যাত্রী, তবু মোহনের বড় একা একা মনে হল। এখন কি করবে, নিরুপায় হয়ে তাই ভাবছে, এমন সময়ে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে হাসতে হাসতে দেবেন কামরায় ঢুকল। মোহন বিস্ময়ে ও আনন্দে অধীর হয়ে তার হাত চেপে ধরে বল্লে, আমি ভেবেছিলুম আপনি বোধহয় উঠতে পারলেন না।

"প্রায় সেই রকমই, চলন্ত গাড়িতেই, কয়েকটা কামরার ওধারে উঠেছিলুম।"

"আপনার খুব সাহস ত! যদি পড়ে যেতেন।"

"পড়ব কেন? ফ্লাইং চেকাররা কি করে আসে তবে?"

দেবেন তার অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে বসতেই মোহন এবার তার গায়ে হেলান দিল। যে সদয় ছেলেটি অনায়াসে এতগুলো টাকা দিয়ে তাকে বিপদে বাঁচাল, অপরিচিত হলেও, আপনজনের মত তার ওপর নির্ভর করবার অগোচর বাসনা মোহনের মনে জেগেছিল। দুজনেরই দুজনকে ভালো লেগেছিল, তাই যখন ঘাড় ফিরুতেই গালে গালে ঠেকল তখন কেউই মুখ টেনে নিল না।

"খিদে পেয়েছে বলছিলে, এসো কিছু খাওয়া যাক", দেবেন খাবার বের করে বললে, আমি তোমাকে খাইয়ে দি, কেমন? হাসিমুখে মাথা নেড়ে মোহন বল্লে, দিন। নিজের ও মোহনের মুখে খাবার তুলে দিতে দিতে দেবেন জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে? মোহন বল্লে, বেশ।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে মোহন বলল, যে গাড়িতে ভীড়, আজ আর কারু শোয়া হবে না।

"তা কেন? তুমি আমার কোলে মাথা রেখে শোও, আমি এই জানলায় হেলান দিয়ে ঘুমুই। এইটুকু জায়গাতেই দুজনের বেশ কুলিয়ে যাবে।" চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে ও গাল দুটি আস্তে আস্তে টিপে দিতেই অল্পক্ষণে মোহন তার কোলে, যতখানি সম্ভব, ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলায় লালগোলা ঘাটে গাড়ি থামতেই দেবেন, মোহনের ঘুম ভাঙিয়ে, উঠে যা দেখল তাতে তার চক্ষু স্থির! বুঝল সেই প্রতারিত সি-আই-ডি সহজে ছাড়বে না।

"এত পুলিশ চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কেন, দেবেনদা?"

"কি করে জানব ভাই? তবে তুমি এক কাজ কর, একলা ঐ রসিদ দেখিয়ে বেরিয়ে যাও, স্টিমারে আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো। আমার যেতে একটু দেরি হবে।"

এই লালপাগড়ী কনস্টেবলদের ব্যূহ একলা ভেদ করে যাবার উৎসাহ মোহনের ছিল না, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দেবেন এবার একটু জোর গলায় বল্লে, দাঁড়িয়ে থেকো না, যাও। নইলে বিপদে পড়বে। অগত্যা তাকে, ক্ষুন্ন মনে, যেতে হল।

চারিদিকে পুলিশ, সতর্ক পাহারা। প্রত্যেকের কেবল টিকিট নয়, চেহারা ভালো করে নিরীক্ষণ করে একে একে ছেড়ে দিচ্ছে। দেবেন আর কোনো উপায় না দেখে, গাড়ির ছাদে উঠল, সকলের দৃষ্টি সদর গেটে—যেখানে যাত্রীদের অগ্নিপরীক্ষা চলছিল সেইখানে বদ্ধ ছিল তাই কেউই তাকে লক্ষ্য করল না। দেবেন গাড়ির ছাদে ছাদে গিয়ে ইঞ্জিনের কাছে এসেছে, এই সময়ে ইঞ্জিনও তৎসংলগ্ন ব্রেকভ্যান খুলে দিল। দেবেন এই ভরসা করেই ছাদে উঠেছিল, এখন ইঞ্জিন, গাড়ি ছেড়ে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দেখে, সে গাড়ির ছাদ থেকে এক লম্বা লাফ দিয়ে ব্রেকভ্যানের ছাদে গিয়ে পড়ল। ইঞ্জিন বাঁশী

বাজাতে বাজাতে, পুলিশের ঘেরাও স্থান অবলীলায় অতিক্রম করে সামনে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে, দেবেনকে নিরাপদ স্থানে উত্তীর্ণ করে দিল। এক আনা দিয়ে পরের স্টীমার-স্টেশনের একটা টিকিট কিনে দেবেন একেবারে রাজসাহীর স্টীমারে গিয়ে উঠল,—এই দুর্যোগে আর গোদাগাড়ির স্টীমারে মোহনের সঙ্গে দেখা করতে তার সাহস হল না। মোহন আজ অযাচিত তাকে দেবেনদা বলে সম্বোধন করেচে, সেই মধুর কণ্ঠস্বর তার মন ভারি করে তুলল। ছেলেটিকে একটু আদর করে বিদায় দিয়ে আসতে পারল না,—সে এখন কি ভাবচে, অনুমান করে দেবেনের সারামন বিধুর হয়ে উঠল। পরাধীন জাতির যে ভালবাসবারও অধিকার নেই!—চার পয়সায় টিকিটখানি নাড়াচাড়া করতে করতে দেবেন এই সমস্যার কথাই ভাবছিল। স্টীমারের বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় অদূরে একটা ছোট নৌকা ডুবতে বসেছিল, আর সব যাত্রীরা নিরাপদে থেকে পরম কৌতুকে নৌকারোহীদের ভাগ্য-বিপর্যয় নিয়ে তখন আলোচনা করছিল।

অবশেষে যথাসময়ে রাজসাহীতে, ঐ চার পয়সার টিকিটখানিই টিকিট কালেক্টারের হাতে গছিয়ে দিয়ে দেবেন বেরিয়ে গেল। মোহনও প্রায় সেই সময়ে মালদা স্টেশনে নেমেচে।

৮

সেদিন মালদার মাঠে ফুটবল ম্যাচ ছিল, অশান্তও দেখতে গেছে। বিশাল মাঠের চারধার ছেলেয় ছেলেয় ভর্তি, সকলেই উৎসুক হয়ে খেলা দেখছিল। অশান্তর কি কারণে সেদিন মন ভালো ছিল না, সে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং যখন খুব জোরে উৎসাহধ্বনি ও হাততালি পড়ছিল তখনই কেবল খেলার দিকে মনোযোগ দিচ্ছিল। সমস্ত মাঠের মধ্যে, আপনার বলে ভাবতে পারে এমন একটা চোখ-জুড়ানো মিষ্টি মুখ সে নিজের অগোচরে খুঁজে ফিরছিল। কেউ তার দিকে ফিরে চাইলে, হয়তো সে তাকে ডেকে সহানুভূতিভরে দুটো কথা বলবে এইটুকুর দুরাশায় সে অনেকের কাছেই দাঁড়ালো, কিন্তু এই স্নেহতৃষাতুর সুশ্রী ছেলেটির উন্মুখ হৃদয়ের রহস্য কেউ বুঝল না। তার দেবেনের কথা মনে পড়ল।

খেলার দ্বিতীয়ার্ধে, এমনি উদ্দেশ্যহীন অন্য মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন সময়ে দূরের একটি ছেলের দিকে তার হঠাৎ চোখ পড়ল,—অস্তমান রবির আলো তার ছবির মত মুখখানি রাঙা করে তুলেচে। সেই প্রজ্বলিত রূপের টানে আকৃষ্ট হয়ে, কিশোর অশান্ত, কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার বুক দুরু দুরু করে কাঁপতে লাগল। ও যে তার সেই হারামণি! ছেলেটিও তাকে দূর থেকে লক্ষ্য করেছিল, অশান্তকে তারই কাছে আসতে দেখে সেও তাকে দেখছিল।

প্রথম কেউ কথা বলতে পারল না কেবল অপলক চোখের এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, চোখ ফিরিয়ে নিতেও পারল না। অশান্তই আগে কথা বল্লে, তোমাকে আমি এর আগে দেখেচি। কর্নওয়ালিস থিয়েটারে, নয় কি?

মোহন ঘাড় নেড়ে বল্লে, হাঁ।

অশান্ত বলল, কয়েকটি ছেলের সঙ্গে তুমি বায়স্কোপ দেখতে এসেছিলে। সে দিন আবার কি বৃষ্টি!

মোহন বল্লে, তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলে আমার বেশ মনে পড়চে।

অশান্ত ভাবছিল আমাকে ও ভোলেনি, আর মোহন ভাবছিল আমাকে ও মনে করে রেখেচে! বিচিত্র ভাবের সঞ্চারে তাদের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। মোহন তাকে ইঙ্গিত করে বল্লে, বসো। অশান্ত তার পাশে বসল।

"আমার নাম অশান্ত। তোমার নাম কি?"

"মোহন।"

"মোহন! খুব মিষ্টি নাম তো! মোহন!"

"অশান্তও বেশ নাম।" দুজনেই হাসল।

"সেদিন বায়স্কোপে কি ছবি দেখাচ্ছিল ভুলে গেচি। কিন্তু তোমাকে আমি ভুলিনি।"

"সেদিন বোধ হয়, জ্যাকি কুগানের ছবি ছিল।"

"জ্যাকি কুগান। তার ছবিও আমি দেখেচি। কিন্তু সে দিন একটা ডিটেকটিভ গল্প ছিল যেন। খুব মারধোর, লাফ ঝাঁপ, খুনোখুনি ব্যাপার!"

"তা হবে! কিন্তু ঐ ছোট্ট ছেলেটি কি আশ্চর্য। আমার ওকে খুব ভালো লাগে।"

"দেখতেও বেশ সুন্দর। কেমন হাসে, কেমন তাকায়! কেবল একটা দোষ কথায় কথায় বড় কাঁদে। তাতে কান্না পায়। ওর বাড়ি কোথায়, বিলেতে, না জার্মানিতে, জানো?"

"মামার কাছে শুনেচি আমেরিকায় কি একটা জায়গায়।"

"সেইখানে আমার যাবার ইচ্ছা আছে, তার সঙ্গে ভাব করতে; বড় হলে যাব।"

"কিন্তু সে ত তখন আর জ্যাকি থাকবে না, বড় হয়ে যাবে।"

অশান্ত মোহনের মুখে চেয়ে বল্লে, "তোমাকে অনেকটা জ্যাকির মত দেখতে। তোমার চুলগুলো, আর মাথার পিছন দিকটা ঠিক জ্যাকির মত। বেশ দিব্যি!"

মোহন বল্লে, কলকাতায় সেলুনে আমেরিকান ফ্যাসানে এমনি চুল ছেঁটে দেয়।

"তুমি কলকাতায় কোথায় থাকো? সেই বায়স্কোপ দেখার পর তোমাকে আমি কতদিন খুঁজেছিলুম।"

"কোথায় খুঁজেছিলে?"

"কর্নওয়ালিস থিয়েটারেরই আশেপাশে রাস্তায়।"

"রানী ভবানী স্কুলে খোঁজ করলেই আমাকে পেতে। সেইখানে পড়তে যাই।"

"তা কি আমি জানি। এখানে কবে এসেছ?"

অশান্তর হাতটি মোহনের কোলের উপর ছিল, তাতে টোকা দিতে দিতে, মোহন বল্লে, আমি আজ এসেছি। নরেন্দ্র বাবুকে চেনো? তিনি আমার মামা। দেখ দেখ, ঐ ছেলেটি কি চমৎকার খেলছে, কেউই ওর কাছ থেকে বল কাড়তে পারছেনা।

"গো-ও-ওল!...কেমন টুক করে গোল দিয়ে এল দেখলে? ও এত জোর 'স্কোর' করে যে "গোল্কি" ওর বল ধরতেই পারে না, আটকানো দূরে থাক।"

"কে ও? নিশ্চয় খুব বড় প্লেয়ার। স্কুলে পড়ে?"

"আরেশ ওর নাম। আমাদের সঙ্গে বোর্ডিংএ থাকে, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে।"

"তুমি বুঝি বোর্ডিংএ থাকো?"

"হ্যাঁ। এখন স্কুল বোর্ডিং সব বন্ধ, এখন বাসায় থাকি, বোর্ডিংএ না থাকলে পড়াশুনা হয় না।"

"যদি আমি মালদা স্কুলে ভর্তি হই তবে আমিও বোর্ডিংএ থাকবো।"

উৎফুল্ল হয়ে অশান্ত প্রশ্ন করল, তুমি কি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়? মোহনকে মাথা নাড়তে দেখে, তাহলে বেশ হয়েছে। দুজন এক সঙ্গে পড়াশুনা করব। কেমন?

একসঙ্গে থেকে পড়াশুনা করার প্রলোভন মোহনের মনেও জাগছিল, সে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, চল, একটু নদীর ধারে বেড়ানো যাক।

অশান্ত উঠল, বল্ল, খেলা দেখবে না আর? চল তবে। নদীর ধার দিয়ে আমাদের বাসায় যাবার পথ, কাছেই বাসা, তোমাকে যেতে হবে। বাসায় কেউ নেই, কেবল আমি মেজদা আর বৌদি থাকি। আর উলকা।

উলকা কে?

উলকা খোকা, খুব ছোট্ট। তিন বছর মাত্র বয়স।

বেড়াতে বেড়াতে মোহন বল্লে, পাড়াগাঁ জায়গায় আসতে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এখন আমার বেশ লাগচে। সমস্ত দুপুরটা একলা চুপ করে বসে বসে বাবার ওপর এমন রাগ হচ্ছিল, ভাবছিলুম দু তিন দিন বাদেই চলে যাব।

"না না, এত শীঘ্রি যেওনা। এখানে দেখবার অনেক জিনিস আছে। শুনেচি গৌড় পাণ্ডুয়ায় আশ্চর্য আশ্চর্য কত কি আছে। বিলেত থেকে লোক দেখতে আসে।"

"সত্যি? তা, আমি এত শীঘ্রি যাচ্ছিনা। তোমাদের বাসা আর কতদূর?"

দুজনে গলা জড়িয়ে ধরে যাচ্ছিল, মোহনের গলা থেকে হাত খুলে নিয়ে অশান্ত বললে, এই আমাদের বাসা। এসো আমার সঙ্গে।

মোহনকে তার নিজের পড়বার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। তার পরে বিছানার উপর খবরের কাগজ পেতে একটা বড় ফজলি কলা রেখে, কতকগুলো আম ছাড়িয়ে সাজিয়ে রেখে বল্লে, খাও। ছুরি দিয়ে কেটে চোকলা চাকলা কোরে দেব?

"না, অমনি কামড়ে কামড়ে খেতেই ভালো লাগে। কিন্তু তুমিও খাও।"

দুজনে খাওয়া শেষ করে দুজনের দিকে তাকিয়ে অকারণ একটু হাসল। যাদের কোনোদিন মিলবার আশা ছিল না, তাদের এই অভাবিত আশ্চর্য মিলন, হয়ত তাই এই হাসি।

অশান্ত জিজ্ঞেস করলে, মোহন তুমি গাইতে জানো? জানো? তবে একটা গাও না ভাই। কোন ভয় নাই। সেজদা বেড়াতে গেছেন, বৌদি ভেতরে রান্নাঘরে। গাও তুমি।

"তুমি শুরু কর আগে। আমি পরে ধরচি।"

অশান্ত রবিবাবুর একটা গান ধরল, মোহনও একটু পরে সুর মিলাল,—সে গান অনন্ত আশার, অসীম আশ্বাসের, মুক্ত যৌবনের—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই!"

গান শেষ হবার অনেকক্ষণ পরেও তার মোহ যেন ছেড়ে গেল না, চারিদিকে জুড়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে মোহন টেবিলের বইটই নাড়াচাড়া করছে দেখে অশান্ত বলে উঠল, "ওটা আমার 'এসের' খাতা, দেখো না। আমার হাতের লেখা বড় বিশ্রী।"

"আমারো ভালো নয়। তাছাড়া আমার বানান ভুল বড় বেশি। Whom লিখতে প্রায়ই আমি Whome লিখে ফেলি।"

"কই আগে দেখি তোমার লেখা, তবে খাতা ছাড়ব।" বলে অমূল্য সম্পত্তির মত খাতাখানা প্রাণপণে চেপে রাখল।

"আচ্ছা ফাউন্টেন দাও, লিখছি।"

অশান্ত বুক পকেট থেকে পেনটা খুলে দিল, ইংরিজি লেখো আগে।

মোহন অশান্তর একখানা বইয়ের কাগজমোড়া মলাটের ওপর লিখল—You are a very good boy.

"আচ্ছা বাংলা লেখো, দেখি।"

মোহন লিখল—আমি তোমাকে ভালোবাসি।

দুজনে দুজনের দিকে শুধু চেয়ে রইল। অভিভূত অশান্তর শিথিল মুঠো থেকে খাতা কখন খসে গেছে, কিন্তু সেদিকে কারুরই মনোযোগ নেই। লেখা ভালো কি মন্দ সে কথাও কেউ আর তুলল না। কিছুক্ষণ পরে মোহন কথা বল্ল, সন্ধ্যা হয়েছে। এখন আসি। কাল সকালে আসব আবার। সে উঠে দাঁড়াল।

অশান্ত বলিল, আচ্ছা এসো। না, না, কলমটা ফিরিয়ে দিয়ো না, এটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম।

মোহন তার পকেট থেকে একটা ছোটো লাল নীল পেনসিল বের করে অশান্তর হাতে দিয়ে বল্ল, তবে আমার উপহার এই পেনসিলটা তুমি নাও।

বন্ধুত্বের প্রথম উপহার, প্রথম পরিচয়! সেই ছোট পেনসিলটা হাতের মুঠো চেপে, অশান্ত, যেন প্রেমেরই প্রথম স্পর্শ অনুভব করল। মোহনকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে যখন সে ফিরল, তখন এক অপূর্ব অনুভূতির স্পর্শে তার মন সমাচ্ছন্ন।

৯

ভাগলপুর শহর ছাড়িয়ে কয়েক মাইল দূরে একটা পোড়ো বাড়ি। এই অঞ্চলটা আগে কোনোকালে হয়ত সমৃদ্ধ ছিল, এখন তার অবশেষ এই আধভাঙা বাড়িটা সেই পরিচয় দেয়। এই বাড়ির দু'মাইলের মধ্যে জনপ্রাণীর আর দ্বিতীয় কোনো কুটির নেই, চাষীদের গ্রামগুলো সব দূরে দূরে। অযত্ন-বর্ধিত গাছপালা লতাপাতায় অরণ্যাকারের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে কেবল এই রহস্যময় বাড়িটা।

এই বাড়িটির ভেতরে একটি কক্ষে বিপ্লবী গুপ্তদলের সভা বসেছিল, তেরোজন যুবক মিলে কি আলোচনা করছে, তার মধ্যে আমাদের সুধীরও আছে। মধ্যিখানে গোটাচারেক বাতি জ্বলছে, তখন রাত তিনটা হবে।

মাঝে মাঝে এক একটি ছেলে উঠে গিয়ে চারিদিক লক্ষ্য করে আসছিল, এবার ফিরে এসে একজন বল্লে, বাইরের অবস্থা বড় ভালো বোধ হচ্ছে না। বাড়ির চারধারে যেন কাদের আবছায়া দেখে এলুম। খুঁটখাট শব্দ হচ্ছে।

"সে কি! ভূত দেখলে নাকি?"

"আজ অমাবস্যা বটে। কিন্তু আমাদের ঘাঁটাতে ভূতও ভয় পায়। আচ্ছা আমি দেখে আসছি কি হয়েছে।"

দুর্জয় ফিরে এসে বল্লে, "বিপদ! পুলিশ বাড়ির চারিদিকে ঘেরাও করে আছে, বোধহয় সকলের অপেক্ষায়।

"পুলিশ! সর্বনাশ! কজন মনে হল?"

"একপাল।"

"আমরা তো মাত্র তেরজন। কি করা যাবে?"

একজন বল্লে, সম্মুখ যুদ্ধ ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? আত্মসমর্পণ তো কিছুতেই নয়!

"নিশ্চয়! মুক্তি চাই, জীবনে মুক্তি অথবা মরণে মুক্তি। পিঞ্জরের মধ্যে মরে বেঁচে থাকা আমার তো ভাই পোষাবে না!"

"তবে প্রস্তুত হও।"

টেবিলের ওপর তেরোটি রিভলভার সাজানো ছিল, প্রত্যেকে নিজেরটি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে গুলি পুরে ঠিক রাখতে লাগল।

দুর্জয় বল্লে, আজ যদি এই তেরোজন আমরা মৃত্যুবরণ করি তাহলে যে বিপ্লবীদের আমরা গড়ে তুলেচি এবং যাদের সঙ্গে কেবল আমাদেরই পরিচয় আছে তারা অকেজো হয়ে পড়বে ভেবে দেখেচো কি? এবং সেই সঙ্গে আমাদের ভাবী বিপ্লবের কল্পনাও আকাশে মিলিয়ে যাবে।"

"তবে কি করা যায় বল?"

দুর্জয় বল্লে, মৃত্যুবরণও নয়, আত্মসমর্পণও নয়। কয়েকজন মাত্র প্রাণ দিক্, বাকি সকলে সেই সুযোগে সরে পড়ুক। তারপর মরতে ত শীঘ্রি হবেই, দুদিন আগে আর পরে, এখন সবাই মিলে ব্যস্ত হলে কাজ করবে কে?

সুধীর জিজ্ঞেস করলে, তুমি কী ভেবেছ দুর্জয়দা, খুলে বল দিকি।

দুর্জয় ধীরে ধীরে গম্ভীর সুরে বলল, আমি একা বাড়ির সদরপথের দিকে বন্দুক হাতে দাঁড়াচ্চি। তোমরা সকলে সেই দিকে পায়ের শব্দ করে দৌড়ে যাবে, তাহলে পুলিশরা সেই দিকে ঝুঁকবে, আমি ঘন ঘন বন্দুক আওয়াজ করে তাদের কিছুক্ষণের জন্য বিভ্রান্ত করে দেব, সেই অবসরে কোণের গুপ্তপথ দিয়ে, নিঃশব্দে তোমরা চটপট সরে পড়বে।

সুধীর বল্লে, তা ত হল, কিন্তু তুমি—

দুর্জয় বল্লে, একজনকে মরতে হবেই। আমার সব কাজের ভার তোমাদের ওপর দিয়ে, তোমাদের কাছে আমি আজ সৈনিকের বিদায় চাই, প্রথম মৃত্যুর গৌরব আমাকে দাও ভাই।

সুধীর গাঢ়স্বরে বল্ল, তা হবে না দুর্জয়দা, আমাকেও তোমার সঙ্গে মরতে দাও। তুমি আমাকে ভায়ের মত ভালোবাসো আমি জানি, দাদার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার ভায়ের চিরদিনের অধিকার!

দুর্জয় সস্নেহে তাকে কাছে টেনে নিয়ে পিঠে চাপড় দিয়ে বল্লে, তবে, আমি আর সুধীর চল্লুম সদরপথে, তোমরা একটু পরেই, যেমন বল্লুম, করবে।

একসঙ্গে মরার আনন্দ সুধীরের মুখে চোখে ফুটে উঠল। এই যে তার সেই দুর্জয়দা, যে তাকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করেচে, তার চোখ খুলে দিয়েচে, তার অন্তরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েচে! আজ তারই সঙ্গে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে

করতে পাশাপাশি মৃত্যুশয্যায় চিরনিদ্রার আয়োজন,—তার মোহ, তার লোভ, তার আকর্ষণ কি কম!

সকলে তাদের দুজনকে শেষ আলিঙ্গন দিয়ে বিদায় নিল! একটি মাত্র রাইফেল ছিল—টোটা পুরে নিয়ে দুর্জয় সদর পথে গিয়ে দাঁড়াল; সুধীর তার অনুজ্ঞামত, পাশে একটু আড়ালমত জায়গায় রিভলভার হাতে প্রস্তুত হয়ে রইল—সীমানার মধ্যে এলেই সে গুলি ছুঁড়বে।

কয়েক মুহূর্ত হয়েছে, অত্যন্ত হৈচৈ করে বিপ্লবীরা যেন সদর পথ দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে—বিপুল পুলিশবাহিনী, যারা চারিদিক ঘেরাও করে জমজমাট হয়ে ঝিঁঝি পোকার গুঞ্জনের সঙ্গে নাসিকা গর্জনের সুসঙ্গত মিল হতে পারে কি না হয়ত এই পরীক্ষায় তন্ময় ছিল,—এই আকস্মিক ধুমধামে সচকিত হয়ে তারা এক মুহূর্তে ক্ষিপ্র হয়ে উঠল; ফলে তাদের জোট ভেঙে গেল, তারা সকলেই সদর পথের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সেই মুহূর্তেই সদরপথে বিরাট নির্ঘোষে দুর্জয়ের রাইফেল ঘন ঘন গর্জন করে উঠল,—অন্ধকার লক্ষ্য করে অদৃশ্য হাতের গুলি চলতে লাগলো।

এগারজন বিপ্লবী নির্দিষ্ট পথে পালিয়ে গেল, জমাদারের আদেশে পুলিশরা আবার যখন ঘেরাও হয়ে দাঁড়ালো, তখন খাঁচা প্রায় খালি হয়ে গেছে। পুলিশের দুজন রাইফেল শব্দ লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল, একটি গুলি এসে দুর্জয়ের হাতে বিদ্ধ হল। একটি মাত্র বাতির ক্ষীণ আলোকে আহত বাহুখানি সুধীরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দুর্জয় বল্লে ভাই, এটা চট করে বেঁধে দাও ত! সুধীর কাপড় ছিঁড়ে ক্ষতস্থান ভালো করে বেঁধে দিল।

অল্পক্ষণেই পুলিশের সার্চলাইট জ্বলে উঠল। দুর্জয় বল্লে, এবার ধরা পড়ে গেছি; ওরা দেখতে পাচ্ছে, আর নিস্তার নেই। আমার অসমাপ্ত ব্রত, তুমি ছাড়া কেউ উদ্‌যাপন করতে পারবে না, তোমার দাদার শেষ অনুরোধ রাখো, এখনও পালাও।

তার চোখের ভাবে, তার কণ্ঠস্বরে সুধীর বিচলিত হল। সে দুর্জয়ের আহত হাতখানি বুকের মধ্যে চেপে ধরে বল্লে, তুমি বলচ, আচ্ছা, আমি পালাচ্ছি। তোমারই প্রাণ, তোমার কাজেই দিয়েছি, তোমার কথায় আরো কিছুদিন ধরে থাকব। কিন্তু—

"আর 'কিন্তু' নেই, 'কিন্তু' পরজন্মে যখন আবার আমরা মিলব, তখন সেইখান থেকে স্বাধীন ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে আমাদের 'কিন্তু' হবে। এই জন্মে আদর করতে পারিনি, ভালোবাসবার অবসর পাইনি, নিশ্চিন্ত হয়ে দু দণ্ডের জন্য মিলতে পারিনি—সব 'কিন্তু' সেই দিন, সেইখানে। কেমন?"

সুধীর হাসল। বল্ল, কিন্তু আমাকে আরো কিছুক্ষণ তোমার কাছে থাকতে দাও।

সে কথায় উত্তর না দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলে, দুর্জয় বন্দুকের শেষ গুলি লক্ষ্য করল, তা এক জনের ললাটে গিয়ে মৃত্যুর মোহর দেগে দিল। তারপরে নীরব। দুর্জয় বল্লে, এইবার ওদের পালা। আমি মাথা উঁচু করেই আছি। পুলিশের কর্তা বুঝতে পেরেছিলেন গুলি ফুরিয়েছে, তিনি বল্লেন, গুলি ছুঁড়োনো, তবে প্রস্তুত থাকো, শত্রুকে জীবন্ত ধরা চাই।

তারা দুর্জয়ের দিকে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। দুর্জয় একটু হেসে বল্লে, ওরা বন্দী করতে চায়। সুধীর, তোর পিস্তলে গুলি আছে? দেখি, যা, এইবার তুই পালা। পিস্তল

নিজের ললাটের উপর লক্ষ্য করল, তার অগ্নিমুখ অধর সেখানে মৃত্যু-চুম্বন এঁকে দিল। সুধীর নিস্পলক চোখে চেয়ে রইল।

দুর্জয় শুয়ে শেষ কথা বল্লে, ওরা এসে পড়েছে। পালা পালা। সত্যিই তারা এসে পড়েছিল, সুধীর গুপ্তপথে পালালো। পুলিশের কর্তা প্রবেশ করলেন, দুর্জয়ের দুর্জয় প্রাণ তখনো অবশিষ্ট ছিল। কথা দিয়ে নয় জীবনের শেষ হাসি দিয়ে সে তাঁর অভ্যর্থনা করল। পুলিশের বড় কর্তা টুপি খুলে এই বীরের প্রতি তাঁর শেষ সম্মান দেখালেন।

১০

সুধীর বেশ পালিয়েছিল, কিন্তু একটা পুলিশ কি করে জানতে পেরে তার পিছু নেয়, ঝোপঝাপ গাছপালার আড়ালে অনেক দূর গিয়ে সুধীরের কানে লাগল কেউ যেন তার অনুসরণ করছে খোলা-মাঠে পড়েই পিছনে তাকিয়ে তার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচল। সুধীর চোঁ চোঁ দৌড় দিল, জমাদারও তাড়া করে ছুটল। তার হাতে গুলি ভরা সঙ্গীন-বন্দুক ছিল, কিন্তু বিদ্রোহীকে জ্যান্ত ধরে দেওয়ার পুরস্কারের লোভে তার ব্যবহার করতে সে প্রস্তুত ছিল না।

প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে পাথরের ঠোক্করে সুধীর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, তার সর্বাঙ্গ ছেঁচড়ে গেল, পায়ের দু'তিনটা নখ আমূল উড়ে গেল, জমাদারটা প্রায় তার পিঠের উপর এসে পড়েছে তখন।

কয়েক মুহূর্তেই লাফিয়ে উঠে আবার ছুটল, জমাদারও তার পিছন-পিছন সমানে দৌড়ে চলেছে, কখনো কখনো তারা এত কাছাকাছি হয়ে পড়ছিল যে বন্দুকের সঙ্গীনের ধারালো মুখ সুধীরের পিঠে খোঁচা দিয়ে রক্তপাত করছিল। পথের পাথর আর কাঁকর পায়ে বিঁধছে—সেই উগ্র তৃষাকুলনের মুখে রক্তের ছিটা ছিটিয়ে সুধীর ছুটেছে।

অবশেষে শহরের কাছাকাছি এসে পড়াতে সুধীরের মনে আশা হল,—সে একটা পাক দিয়ে একটা প্রাচীর লক্ষ্য করে কোনাকুনি দৌড়াতে লাগল, জমাদার এই হঠাৎ চালে একটু পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। মানুষ-উঁচু প্রাচীর! সুধীর উঁচু-লাফ দিয়ে অবহেলায় সেটা পেরিয়ে গেল। জমাদার তা পারল না, একটু ঘুরে দরজা দিয়ে ঢুকে দেখল সুধীর বেশ একটু এগিয়ে গেছে। তার কিছু পরে একটা কোমর-উঁচু বাঁশের বেড়া, সুধীরের মত জমাদারও এটা সহজেই লাফ মেরে ডিঙিয়ে গেল, কিন্তু একটা আলে লেগে তার বন্দুকটা বেড়ার এদিকে ছিটকে পড়ল, পুনরায় লাফিয়ে গিয়ে সেটা তুলে আনতে গেলে সুধীর চোখের বাইরে চলে যায়, অতএব সে বাসনা তাকে ছাড়তে হল।

তার পরেই রেলপথ, সুধীর দৌড়ে সেই উঁচু বাঁধের উপর উঠেছে ঠিক সেই সময়ে মেলগাড়ি প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে। সুধীর পেরিয়ে যেতেই গাড়িটা এসে পড়ল, এক মুহূর্ত দেরি হলেই সর্বনাশ হত! জমাদার গাড়িতে বাধা পেয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াতে বাধ্য হল। রেলের বাঁধ থেকে নেমেই একটা ছোট্ট নদী, একটিমাত্র জেলে-ডিঙি ঘাটে বাঁধা ছিল, সুধীর লাফিয়ে ডিঙিতে উঠেই লগি ঠেলে দিল, জমাদারকে তখন সাঁৎরে পার হতে হল।

তারপরে একটা ছোট খাল, জল তাতে কম, কাদাই বেশি। সুধীর লম্বা লাফে সেটা

তারপরে একটা ছোট খাল, জল তাতে কম, কাদাই বেশি। সুধীর লম্বা লাফে সেটা পেরুল দেখে জমাদার সাহেব তার অনুকরণ করতে গিয়ে খালের মাঝে ঝপাৎ করে পড়লেন। জল ঘেঁটে ও কাদা মেখে উঠে এবার সে মরিয়া হয়ে ছুটল, কেননা শহরের মধ্যে ঢুকলে আর পাবার আশা নেই। নগর-প্রান্তে জমিদারের বিলাস-ভবন, তার দরজা খোলা পেয়ে সুধীর ঢুকে পড়ল, জমাদারও অনুসরণ করল, বাড়ি খালিই পড়েছিল, সদর পথে বেরিয়ে দুজনেই শহরের পথে পা দিল। দৌড় দৌড় দৌড়! ভোর রাত, রাস্তায় লোকজন কেউ নেই, দুজনে ছুটে চলেছে।

এবার সামনে একটা বাগানবাড়ি, তার পাঁচ-হাত-উঁচু প্রাচীর। কাছেই একটা বাঁশ পড়েছিল, সেইটার সাহায্যে লাফ দিয়ে প্রাচীর ডিঙিয়ে সুধীর বাগানের মধ্যে গিয়ে পড়ল। জমাদার সেই বাঁশটাকেই অবলম্বন করে অনেক আয়াসে ভেতর নামল, তখন সুধীর বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

একতলা পেরিয়ে দোতলায় উঠেই সুধীর দেখতে পেল একটি ঘরে কয়েকজন হিন্দুস্থানী যুবক মাতাল হয়ে পড়ে আছে, তার মধ্যে একটি বাইজীগোছের মেয়ে মদের নেশায় অচেতন। চারধারে মদের চাট ছড়াছড়ি, এখানে একজনের বমি, ওখানে কয়েকটা খালি করা গেলাস গ্লাস, এককোণে একজোড়া বাঁয়াতবলা। নাকে কাপড় দিয়ে এগিয়ে যেতেই, আরেকটি কক্ষ থেকে অসহায়া নারীর আর্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সুধীর নিজের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে সেইদিকে ছুটল।

একটি বাঙালী যুবতীকে ঘিরে কয়েকটি বেহারী যুবক আক্রমণের উদ্যোগ করছিল, মেয়েটি এতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণপণে শত্রুদের ঠেকিয়েছে, এখন তার সব জোর ভেঙে পড়বার মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাবড়ালো, ছুরি হাতে দুজন ওটিকে দাঁড়িয়ে একজন সঙ্গীদের উৎসাহ দিচ্ছিল, সুধীরের বিরাট চড়ের বিদ্যুৎ-স্পর্শে হতজ্ঞান হয়ে বেচারা তৎক্ষণাৎ ঘুরে পড়ল। সুধীর ছুরিটা হাতে করে ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো।

বাঙালী দেখে মেয়েটির প্রাণ ফিরে এল, সে আর্তস্বরে বলল, আমাকে রক্ষা করুন মশাই। এরা তখন থেকে আমার লাঞ্ছনার বাকি রাখেনি।

"আপনাকে এরা ধরে এনেছে?"

"হাঁ, প্রায় একঘণ্টা হবে। ভোর রাতে বারান্দায় বেরিয়েছি, এরা সেখান থেকে মুখ বেঁধে জোর করে নামিয়ে এখানে ধরে এনেছে। আপনি না এসে পড়লে আমার কি সর্বনাশ হত!"

মেয়েটি শিউরে উঠল। বাতির আলোয় সুধীর দেখল, বাঙালী-ঘরের বিধবা মেয়ে, এবং তার রূপ বাতির আলোর মতই উজ্জ্বল, পতঙ্গের সমান আকর্ষণের বস্তু। সে মেয়েটিকে বল্লে, আমার তো দাঁড়াবার সময় নেই। আমি বিপ্লববাদী, পুলিশ পিছনে তাড়া করছে, এখুনি পালাতে হবে। এই ছুরিটা নিন, এইটা হাতে করে দরজা খোলা আছে বেরিয়ে সোজা বাড়ি চলে যান, কোনো ভয় করবেন না, ভোর হোয়ে এসেছে।

মেয়েটি লোকগুলোর দিকে চেয়ে ইতস্তত করতে লাগল, তারা এই ব্যাপারে একেবারেই অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সুধীর তার মনের ভাব আন্দাজ করে বল্ল, আপনি ভয় পাবেন না। এই কাপুরুষগুলো, ওই রামছোরা থাকতে, আপনার কাছে এগুবেনা, যদি এগোয় আপনি কোন দ্বিধা না করে বসিয়ে দেবেন। আমার দুর্ভাগ্য, আপনাকে নিজে গিয়ে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে পারলুম না।

মেয়েটি বল্লে, আমি বুঝেছি। তোমাকে এগিয়ে দিতে হবে না। ভাগলপুরের পথঘাট আমার চেনা, ছোটোবেলা থেকে এখানে আছি। কিন্তু আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

সুধীর হেসে বল্লে, আমার সঙ্গে? সামনে মৃত্যু, পিছনে মৃত্যু, আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না দিদি,—

জমাদার এই সময়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। পুলিশ দেখে বেহারী বদমায়েসরা যে যেদিকে পারল পালালো। সুধীর তাদের কাণ্ড দেখে হেসে বলল, আর ত তোমার ভয় নেই দিদি, এবার আসি তবে।

জমাদার হাত বাড়িয়ে ধরতে যাবে, সুধীর তড়িৎ-গতিতে পাশ কাটিয়ে এক লাফে বারান্দার রেলিঙের উপর উঠে দাঁড়ালো। কি সর্বনাশ! তার পরমুহূর্তেই একতলার ছাদ থেকে জোড়পায়ে নিচে লাফিয়ে পড়ল, এবং পড়েই সটান দৌড় দিল। জমাদার তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি দিয়ে নেমে তার পিছনে দৌড়াল। কেবল মেয়েটি স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে ভীত চক্ষে সেইদিকে চেয়ে রইল।

এপথ সেপথ ঘুরে ফিরে অবশেষে সুধীর একজায়গায় এসে দাঁড়াল। সেখানে একটা তেতলা বাড়ি তৈরি হচ্ছিল, তারই বাঁশের ধারা বাঁধা ছিল, সুধীর লাফ দিয়ে সেই ধারা ধরে উপরে উঠতে লাগল। জমাদারকেও ধারা বেয়ে উঠতে হল, তারা শেষ পর্যন্ত উঠল, তখনও একতলা দোতলা বা তেতলার ছাদ পাতা হয়নি, কেবল বড় বড় লোহার কড়িগুলো সাজানো রয়েছে। সুধীর সেই তেতলার ছাদের অপরিসর কড়ির উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো, অপেক্ষাকৃত পরিসর ছাদের দেয়ালের উপর বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে তার এই মরিয়ার মত দুঃসাহসিক কার্য দেখে জমাদারের মাথা ঘুরে গেল।

সেখান থেকে জমাদারকে সম্বোধন করে সুধীর প্রথম বাক্যালাপের সুযোগ পেলে,—জমাদার সাহেব, মেজাজ আচ্ছা ত? চলে এসো ধরবে এসো, আর আমি পালাব না, আর দৌড়াবই বা কোথায়? অমন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়িয়ে থেকো না জমাদার সাহেব।

জমাদার মনের রাগ যথাসাধ্য চেপে শুধু বলল, তুম শালা ডাকু হ্যায়!

সুধীর হেসে জবাব দিল, ওতো ঠিক হ্যায় জমাদার সাহেব। লেকিন তুমি কি করে চাকরি রাখবে আমি কেবল ওই ভাবতা হ্যায়। ভোর তো হো গিয়া, এখন বাসামে যাকে, শরীরমে যে বহুত কাদা উদা লাগা হ্যায়, ওসব তো ধুয়েটুয়ে থোরা সভাভব্য হতে হবে জমাদার সাহেব।

জমাদার সমস্ত ক্রোধ হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে বল্ল, তুম্‌কা মাফিক বদ্‌মাসকো পাকড়েনেসে একদফে দেখ লেতা হাম।

সুধীর উচ্চ হাস্য করে বলল ওতো জরুর তুম্ দেখতা জমাদার সাহেব, হাম্ ধরা দেনেসে তো তুম হাম্‌কো গোঁফমে বাঁধকে লে যাতা—ও তো ঠিক হ্যায়! লেকিন, আমি এখন এই ভাগলপুরমে ভাগ যাতা, তুম খাড়া হোকে দেখো।

এই বলে সে কড়ি পার হয়ে গিয়ে ওধারের দেয়ালের উপর দাঁড়ালো, সেখানে একটা বাঁশের মাথায় মোটা দড়ি বাঁধা ছিল, তাই ধরে ঝুলে দু'তিন দোলা খেয়ে মাঝের রাস্তাটা শূন্যে শূন্যে টপকে গিয়ে সম্মুখের দোতালা বাড়ির ছাদে গিয়ে পড়ল। জমাদার এগুতেও

পারে না, নামতেও পারে না, কেবল দাঁড়িয়ে দেখতে পেলে, সুধীর এবাড়ির ছাদ থেকে ওবাড়ির ছাদ পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সিঁড়ি থেকে নেমে দোতলাতে পা দিয়ে সুধীর অপরিচিত বাঙালী ভদ্রলোক দেখে নিরাপদ-আশ্রয় পেয়েছে বলে মনে করল, সে এতক্ষণে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ঝিম ঝিম করে সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এল।

ভদ্রলোকটি কিন্তু তাকে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে ভীষণ কণ্ঠে বললেন, তুমিই আমার সর্বনাশ করেছ? বল বেটা আমার মেয়ে কোথা?

সুধীরের চট করে সেই মেয়েটির কথা মনে হল, এবং কন্যা-শোকাতুর পাগলের মত লোকটিকে দেখে ব্যাপারটা সে একটু আন্দাজ করল। কিন্তু সব শক্তিই যেন তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল, সে শুধু বলল, আপনার মেয়ে? তাঁকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গেছল, তিনি উদ্ধার পেয়েছেন, আসছেন। আমি বিপ্লববাদী, আমাকে আশ্রয় দিন—

আর কিছুই সে বলতে পারল না, তার মূর্ছিত সুঠাম দেহ প্রৌঢ়ের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। তার মেয়ে উদ্ধার পেয়েছে, আসছে, আনন্দে প্রৌঢ়ের যেন বুক ফেটে যাবার উপক্রম হল, ক্ষণপরে সচেতন হয়ে তিনি দেখলেন তাঁর পায়ের কাছে পড়ে আছে রক্তরঞ্জিত ছিন্ন বস্ত্র বাংলামায়ের আদরের দুলাল!

১১

কয়েক দিনেই সুধীর বেশ সেরে উঠেছে, এবার তাকে অনিলা ও তার বাবার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে এই কথাই হয়ত সে ঘরের এক কোণে আরামচেয়ারে বসে বসে ভাবছিল। অনিলার স্নেহের সেবা এই ক'দিনেই তার সৈনিকের প্রাণে যেন গৃহস্থের শান্তিনীড় রচনা করে দিয়েছে।

মানুষের হৃদয় এমনই রহস্যময় যে, এই যেখানে মরুভূমির শুষ্ক তৃষ্ণা আর্ত জ্বালায় খাঁ-খাঁ করছে, একটু আদরে তা যে এক পলকেই সিক্ত স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে তাই নয় হয়তো বানও ডাকে। মনের এহেন পরিবর্তনে সুধীর পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কেননা দেহের বাঁধনের চেয়ে স্নেহের বাঁধনকেই সে বেশি ভয় করত।

অনিলা এক বাটি গরম দুধ হাতে হাসিমুখে প্রবেশ করে বলল, চোঁ চোঁ করে এক চুমুকে এইটুকু খেয়ে ফেল ত, দেখি কেমন বীর।

এই বস্তুটি গলাধঃকরণ করতে সুধীরের অমৌন অসম্মতির অন্ত ছিল না, এবং সেজন্যই তাকে সাধাসাধি করে খাওয়াতে অনিলার বেশ লাগত, কিন্তু সুধীর আজ বিনা বাক্যব্যয়ে দুধ খেয়ে ভালো ছেলেমির পরিচয় দিল দেখে সে একটু বিস্মিতই হল। সে একটু হেসে বললে, হাঁ, দেশোদ্ধার করতে পারবে বটে!

"কিন্তু দিদি, পাণিনি যে তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন; দুগ্ধ বীরের খাদ্য নয়, বিড়ালের খাদ্য, তা জানো কি?"

"জানি বইকি ভাই, দুটি প্রাণীকেই চেনবার একটি মাত্র উপায়। তা হচ্ছে গোঁফ।"

"কিন্তু আমার তো তা নেই।"

"তবে তুমি বীরও নও, বিড়ালও নও।" দুজনেই হেসে উঠল। অনিলা কহিল, এতক্ষণ

মুখ চুপ করে বসে বসে কি ভাবছিলে বল তো? একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে সুধীর উত্তর দিল, একজনকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারচিনে, তার কথাই ভাবচি।

কে সে? জিজ্ঞেস করতেই অনিলার সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সে? সে আমার দুর্জয়দা।

এই কথা বলতে সুধীরের চোখে যেমন আলো জ্বলে উঠল, অনিলার মুখের আলো কে যেন এক ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলে।

তাকে তুমি খুব ভালোবাসো?

হ্যাঁ, সেও আমাকে তার ভায়ের মত ভালোবেসেচে; কিন্তু সে আর নেই দিদি!

সুধীরের দুটি চোখ করুণ হয়ে এল, অনিলা সমবেদনায় তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"তোমার কে কে আছেন সুধীর?"

"বাপ মা ভাই বোন কেউ নেই আমার, কিন্তু দুর্জয়দার মধ্যে একাধারে আমি সবাইকেই পেয়েছিলাম—অমন গভীর স্নেহ এ জীবনে কারু কাছে পাইনি—"

"আমার একটি কথা রাখবে ভাই?"

সুধীর অনিলার দিকে চাইল। বলল, কি দিদি?

"ফি বছর ভাইফোঁটার দিন ভগলপুরে আসবে?"

একটুখানি হেসে সুধীর বল্লে, তোমাকে ভুলব না দিদি। আমরা রক্তবীজের বংশ আমাদের মৃত্যু নেই বটে,—কিন্তু যদি সশরীরে বেঁচে থাকি তবেই আসতে পারব।

এর পরে আর কারোরই কথা সরল না। অনিলা 'রুণুকে নীচে থেকে তোমার খাবার নিয়ে আসি' বলে আঁচলে চোখ মুছবার জন্য অন্য ঘরে গেল,—এই বিপ্লবী তরুণের করুণ সমাপ্তির ভাবী কাহিনী যেন ছবির মত তার চোখের উপর স্পষ্ট দেখে বেদনায় শিউরে উঠল।

সত্যই দুর্জয় সুধীরের জীবনের অনেকখানি দখল করেছিল। তাকে হারাবার এত বড় ব্যথা সুধীর সামলে উঠতে পারত কিনা কে জানে যদি না অনিলা তাকে ভায়ের সমাদরে ডেকে এনে অভিনব রাজ্যের রাজার অধিকারে অভিনন্দিত করত। দুর্জয়দার কথা ভেবে সুধীরের সারা বুক যখন সাহারার শূন্যতায় হু হু করে উঠত, পরমুহূর্তেই অনিলার হাসিমুখ যেন সেই শূন্যতার মধ্যে চাঁদের আলো হয়ে ভরে যেত। তেমনি স্নেহ ফিরে পেলে তারই মাঝে মানুষ হারানো প্রিয়জনকেও ফিরে পায় হয়ত।

এই কয়দিন কেবলি তার দুর্জয়ের কথাই মনে পড়েচে, তার প্রথম সাক্ষাৎ, প্রথম আলাপ, প্রথম পরিচয়ের কথা,—কত দিনের কত খুঁটিনাটি, কত ঘটনা। যেদিন দুর্জয় প্রথম তাদের বোর্ডিংএ বেড়াতে আসে তখন আর সব কৌতূহলী কিশোরদের মধ্যে বসে সেও তাকে দেখেচে। সেদিন দুর্জয় তাকে একটি কথাও বলেনি, কেবল বার বার তার দিকে তাকাচ্ছিল। অতগুলি ছেলের মধ্যে সেই যে দুর্জয়ের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হয়েচে এইটুকু উপলব্ধি করে সেদিন সুধীরের মনটা কেমন সুখে ভরে উঠেছিল।

তার পরদিন টিফিনের ঘন্টায় স্কুলের ঘেরা জায়গার মধ্যে আবার দুর্জয়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল, চোখাচোখি হতেই কিসের টানে সে যে তার কাছে এগিয়ে গেল তা সে নিজেই জানে না। কাছে যেতেই দুর্জয় তাকে বুকের ওপর টেনে নিয়েছিল, সেও বিদ্যুতের

মতো দুটি হাত তার গলায় মালার মত পরিয়ে দিয়েছিল,—এর আগে তাদের একটি কথাও হয়নি অথচ এমনই মিলনের জন্য যেন তারা মনে মনে প্রস্তুত হয়েছিল।

দুর্জয় কেবল তাকে বল্লে, আমার সঙ্গে এসো, কথা আছে। অমনি সে একটুও না ভেবে পুঁথিপত্র ক্লাসেই ফেলে রেখে তার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। কে সে দুর্জয়, কোথায় থাকে, কি করে, তার কিছুই ত সে জানত না, জানা দরকারও মনে করেনি; আর সব ছেলের কাছে শুনেছিল সে নাকি ভবঘুরে, তারাও তার বেশি কিছু জানত না;—অথচ এই অপরিচিতের আহ্বানে বেরিয়ে পড়তে তার বাধেনি।

সেই দিনই তার জীবনে স্বদেশ-ব্রতের মন্ত্রদীক্ষা, দুর্জয় সেই দিনই তাকে ভাগলপুরে নিয়ে আসে, দুদিন পরে সে যখন পরিত্যক্ত বোর্ডিংএ ফিরল তখন সে অন্তরে অন্তরে নতুন মানুষ,—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও হেডমাস্টারের পীড়নেও এই দুদিনের রহস্য সে প্রকাশ করেনি। এমনকি "রাস্টিকেশনের" রাঙাটীকাতেও তার ভয় হয়নি।

সুধীর আগে ভালো ছেলে ছিল না, একটি খারাপ ছেলের পাল্লায় পড়ে বদভ্যাস শিখে নষ্ট হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল, দুর্জয় তার এই গুপ্ত তথ্য কি করে জানল সেই জানে, কিন্তু সে যখন খোলাখুলি জিজ্ঞেস করল তখন সুধীর অকপট অশ্রুজলে সব কাহিনী খুলে বলে মনে সেদিন কী শান্তি পেয়েছিল! তারপর থেকে দুর্জয়ের উপদেশে সে ভালো ছেলে হয়ে গেল, এমনকি আর সব হতভাগা ছেলেদের এই প্রাত্যহিক আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করাই হলো তার বড় কাজ।

দুর্জয় তারপর থেকে যখনই পারত তাদের বোর্ডিংএ এসে কিছুদিন থাকত, দুর্জয়ের নানান কাজের মধ্যে তার জন্য আসাটাও যে একটা কাজ ছিল, দুর্জয় না বললেও এমনি একটা ধারণা সুধীরের মনে বদ্ধমূল ছিল। তাই দুর্জয় এলেই তার সমস্ত মুহূর্ত সে যেন হরণ করে নিত, তার ভালো করে খাওয়া হত না, ফাঁকি দিয়ে স্কুল পালাতে হোতো, এমনকি সন্ধ্যার পর বোর্ডিংএর কড়াকড়ি নিয়ম অমান্য করে সে দুর্জয়ের বাসায় অভিসারে বেরুত। —যে আমবাগানের ঝাপসা অন্ধকারে দিনেই লোকে পা বাড়াত না, পথ সোজা করবার জন্য সুধীর সাপখোপ ও ভূতপ্রেতের ভয়কে একসঙ্গে অস্বীকার করে তার ভেতর দিয়েই পথ করে যেতো। দুর্জয়ের মুখের গল্প শোনার কি প্রচণ্ড ছিল তার লোভ। তাদের গভীর ভালোবাসার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান দুর্জয় বরাবর রক্ষা করত, হয়তো সেই জন্যই তার আকর্ষণও ছিল এমন দুর্জয়।

এইসব কথাই সুধীর অনুক্ষণ ভাবছিল,—এইসব চিন্তা এর আগেও সে অমৃতের মত কতবার আস্বাদ করেছে, কিন্তু এইসব কাহিনীই আজ তার শিরায় শিরায় অব্যক্ত বেদনার নিবিড় বিষ সঞ্চার করে দিচ্ছিল। কিন্তু কর্তব্য সবার আগে,—শোক অপেক্ষা করবে, ভালোবাসা অপেক্ষা করবে, এমনকি ভগবানও অপেক্ষা করবেন, কিন্তু বিপ্লবীর কাজ অপেক্ষা করতে পারে না, দুর্জয়ের কাছে এই শিক্ষাই সে পেয়েছিল। তার পরদিনই দেবেনের সঙ্গে কাটিহারে মিলবার কথা আর-যোগে ঠিক করা ছিল, তাই আজ তাকে সব স্নেহ-বাধা-বন্ধন অতিক্রম করে অসুস্থ শরীর নিয়েই উল্কার মত আপনার ধ্বংস-যাত্রা শুরু করতে হবে, অবশেষে এই সে ভেবে স্থির করল।

১২

সৈনিক যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটতে ছুটতে পথে রূপসী মেয়ে দেখলে ঘোড়া থামিয়ে তার চুমো লুটে নিয়ে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়, এবং ঐ একটু ক্ষণের আগাগোড়া ফাঁকির মধ্যে পরম বস্তু পেয়ে গেছে ভেবে আনন্দ পায়—তেমনি এই ঘোড়োপাখীর মত সাতদিনের নিরন্তর ঘোরাঘুরির মধ্যে, মোহনকে ট্রেনে সেই একটি রাতের জন্য পাওয়ার আনন্দটুকু দেবেনের সারা চিত্ত খুশিতে ভরে রেখেছিল। মোহনের সঙ্গে এ জীবনে দেখা হবে কিনা সে ভাবনা তার ছিল না, তার ঠিকানা পেলেও তার সঙ্গে মিলনের অবসর হয়তো আর হবে না, তবু, অন্যমনস্ক মনে সে যখন কাটিহারে নামল, তখনও তার চিন্তার কুজ্ঝটিকার ভেতরে মোহনের সুমোহন মুখখানি মাঝে মাঝে উঁকি মেরে আলোর সঞ্চার করছিল।

তখন সন্ধ্যা, তার পরদিন সকালের ট্রেনে ভাগলপুর থেকে সুধীরের আসার কথা। রেলওয়ে নোটিস বোর্ডে গিয়ে দেখল তার ছদ্ম-নামে পাঠানো সুধীরের এই টেলিগ্রাম দেওয়া রয়েছে—Reaching tomorrow morning with money in draw bush on gang goalie -এর অর্থ, দেবেন, সবটা ঠিক ধরতে পারল না তবু সুধীরের এতটা দুঃসাহসের পরিচয়ে সে খুশি হল না। পুলিশের কাছে যে এই তারের অন্তরের বার্তা এতক্ষণও গোপন আছে তাও সে বিশ্বাস করতে পারল না,—তার ক্লান্ত দেহের পক্ষে বিশ্রামের একান্ত দরকার ছিল, তাই সে চার আনা খরচ করে পরের স্টেশনের একখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে ওয়েটিংরুমে প্রবেশ করল। ওয়েটিংরুমের আসবাবের মধ্যে একটা আয়না-দেওয়া ড্রেসিং টেবিল, একখানা বড় গোলটেবিল, তার চারধারে কয়েকটা চেয়ার আর ঘরের একপাশে একটা ইজিচেয়ার। ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে দেবেনের কয়েক মিনিট কেটেচে, ইতিমধ্যে একজন ইউরোপীয় রেলওয়ে কর্মচারী ঢুকে তাকে রুক্ষ কণ্ঠে ইংরেজীতে প্রশ্ন করল, কে তুমি?

সহজ গলায় দেবেন উত্তর দিল, আমি যাত্রী।

এখানে কেন? বাহিরে যাও।

কেন, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

কালা আদমির কথা কইবার স্পর্ধা দেখে সাহেবের রাগে পিত্ত জ্বলে গেল, সে পরুষ কণ্ঠে বল্ল, সাধারণ যাত্রীর জন্যে এ জায়গা নয়, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।

প্রত্যুত্তরে দেবেন চার আনার টিকিটখানা তার মুখের পর ছুঁড়ে দিল, সাহেব দেখল প্রথম শ্রেণীর টিকিট। বোতলের গ্যাস বেরিয়ে গেলে সোডাওয়াটার যেমন শান্ত হয়, সাহেবের মেজাজ তেমনি সহসা ঠাণ্ডা হয়ে এল, সে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে বেরিয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে সাহেবের স্টেশনে duty ছিল, তাই অত্যন্ত ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে দেবেন দেখল যে সে বেচারা ইজিচেয়ার না পেয়ে অগত্যা গোলটেবিলের উপরই লম্বা হয়ে আছে। তার সন্ধ্যার ঝাঁঝের কারণটা তখন বোধগম্য হল।

দেবেনের চোখে আর ঘুম এল না, তার মনে অকারণ আশঙ্কা জাগছিল, একটু পরে সে সেই অতি প্রত্যুষে বারান্দায় বেরিয়ে দেখতে পেল স্টেশনের চারিদিকে অস্ত্রধারী পুলিশ সজ্জিত হয়ে রয়েছে। দেখেই সে ইজিচেয়ারে এসে এবার নিতান্তই ঘুমিয়ে পড়ল।

বেলা সাতটা, ইতিমধ্যে যতগুলো গাড়ি প্লাটফরমে ঢুকেছে সবগুলোরই রীতিমত খানাতল্লাসী হয়েছে,—কিন্তু বি. এন. ডবলিউ. গাড়ির যা বৈশিষ্ট্য সেই খৈনির ডিবে, গাঁজার কল্কে ও ছাতুর পুঁটুলি এবং এদের মালিকরা ছাড়া আর বিশেষ কিছু ধরা পড়েনি।

যে গাড়িতে সুধীর আসছিল তার হাপা মেলের মত ঢিমে তেতালা গতির জন্য কাটিহার পৌঁছতে তখনো আধ ঘন্টা বাকি,—কাটিহারে যে সরকারের কর্মসচিবরা তাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করেছে এমন কল্পনা সুধীর স্বপ্নেও করেনি। মাঝের একটা স্টেশনে একজন মাড়োয়ারি ব্যবসাদার একটা অত্যন্ত ভারি হাতবাক্স অতি কষ্টে নিজেই বহন করে তারই সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠলেন, আলাপ করে সুধীর জানল তিনি কাটিহারে তাঁর এক মাড়োয়ারি বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে কলকাতা যাবেন।

সুধীর অনুমান করল এই ক্ষুদ্র ভারি বাক্সটিতে কেবল সোনা ছাড়া আর কিছুই নেই,—একটা কল্পনা তার মাথায় এল, সে পরের স্টেশনেই তার ছোট ব্যাগটি হাতে নিয়ে নেমে গিয়ে পাশের খালি প্রথম শ্রেণীর কক্ষে উঠে পড়ল। হাত ব্যাগে প্রয়োজন মত বেশ বদলাবার সাজসজ্জা থাকত,—ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিটেই ঝাঁকড়া চুল, চাপ দাড়ি আর ইয়া গোঁফে তার চেহারা দস্তুরমত বদলে গেল। গুলিভরা রিভলবার উঁচু করে সে চলন্ত গাড়ির পাদানি দিয়ে পাশের কামরায় গিয়ে ঢুকল।

মাঠের মাঝখানে চলন্ত গাড়িতে পিস্তল হাতে এই ভুষমুণ্ড চেহারাকে উঠতে দেখে মাড়োয়ারি বেচারা একেবারে ভড়কে গেলেন, সুধীর অতি সহজেই হাতবাক্সটি হাতিয়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, তবু ভদ্রলোকের অনেকক্ষণ পর্যন্ত হুঁশ হল না। যখন জ্ঞান হল, তৎক্ষণাৎ তিনি গাড়ি থামাবার শিকল বার বার টানলেন এমন কি বিপুল বপু নিয়ে চেন ধরে ঝুলে পড়লেন তবু গাড়ি থামল না, থামল একেবারে গিয়ে কাটিহার জংশনে।

কাটিহারের পুলিশ যখন সুধীরকে পাকড়াবার জন্য গোটা গাড়িখানা ঘিরে ফেলেছে, তখন গাড়ি থেকে সুধীরের বদলে রোরুদ্যমান মাড়োয়ারি নেমে পুলিসের কর্তার কাছে সদ্য ডাকাতির বৃত্তান্ত বিবৃত করল। এই রকম একটা ঘটবে এটা যেন তাঁদের স্বকপোল-কল্পনার মধ্যে ছিল তাঁদের ভাবে সকলের এমনি বোধ হল।

গোটা ট্রেনখানা তল্লাস করতে আধ ঘন্টা লাগল, ততক্ষণ সুধীর ওয়েটিং রুমে দেবেনের কাছে এসে মিলেছে। যার জন্য এত কাণ্ড সে যে কখনই ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করতে পারে না পুলিশের মনস্তত্ত্বের এই সুযোগে সে এতটা সাহস করেছিল। খানিক বাদে দুজন সি-আই-ডি কর্মচারী মাড়োয়ারিটিকে নিয়ে সেই ঘরে গিয়ে বসলেন,—তাঁদের জেরার চোটে অস্থির হয়ে ভদ্রলোককে ঝকমারির মাশুল গুণে দিতে হল।

একজন সি-আই-ডি কর্মচারী প্রশ্ন করলেন, ডাকাত দেখতে কিরকম?

মাড়োয়ারি তাঁদের দুজনকে ভালোভাবে লক্ষ্য করে বললে, অনেকটা তোমার মত, তবে দাড়িটা ফরাসি ছাঁট নয় আর চুল উস্‌কো খুস্‌কো।

সুধীর ও দেবেন এক সঙ্গে হেসে উঠল, দ্বিতীয় সি-আই-ডিও মজাটা উপভোগ করলেন।

প্রথম সি-আই-ডি বল্লেন, এ তবে সুধীর নয়, তার চেহারার বৃত্তান্তের সঙ্গে এ ত মিলচেনা এ তবে কে।

দ্বিতীয় জনা বল্লেন, আচ্ছা, কালকের সেই রহস্যময় উড়ো টেলিগ্রামের সঙ্গে কিছু মিলছে নাকি ? Money in draw—

"ঠিক বলেচ, এর সাঙ্কেতিক অর্থ হচ্ছে টাকা প্রায় পাওয়ার দাখিল,—"বুঝলেন মশাই, আপনার এই সোনা যে চুরি যাবে তা অনেক আগে থেকেই তাদের ঠিক ছিল।"

"তারপরে হচ্চে bush on, অর্থাৎ কি না, মাল কোনো ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, সাহেবকে এক্ষুনি বলে দাও, আশেপাশের যত ঝোপঝাড় সব পুলিশ দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে দেখুক।"

"তারপর gang goalie, এই কাণ্ড এক আধ জনের কর্ম নয় এর পেছনে gang, একটা বড় দল আছে। যারা এই তার করেছে তার একজনের নাম হচ্ছে goalie,—আচ্ছা এ নামটাতো বাঙালী—বাঙালী ঠেকছেনা ? পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী কিম্বা মুসলমানি, এটা কি রকম হল ?"

"চলো সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা যাক, আপনার কোনো ভাবনা নেই মশাই, ডাকাতের দল মায় আপনার মাল সব ধরে দেব।"

তারা সবাই চলে গেলে দেবেন সুধীরকে একান্তে জিজ্ঞেস করল, "তোমার এই বিদ্‌ঘুটে তারের অর্থ আমিও বুঝতে পারিনি। ব্যাপারটা কি ?"

"Money in draw bush on gang goalie—মানে, মণীন্দ্র ভূষণ গাঙ্গুলি,—অত বড় বিপ্লবীর নাম শোনোনি ? উনিও আমার সঙ্গে আজকের কথা ছিল, ঢের বেলা হল, চলো এখন আমাদের আড্ডায় যাওয়া যাক।"

১৩

মোহন স্কুল থেকে বোর্ডিংএ ফিরলে তখনই অশান্ত তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তাকে বললে, চৌকিতে বসো।

অশান্ত দেরাজ থেকে টিফিন ক্যারিয়ার বের করল, মোহনের মন কৌতূহলী হয়ে উঠল, সে জিজ্ঞেস করল, ওতে কি আছে ভাই ?

কি বলো দেখি ?

খাবার ?

খাবার নিশ্চয়ই, কিন্তু কি খাবার যদি বলতে পার তবে—

বলব ? কোনো ফল ? তরমুজ ? জলপাই ? তাও নয় ? তবে তবে খেজুরগুড়ের পাটালি ? চন্দ্রপুলি ? সন্দেশ রসগোল্লা ?—তাও নয় ? তবে কলা !

মোহনের যে কয়টি প্রিয় খাদ্য ছিল প্রায় সবগুলিরই সে নাম করল। এছাড়া অশান্ত তার জন্যে আর কি রাখতে পারে ? অশান্ত বললে, আজ পৌষপার্বণ, মনে নেই ?

উৎসাহিত কণ্ঠে মোহন বলল, তবে পিঠেপুলি ?

তাই। বাড়ি থেকে এনেছি, আমি নিজেও খাইনি, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, একসঙ্গে খাব বলে।

মোহন পরম আগ্রহে হাত বাড়াল। অশান্ত বললে, কিন্তু তুমি কি খাবার বলতে পারোনি যে এজন্য এই শাস্তি নিজের হাতে খেতে পাবে না।

মুখ বাড়িয়ে মোহন বল্লে, বেশ তুমি খাইয়ে দাও। একটুকরো পিঠে খেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, বাঃ কি মজা! এযে ক্ষীর-পিঠে!

ভালো লাগচে? তবে সবগুলো তোমাকে খেতে হবে।

বাঃ, তুমি খাবে না? এতো কে খাবে তবে? এস, আমিও তোমাকে খাইয়ে দিই। হাঁ কর।...কেমন?

তুমি খাইয়ে দিচ্ছ বলেই বোধহয় ভালো লাগচে।

সত্যি? মোহন তার দিকে চেয়ে হাসল, বাঃ বাঃ, আঙুল কামড়াচ্ছে যে?

অশান্ত বল্লে, আঙুলগুলো পিঠের চেয়ে বেশি মিষ্টি যে।

মোহন বল্লে, তবে তুমি আঙুলই খাও, আমি পিঠে খাই।

অশান্ত সহসা আবেগভরে মোহনের গালদুটি টিপে গাঢ় স্বরে বলল, দুষ্টু!

মোহন ফিক করে হেসে বল্লে, ও আবার কি?

অশান্ত কিছুক্ষণ তার কৌতুকচঞ্চল মুখখানির দিকে চেয়ে থেকে বললে, এক এক সময় এমন ইচ্ছে করে তোকে—

আমাকে পিঠের মত চিবিয়ে খেয়ে ফেল, নয়?

মোহনকে সহসা বড় মোহময় বলে অশান্তর মনে হল। সে দুই হাতে তাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে মুখের খাঁজে নিজের মুখখানি মিলিয়ে রাখল, এই আচম্বিত স্নেহস্পর্শের বিমূঢ় আনন্দে কিছুক্ষণ স্থির থেকে মোহন আপনাকে মুক্ত করে নিয়ে বলল, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে পিঠে খাওয়াচ্ছ তারেশবাবু দেখতে পেয়েছে।

দেখুক না, আমার কি করবে সে?

ছেলেদের বলে দেবে। একেই ত ছেলেরা তোমাকে-আমাকে জড়িয়ে কত ঠাট্টা করে।

করুকগে, আমাদের বয়ে গেল।

আমরা এক সঙ্গে থাকি, খাইদাই বেড়াই এটা ওদের সহ্য হয় না। আমাদের জব্দ করবার ফন্দী আঁটে।

এক কাজ কর, ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে আমরা বেশি বেশি মিশব মাখামাখি করব, তাহলে ওরাই জব্দ হবে।

সেই বেশ। কিন্তু তারেশবাবু এতক্ষণ তাদের কাছে কত কি বানিয়ে বলচে, তা কে জানে?

তারেশবাবু তোমাকে তাঁর রিস্ট-ওয়াচটা দিয়েছিলেন না, কি করলে? সেদিন যে তোমার হাতে দেখলুম।

তার পরদিনই আমি ফিরিয়ে দিয়েচি। ওকে আমার ভালো লাগে না। বিশ্রী!

কেন, আগে ত' তুমি ওর খুব পছন্দ করতে?

প্রথম প্রথম ওকে বেশ লাগত, অমন ভালো ফুটবল-প্লেয়ার, সব ছেলের কাছেই ওর প্রশংসা শুনতুম, কিন্তু এখন,—সে কথা যাক।

এখন কি হয়েচে? আমায় বলো না ভাই?

মোহন কিছুক্ষণ কি ভাবল, অবশেষে চুপি চুপি বলল, তোমাকে বলতে পারি, কিন্তু তুমি কাউকে বলবে না বল।

মোহনের ভঙ্গি দেখে অশান্তর মনে কেমন ভয় হল। সে বলল, তবে কাজ নাই, অমন কথা শুনতে চাইনে।

মোহনের মুখ গম্ভীর হয়ে এল, সে বলল, তুমি আমাকে ভালোবাসো, তুমি আমাকে একটা উপায় বলে দিতে পার, ওর হাত থেকে বাঁচাতে পার।

তাদের সহজ সুন্দর ভালোবাসার মুক্ত ঝরনা এ কোন্ রহস্যময় চোরাবালির মধ্যে হারাতে চলেছে এই আশঙ্কায় অশান্ত তাড়াতাড়ি বলল, সে কথা না হয় আরেক দিন শুনব। তাকে যদি তোমার ভালো না লাগে তবে তার কাছে আর যেয়ো না।

আমি তো যেতে চাইনা, আমাকে ছল করে ভয় দেখিয়ে ধরে নিয়ে যায়, এই ত হয়েছে বিপদ।

কিন্তু সে ত তোমাকে ভালোবাসে।

ছাই বাসে। তুমি দেখছি কিছু জানো না। সে যে কি—

আমি সব জানি, গোড়া থেকেই জানি সে তোমাকে ভালোবাসে। প্রথম প্রথম আমার বড় রাগ হত, কিন্তু ভেবে দেখলুম তুমি আমাকে ভালোবাসো তাহলেই হল,—আরো কত ছেলে ত তোমাকে আমার মত ভালোবাসতে পারে, সে অধিকার তাদের আছে। তার আমি কি করতে পারি?

তোমার মত ভালোবাসে? অনেক ছেলে আমার সঙ্গে ভাব করতে আসে বটে, কিন্তু তোমার মত কেউ আমাকে ভালোবাসে না। সত্যি সত্যি ভালোবাসা—কেমন করে যেন বোঝা যায়।

অশান্ত কিছু না বলে চুপ করে রইল, ক্ষণেক পরে বলল, ইচ্ছে করলেই কি ভালোবাসা যায়, ভালো না বেসে পারে না বলেই লোকে ভালোবাসে। আমরা কিছুতেই ভালো না বেসে থাকতে পারতুম না।

আমিও অনেক সময় তাই ভাবি। ভগবান বোধহয় তোমার আমার মন একই রকম করে গড়েছেন তাই এত সহজে মিলে গেল।

তা তো গড়েছেন, কিন্তু এদিকে আমাদের বেড়াতে যাবার সময় যাচ্ছে, তা জানো?

মোহন উঠল, এমন সময়ে ভূপেন এসে তাকে বল্লে, তারেশদা তোমাকে ডাকছে।

আমি এখন যেতে পারব না।

এখনি ডাকচেন, বিশেষ দরকার।

অশান্ত কহিল, চট করে শুনে এসো না—কেন ডাকচেন।

মোহন উদ্ধত স্বরে বললে, কেন ডাকছে আমি বুঝেছি, আমি যাবনা তাকে বলগে।

ভূপেন মোহনদের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট, সে মুচকি হেসে বলল, তুমি নাকি তাঁর কাছে ক'টা টাকা পাবে তাই নিতে ডাকচেন।

মোহন রেগে বলল, আমি তার কাছে কোনো টাকা পাব না। আমি কক্ষনো যাব না।

অশান্ত কিছু বুঝতে না পেরে খানিকক্ষণ হতভম্বের মত থেকে বলল, আমরা বেড়াতে বেড়িয়েছি, এখন ও যাবে না। তারেশবাবুকে বলগে সন্ধ্যার পর আমি ওকে নিয়ে যাব।

ভূপেন চোখের কি একটা ইঙ্গিত করে একটুখানি বাঁকা হেসে চলে গেল।

পথে যেতে যেতে মোহন হঠাৎ বললে, চলো আমরা দুজনে কলকাতায় গিয়ে পড়িগে।

অশান্ত বিস্মিত হয়ে বলল, কেন? এ জায়গা মন্দ কি? পড়াশুনা ত বেশ হচ্ছে।

মোহন তার উত্তর না দিয়ে শুধু বললে, তাহলে আমাকে বোর্ডিং ছাড়তে হবে দেখছি।

শহরের এক প্রান্তে মাঠের পারে নদীর ধারে ঘাসের সবুজ মখমল মোড়া একটা বিজন স্থান তারা আবিষ্কার করেছিল, রোজ বিকেলে সেইখানটিতে দুজনে গিয়ে বসত,—সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত, বোর্ডিংএ ছেলেদের নাম-ডাকার সময় না হওয়া পর্যন্ত—গায়ে গায়ে ঠেস দিয়ে মাথায় মাথায় ঠেকিয়ে হাতে হাতে ধরে কত কি গল্প আড্ডা করত। অনেক সময়ে চিঁড়ে আর খেজুর গুড়ের পাটালি পকেটে ভরে নিয়ে যেত, সেইখানে বসে দুজনের খাওয়া আর গল্প চলত।

উতল হাওয়া নদীর বুকে চপল ঢেউ তুলত, সেখানে সন্ধ্যার ছায়া দুলত, আকাশে দুটো একটা তারা দেখা যেত। তারা সেই সুদূর গ্রহলোকের কল্পনা-কাহিনী বলত, সেখানেও হয়ত এমনি স্কুল আছে বোর্ডিং আছে, ছেলেরা আছে, সেখানেও হয়ত ছেলেরা তাদের মা আর বন্ধুদের ভালোবাসে,—হয়ত এমনি সময়ে সেখানেও সন্ধ্যা হয়েছে আর এমনি নদীর তীরে অশান্ত আর মোহনের মত এমনি দুটি কিশোর বন্ধু বসে বসে গল্প করছে। করছে না যে তা কে বলবে? কিন্তু ঐ ধ্রুবতারার দেশের ছেলেরা বোধহয় স্বাধীন, তারা ইচ্ছা করলে নদীর ধারে ঘাসের ওপর বন্ধুর বুকে মাথা রেখে সারা রাতই গল্প করতে পারে, তাদের বোধহয় বোর্ডিং নাম-ডাকার তাড়া নেই!

কিন্তু আজ মোহনের মনটা এমন খারাপ হয়ে গেল কেন অশান্ত কিছুই তার স্বল্প অভিজ্ঞতায় বুঝে উঠতে পারল না। নদীর ধারের সেই স্থানটিতে গিয়েই মোহন অশান্তর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, বলল, মাথাটা বড় ধরেছে ভাই।

মাথার চুলে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অশান্ত বললে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় এক্ষুনি সেরে যাবে।

কিছুক্ষণ পরে, মাথা-ব্যথা সেরে গেছে, বলে মোহন উঠে বসতে চাইল, অশান্ত তাকে জোর করে কোলে শুইয়ে রাখল, তার কোঁকড়া চুলে নিজের গাল চেপে ধরল, তাকে উঠতে দিল না। একমুহূর্তে মোহনের মন খুশি হয়ে উঠল, সে বলল, আমার মাথাধরা সেরেছে। আমি একটা গাইব।

মোহন গাইল অজানা কবির রচনা একটা পুরাতন গান, কোথায় সে শিখেছিল সেই জানে, তার ভাব পুরাতন, ভাষা পুরাতন, কিন্তু প্রেরণা নিত্য নূতন।...

"যত দিন দেহে প্রাণ রহিবে—আমি তোমারি, তুমি আমারি!"

নদীর এই তট যেন অপর তটে আঘাত করে এই কথাই গাইতে লাগল।

গানের সুরে কি ছিল জানিনা, এই গান গেয়ে ও এই গান শুনে দুজনেই মুগ্ধ বিহ্বল হয়ে পড়ল। দুজনের মুখেই স্বর্গের কি এক অপরূপ অপূর্ব সৌন্দর্য জাগল, তারা অবাক চোখে চেয়ে রইল, দেখে দেখে তাদের চোখ ফিরল না।

অশান্তর বুকে কিসের আবেগ ঠেলে উঠল, সে মোহনের গলা জড়িয়ে ধরল, তার মুখখানি নিজের মুখের অতি কাছে টেনে আনল, তার গোলাপ-কলির মত রাঙা ঠোঁট-দুটিতে একটা নিবিড় চুমো দিল। সহসা কি যেন অভাবিত অঘটন ঘটে গেল, যা তাদের কল্পনায় ছিল না। তারই হঠাৎ-স্পর্শ যেন দুজনকে এক মুহূর্তে কিসের স্বপ্নজালে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মোহনের মুখখানি এক পলকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল, অশান্তর গালদুটি একটু লাল হল, তারপরে দুজনেই মৌন বিবর্ণ মুখে স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারা যেন হঠাৎ কি একটা অপরাধ করে ফেলেছে, দুজনে দুজনের দিকে কিছুক্ষণ চোখ তুলতে

পারল না, তাদের সহজ সম্বন্ধের মধ্যে ক্ষণেকের জন্য যেন প্রলয় ঘটে গেল।

অশান্ত ও মোহন পরস্পরকে এতো নিবিড় এতো বেশি ভালবাসত্তো যে তা হৃৎপিণ্ডের রক্তস্পন্দনের মতো অনুক্ষণের হয়েও অগোচরের বস্তু ছিল,—তাই এই অতর্কিত আত্মপ্রকাশের বিপুল আনন্দ তারা সহ্য করতে পারল না, তার অসহ্য আবেগ যেন তাদের একটু আঘাতই করল। যে পরম মুহূর্তটি তাদের ভাবী মুহূর্তগুলি অমৃতে মধুময় করে দিল তাকে প্রথম-মুহূর্তে তারা হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারল না,—পরশমণির যে স্পর্শ তাদের সারাজীবন সোনায়-সোনা করে দিল প্রথম ক্ষণে তার আঘাতের বেদনাটাই যেন বেশি করে বাজল।

মোহন ধীরে ধীরে উঠে বসল, কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ; অবশেষে মোহন একটিমাত্র কথা বলল, চল যাই।

প্রতিদিন কত হাসি-কলরব-কৌতুকে এই পথটুকু তারা চলত, আজ কিন্তু তাদের একটিও কথা হল না, আপনার মধ্যে আত্মহারা হয়ে যেন যন্ত্রচালিতের মত তারা যাচ্ছিল, বোর্ডিং-এর কাছাকাছি এসে মোহন বল্লে, আজ রাত্রে কিছু খেতে পারব না, যে পিঠে খেয়েছি।

অশান্ত শুধু বলল, খুব পারবে। পিঠে খেলেই পেটে সয়।

মোহন আর সব দিন বেড়িয়ে এসে অশান্তর ঘরে কিছুক্ষণ বসত, আজ সোজা নিজের ঘরে চলে গেল। অশান্ত অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিত্যকার মত বাতি জ্বালবার কথা ভুলে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে আলো জ্বেলে পড়তে বসল, কিন্তু বইয়ের একটি বর্ণও তার বোধগম্য হল না, মোহনের কাছে তার একখানা বই ছিল, সেটা আনবার জন্য তার কাছে যাবার প্রয়োজন সে অনুভব করল,—রোজই তারা একসঙ্গে পড়তে বসত, আজকের এই ছেড়ে-পড়াটা তার মনে কেমন অস্বচ্ছন্দ অসোয়াস্তির মত ঠেকছিল,—বুকের ওপর বই চেপে, আজ সন্ধ্যায় এ কী যে ঘটে গেল—সেই কথাই নিঝুমের মত ভাবতে লাগল।

এদিকে খোলা বইয়ের সামনে বসে মোহনের চিন্তা অন্য ধারায় চলছিল। অশান্ত তাকে আজ চুমু দিয়েছে, স্নেহময় প্রাণের সহজ আদরের স্পর্শ তার জীবনে এই প্রথম, তখনো তার শিরায় শিরায় তারই তড়িৎ প্রবাহ খেলা করছিল। অশান্তর মধ্যে যেন তার চিরদিনের প্রাণের জন আজ তাকে দেখা দিল, সুন্দর যেন নিজের হাতে তার ললাটে সত্যের জয়-টীকা রচনা করে দিল,—এরই অজানা রহস্যের ছায়া যেন এই কিশোরের তরুণ চিত্তে পড়ছিল।

সে কেবলই ভাবছিল, কেন সে অশান্তর আদরের প্রতিদান দিতে পারল না, কেন সে অস্বাভাবিক রকম কেমনতর হয়ে গেল, কেন সে তার সঙ্গে ভালো করে দুটো কথা কইতেও পারল না!—অশান্ত না জানি তার সম্বন্ধে এখন কি ভাবছে!

সে আশা করছিল প্রত্যহের মত আজও অশান্ত তার কাছে পড়তে আসবে তখন কোনো সুযোগে তাকে এই ভালোবাসার বিনিময় দেবে, কিন্তু কাজটা যত সহজ তত সোজা নয়, তাই কেমন করে সে অশান্তকে চুমু দিতে পারে সেই উপায়ই মনে মনে কল্পনা করতে লাগল। কিশোর-বয়সে আদর নেওয়া যত সোজা আদর দেওয়া ঠিক তেমনি কঠিন, ইচ্ছা না থাকলেও অপরের আদর অবিচলচিত্তে নেওয়া যায়, কিন্তু বুকজোড়া একান্ত ইচ্ছাতেও প্রিয়তমকে একটুকু আদর করতে পারা যায় না।

কিন্তু অশান্ত পড়তে এলনা দেখে মোহন বড় ক্ষুণ্ণ হল, বই বন্ধ রেখে শুয়ে পড়ল, তার পড়া হল না। অভিমানে সে খাবার-ঘরে পাশাপাশি বসে খেয়েও অশান্তর সঙ্গে একটিও কথা বলল না, আহত মনে অশান্তও চুপ করে রইল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে অশান্ত চুপ করে নিজের ঘরে চলে গেল, অন্যরাতের মত মোহনের ঘরে এসে কিছুক্ষণ আড্ডা দিল না। তার মলিন মুখ দেখে মোহনের ইচ্ছা করছিল তখনই গিয়ে অশান্তর গলা জড়িয়ে ধরে,—অন্যদিন হলে ছুটে যেত কিন্তু আজ তার পা উঠল না।

পরের দিন অশান্তর খুব পড়ার চাপ ছিল, তাই খেয়েদেয়ে ঘুমোন তার হলনা, সে ঘরে গিয়ে স্কুলের 'টাস্ক' লিখতে শুরু করল। তার মন দিয়ে পড়তে পড়তে কখন যে তার পড়ায় মন বসে গেছে, রাত বারোটা বেজেছে তাও তার খেয়াল নেই। এমন সময় দরজা ঠেলে মোহন ভয়াতুরের মত বিবর্ণ মুখে ঘরে ঢুকল,—অশান্ত বই থেকে চোখ তুলে তাকে দেখে বললে, কি হয়েছে মোহন?

মোহনের কথা সরল না, অস্ফুট স্বরে শুধু বলল, তারেশ—

"তারেশ কি করেছে? এখন রাত কত?"

"বারোটা হবে।"

অশান্ত তার হাত ধরে কাছে বসিয়ে বলল, এত ভয় পেয়েচ কেন? বোসো।

তার সব রাগ দুঃখ এই আদরের ছোঁয়ায় চোখের জলের রূপ নিয়ে ঝরে পড়ল, অশান্ত হাত দিয়ে চোখ মুছিয়ে বলল, কাঁদচ কেন? কি হয়েছে আমাকে বল। এত রাত্রে ঘুমোও নি যে?

"ঘুম আসছিল না, শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম, এমন সময়ে তারেশ—"

"এতরাত্রে তারেশবাবু আবার কি চাইল?—"

মোহন অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলল, সে আমার ঘরে গিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে দু'হাতে আমার মুখ চেপে ধরেছিল, আমি চিৎকার করে কাউকে ডাকতে পারিনা, সে আমাকে, সে আমাকে, সে আমাকে—

মোহন আর বলতে পারল না, কিন্তু এতক্ষণে তারেশের সমস্ত ব্যবহারের অর্থ অশান্তর কাছে যেন স্পষ্ট হল, সে অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠল, কিন্তু বন্ধুর বিপদ কল্পনা করে তেমনি গম্ভীর হয়ে পড়ল। তারেশ ভালো খেলোয়াড় বলে মাস্টার ও ছেলেদের কাছে তার খুব খাতির, তার এই সব ভয়ঙ্কর দোষও তাঁরা উপেক্ষার চোখে দেখেন। তার ওপরে সে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ডান হাত, বোর্ডিংএর মধ্যে সেই সর্বেসর্বা—নিরুদ্বেগে ছেলেদের মস্তক চর্বণ করবার অধিকার আর দাবি তার কম ছিল না! তবু সে বন্ধুকে সাহস দিয়ে বলল, কোনো ভয় নেই আমি আছি, লাঠি মেরে ব্যাটার মাথা ফাটিয়ে দেব।

আমিও পালিয়ে এসেচি ওর নাকে ঘুষি মেরে। দুহাতে নাক চেপে বসে পড়েছে।

বেশ করেচ। যেমন দুষ্টু, তেমনি শাস্তি!

আজ আমি তোমার কাছে শোবো। একলা ঘরে শুতে আমার ভয় করচে।

তুমি একটু বসো। আমি তোমার র‍্যাপারটা নিয়ে আসি, একটা গায়ের কাপড়ে ত দুজনের কুলোবে না।

মোহনের ঘর থেকে তার র‍্যাপার ও বালিশটা নিয়ে ফিরে এসে অশান্ত নিজের বিছানাটা ভালো করে পাতল। তারপরে আলোটা কমিয়ে দিয়ে দুজনে শুয়ে পড়ল।

মোহন অশান্তর বুকে মাথা রেখে চুপটি করে শুয়েছিল, অশান্ত সেই চুলভরা মাথায়

আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে কুলো কুলো চুলের গুচ্ছে অধরের স্পর্শ দিচ্ছিল, চুলের ভিতর দিয়ে সেই আদরের অনুভূতি তার সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছিল।

একটু পরে অশান্ত বললে, একসঙ্গে দুজনের শোয়া নিষেধ, জানো তো? বোর্ডিং-এর এই নিয়ম আমরা খুব পালন করচি!

মোহন বল্লে, আজ থেকে রোজ আমি এখানে শোবো। কিন্তু তুমি আমার ঘরে শোবে। ছোট চৌকি হলেও আমাদের কুলোবে।

তাহলে তারেশ আমাদের নামে আরো কত কী বদনাম রটাবে।

রটাক সে। মিথ্যাকে আমি ভয় করিনে।

মাস্টারদের কানে তুলবে, হয়তো এখান থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেবে, 'রাস্টিকেট' করবে।

বেশত, এখানে না পড়ি, দুজনে কলকাতায় গিয়ে পড়ব।

বাঃ, কলকাতায় যাবার কি সোজা রাস্তা!—দুজনেই হেসে উঠল।...

তারপরে দুজনেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সেদিন সমস্ত দিনটা মেঘলা করেছিল, শেষরাতে অকালবর্ষণ শুরু হলো। বৃষ্টির ঝরঝরানি সুরে দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল, দুজনেই নীরবে বুকের মধ্যে অভিনব অনুভূতির সঞ্চার অনুভব করল। মোহনের ইচ্ছা হল অশান্তর বুকের মধ্যে আশ্রয় নেয়, সে দুষ্টুমি করে নিজের গায়ের চাদরটা মাটিতে ফেলে দিয়ে অশান্তর চাদরটা টানতে লাগল, অশান্ত জিজ্ঞেস করল, কি হচ্ছে?

আমার গায়ে চাদর নেই, বড্ড শীত করচে।

চাদরটা তার গায়ে ভালো করে জড়িয়ে দিতে দিতে অশান্ত বল্লে, তোমার চাদর কি হল?

যেন কত নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে মোহন উত্তর দিল, কোথায় গেছে খুঁজে পাচ্চিনে।

দুজনে একই চাদরের তলায় আসতেই মোহন অশান্তর বুকটি ঘেঁষে তার গলা জড়িয়ে ধরল, তার গালের উপর গাল রাখল,—অশান্তরও ইচ্ছা করছিল তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোয়—সে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

১৪

শনিবার সন্ধ্যার পর বোর্ডিংএর উঠানে ছেলেদের দাঁড়ানো-মজলিস জমেছিল, সেদিন থার্ড ক্লাস বনাম সেকেণ্ড ক্লাসের ফুটবল 'ড্র-ম্যাচে' বাস্তবিক পক্ষে কারা জিতেচে তারই জোর আলোচনা চলছিল। 'রেফারির' একচোখো সূক্ষ্মদৃষ্টিরও যথেষ্ট সমালোচনা হল, কেননা সেইহেতু এমন কতকগুলো 'হ্যাণ্ডবল' আর 'ফাউল' তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে যার 'পেনালটিশুটে' নির্ঘাত গোল হোতো! যারা বিপক্ষ-দলকে প্রায় গোল দিয়ে দিয়েছিল আর কি, কেবল একটুর জন্য পারেনি তারাই সেই কলরব-সভার নেতৃত্ব করছিল। ছুটির দিনে তাস-পাশার মায়াপাশের আকর্ষণে মাস্টাররা অনুপস্থিত থাকায় ছেলেদের বক্তৃতার স্বাধীন অধিকারে ১৪৪ ধারা জারি করবার কেউ ছিল না।

এই সব থেকে দূরে একটি ঘরে সতীশ বলে যাচ্ছিল, আমি ত প্রায় রোজই আমার সাইকেল নিয়ে একটা না একটা গাঁয়ে যাই, এখানকার কেউ জানে না, সন্ধ্যার পর লুকিয়ে যাই, প্রায় সব গাঁয়েই একটা করে নাইটস্কুল করেছি, সেখানে পড়াবার লোকও

জুটেচে। মেথর পাড়ার আর কুলী পাড়ার স্কুলে পড়াতে কেউ রাজি হচ্চে না, তাই হপ্তায় তিন দিন করে আমি নিজেই গিয়ে পড়াব ঠিক করেচি।

তারেশ এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল, এইবার মাঝখান থেকে বলে উঠল, ভদ্রলোকের ছেলেদের বরাতে যা নেই সেই দুর্লভ শান্তি চাষীদের ছেলেরা এতদিন নির্বিরোধে ভোগ করছিল, কিন্তু এই শিশুপাল হত্যার ব্রত তুমি কবে থেকে নিলে আমরা তো জানিনে।

সতীশ বললে, আমার স্কুলে শিশু কেউ নেই, সবাই ষোলর উপরে। এবং তাদের কেবল আমি বর্ণ-পরিচয় শেখাইনে, দেশের খবর, দুনিয়ার হালচাল, চাষীদের স্বত্ব ও স্বার্থ, নতুন আদর্শ, নতুন স্বপ্নের কথা তাদের আমি শোনাই! কিছু টাকা যোগাড় করতে পারলে ভেবেচি কলকাতা থেকে ম্যাজিক লণ্ঠন ও স্লাইড কিনে এনে গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার ছবি তাদের দেখাব। তারা আমায় এত ভালোবাসে, এক একজন আমার ঠাকুর্দার বয়সী, কিন্তু আমার উপর তাদের এত নির্ভর! যেন আমি তাদের বন্ধু, তাদের কতকালের আপনার জন।

সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তারেশ বলল, সখের মাস্টারিতে লাভ আছে যদি ছাত্রের পালে দু একটা রাঙা ছেলে থাকে। বই পড়ার চেয়ে প্রেমে পড়া আর শুয়ে পড়ারই আমি বেশি পক্ষপাতী,—একটা কিছু পড়লেই হলো! কিন্তু আমায় মাপ কর, তোমার ওই সখের দলে আমি ভর্তি হতে পারলুম না, তোমার যে সব "প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে"—

সতীশ হেসে বল্লে, মাভৈঃ, আমি তোমায় আশ্বস্ত করছি। সুন্দর যে ভগবানের প্রকাশ আমি তা মনে মনে মানি,—যদিও তোমার মত রাঙা ছেলেদের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াইনে তবু আমিও সৌন্দর্যের পূজারী। এবং আমার এই ভবঘুরে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় এমন জায়গা দেখিনি যেখানে সবাইকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাবার জন্য ভগবান তাঁর প্রতিনিধি মোতায়েন রাখেননি, এমনকি নরকে পর্যন্ত!

তারেশ উৎসাহে সোজা হয়ে বল্লে, বল কি! তোমার ওই চাষাভূষোর মধ্যেও সৌন্দর্য আছে নাকি?

সতীশ বলল, নিশ্চয়! রূপ তো কেবল রঙে নয়, রূপ হচ্চে দেহের গঠনে, অন্তরের স্বচ্ছ প্রকাশে,—সবল সরল চাষীর ছেলেদের মধ্যে তার অভাব নেই,—কদাচিৎ দুএকটা কটা চামড়াও যে চোখে পড়ে না এমন নয়,—কিন্তু সে কথা যাক, আমি তাদের কারুরই প্রেমে পড়িনি কিন্তু সবাইকেই ভালোবেসেছি।

তারেশ কহিল, কিন্তু জানো ত আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জন লিখতে-পড়তেও জানে না,—নাইট স্কুলে পড়ে সবাইকে শিক্ষিত হতে হলে কলিযুগের এই বাকি কটা দিন অবলীলাক্রমে কেটে যাবে, তাতে আর ভুল নেই!

সতীশ একটু চিন্তা করে বলল, তুমি মিছে বলচ না! কিন্তু আমি ভেবে ভেবে একটা নতুন শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করেচি যাতে করে মাত্র তিনমাস পড়িয়ে আমরা ছাত্রদের স্বাধীন ভাবে জ্ঞানার্জনের যোগ্য করে দেব,—জানবার স্পৃহা আর জানবার শক্তি জাগিয়ে দিলেই আমাদের ছুটি!

তারেশ মুখখানা গম্ভীর করে বলল, তাই নাকি? সেটা কী?

তারেশের কৌতুকের ভঙ্গী দেখে সতীশের মুখ একটু ম্লান হল, সে ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল, আমার মুখ থেকে বেরুচ্চে বলেই যদি কথাটা খেলো না হয় তবে বলি। নাইটস্কুলে আমি তাদের তিনমাসে কেবল লিখতে পড়তে সক্ষম করে দেব, তারপর তারা লাইব্রেরীতে

ভর্তি হবে। প্রথমে শিশুপাঠ্য সব বই থেকে শুরু করে মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে ঘরে বসে বাংলা সাহিত্যের সব বই পড়ে ফেলবে—সাহিত্যের মারফতে ক্রমশ তারা উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতা, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, স্বদেশী বিদেশী বিচিত্র আদর্শ ও ভাব সবকিছু হজম করে যে সত্যিকার শিক্ষা লাভ করবে তা হয়তো ইউনিভার্সিটির ছাপমারা তাদের উচ্চ শিক্ষিত ভাইদের চেয়ে কম নয়। এবং তাদের এই মস্তিষ্ক ও মনের রূপান্তর দিনের পর দিন এত সহজে এত অগোচরে ঘটবে যে চাষীর ছেলে হাল ছাড়তে ভুলে যাবে, তাঁতির ছেলে তাঁত ছেড়ে ফোতো বাবুয়ানি শিখবার অবসর পাবেনা,—ক্রমশ একটা শক্তিমান বিরাট জাতি গড়ে উঠবে।

তারেশ এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত সতীশের মুখের দিকে চেয়ে তার কথা শুনছিল, সে হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে সতীশের করমর্দন করে বলল,—সত্যি, আমি তোমার এই কল্পনাশক্তির প্রশংসা করি। শুনেই আমার ধারণা হচ্ছে হয়তো এটা কাজে খাটানো চলে।

সতীশ অত্যন্ত খুশি হয়ে বলল, কাজে খাটানো চলে কিনা তারই পরীক্ষার জন্যই তো এই নাইটস্কুলগুলো খুলেছি, যদি সফল হই তাহলে সারা বাংলায় এই বার্তা প্রচার করে বেড়াব, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তখন সর্বত্রই আমার এই পদ্ধতি গ্রহণ করবে। এই বিপুল নিরক্ষর জাতিকে যদি আমাদের জীবন-কালের মধ্যে শিক্ষিত দেখে যেতে হয় তাহলে স্কুল আর টেক্সট্ বুকে তা সম্ভব হবে না, শিক্ষার মিডিয়ম করতে হবে সাহিত্য আর পাঠাগার।

তারেশ বিস্মিত সুরে কহিল: আমাদের জীবনকালের মধ্যে সবাই শিক্ষিত হবে: তুমি কি স্বপ্ন দেখছ!

সতীশ যেন কোন্ অদূরের ভবিষ্যতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল: হাঁ ভাই, আমি সেই স্বপ্নই দেখছি। শিক্ষার উপর নির্ভর করছে দারিদ্র্য-দুঃখের মোচন, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, রাষ্ট্রতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পরিবর্তন, জাতির ও মানুষের মুক্তি, এবং শিক্ষার উপরই নির্ভর করছে দেহের স্বাস্থ্য, মনের বল, আত্মার অনুভূতি,—এক কথায় পরিপূর্ণতা! এমন শিক্ষা আমি আমার জাতিকে দিতে চাই যে সে নিজে ভাবতে শিখবে, সবার ভালো করতে শিখবে, সবাইকে ভালোবাসতে শিখবে,—অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার আর অসীম প্রাণের ভাণ্ডার সবার কাছে মুক্ত থাকবে তা সে লাঙলই চালাক আর দেশই চালাক! আমি মরবার আগে দেখে যেতে চাই যে খর্ব খঞ্জ অন্ধ মানুষের দল আর হাহাকার করে ফিরছেনা, সুন্দর স্বচ্ছন্দ, সত্য মানুষ তার অন্তরের মধ্যে ও ভুবনের মধ্যে শক্তির রসের ও পূর্ণতার সন্ধান পেয়েছে!

তারেশ বলল, আমি আশাবাদী বটে, কিন্তু তোমার মত অতটা ক্ষেপে যাইনি! আমাদের মধ্যে দু'একজন পূর্ণতার সৌভাগ্য নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু আর সবাই সার্থকতা খুঁজি বটে, তবু ব্যর্থতাই আমাদের পুঁজি।

সতীশ বলল, আমি তা বিশ্বাস করি না। আমি নিজের জীবনে কত বড় অসম্ভবকে ঠেলে কেমন করে দাঁড়াচ্ছি তা যদি বলি তা হলে বুঝবে পৃথিবীতে কারুর সম্বন্ধেই হতাশ হবার কিছু নেই। স্বচ্ছন্দ হবার শক্তি, সব বাধা বন্ধন ঠেলে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা সব মানুষের অন্তরেই আছে,—সত্যের শিক্ষা, স্বভাবের শিক্ষা আর আনন্দের শিক্ষাই তার সেই প্রেরণা সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। প্রত্যেক মানুষ পূর্ণ হবে তার

নিজের চিন্তার ফলে তার নিজের শক্তির বলে,—আমরা কেবল দেখব তাদের সেই-বিষয়ের কেবল শিক্ষাটুকু দিতে পারি কিনা!

আরেশ কহিল, কেবল শিক্ষা দেওয়া—এই কেবল-টুকু নিতান্ত কম ব্যাপার নয়। আমার তো মনে হয় সর্বসাধারণের পক্ষে তাও অসম্ভব,—

সতীশ কহিল, তাহলে বলি সর্বসাধারণের একজন হয়ে আমার পক্ষে এই কেবল শিক্ষাটুকু কেমন করে সম্ভব হয়েছে। পাঁচ-ছ'বছরে বর্ণপরিচয় বোধোদয় সাঙ্গ করে আমি ছেলেদের মাসিকপত্র আর গল্পের বই পড়তে শুরু করি, সাত-আট বছর বয়সের মধ্যে আমি কৃত্তিবাস কাশীরামের রামায়ণ মহাভারত শেষ করে ফেলি, আমার বাবার ছিল প্রকাণ্ড লাইব্রেরী, আমি ওই অল্পবয়সেই বঙ্কিম, সঞ্জীব, রমেশ, দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী থেকে শুরু করে চার পাঁচ বছরে বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব বইই পড়ে শেষ করেছি। এখন আমি কি পড়ছি, আমার শেলফে ওগুলো কি বই, জানো? ও হচ্ছে রবিবাবুর 'সমাজ' 'সাহিত্য', 'ধর্ম', 'বিচিত্র প্রবন্ধ';—বিবেকানন্দর—

আরেশ বাধা দিয়ে বললে, প্রবন্ধ বস্তুটি বিচিত্র বই কি! রবিবাবুর নভেল,—নৌকাডুবি কি চোখের বালি হলেও না হয় পড়া যেত! অন্ততপক্ষে কবিতা, কি প্রেমের গান!—

সতীশ কহিল, উপন্যাসও আছে, কবিতাও আছে, রবিবাবুর 'গোরা' 'খেয়া'—

আরেশ বলল, খেয়া! খেয়া নয় ধোঁয়া! অসহ্য! রবিবাবুর এত যে বই পড়েছো, ওর কিছু কি তুমি বুঝেছ? আমি তো—

সতীশ কহিল, কি বুঝিছি আর কি বুঝিনি তা আমার কাছে বড় নয়, তবে এই ধরনের শিক্ষা থেকে আমি যা পেয়েছি তা কাউকে বোঝাতে পারব না, তা হচ্ছে রহস্যময় কিছু, যা কাউকে দেখাতে পারিনা অথচ মানুষের বিপুল সম্ভাবনায় বিশ্বাস জাগাচ্ছে, যার মূলে যুক্তি নেই, অথচ অনির্বচনীয় সত্য আছে।

আরেশ হেসে বললে, তোমার এই হেঁয়ালীর এক বর্ণও আমি বুঝতে পারছিনে, তবে একটা কথা আমার মনে হয় যার সত্যতা বোঝানো কিছুমাত্র অনির্বচনীয় নয়—তা হচ্ছে তোমার এই শিক্ষার-পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট টাকার দরকার, তা তুমি পাচ্ছ কোথা থেকে?

সতীশ কহিল, আপাতত আমার বেশি টাকার দরকার নেই, কেবল একটা পাঠাগারের জন্য যা টাকা চাই,—তার অধিকাংশ আমি নিজের হাতঘড়ি, ফাউন্টেন, আর কতকগুলো পড়ার বই বিক্রি করে যোগাড় করেছি, বাইসিকেলটাও বিক্রি করব, আর বাবার সেই লাইব্রেরীর যে-অংশ এখনো অবশিষ্ট আছে তাও আমার কাজে আসবে।

আরেশ কহিল, কিন্তু আরো ত টাকার দরকার হবে, তখন পাবে কোথায়?

সতীশ ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল, পরে বিছানায় ঘুষি মেরে বললে, আমাদের জমিদাররা কেবল প্রজার ওপর অত্যাচার করে, আর তাদের বুকের রক্তে ফুর্তি ওড়ায়, নইলে দেশের ভাবনা ছিল কি! নিজেরা মানুষ না হলে অপরের মানুষ হবার দাবিতো বোঝা যায় না,—যতদিন একজন মানুষও অপূর্ণ থাকছে ততদিন আমিও অপূর্ণ, ততদিন আমার স্বস্তি কই!—এত বড় ব্যাকুল প্রাণ যদি তাদের বুকের মধ্যে জাগত তবে তারা বুদ্ধের মত বিলাস-সম্পদ কবে ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে মানুষের সেবার-আনন্দে তন্ময় হয়ে যেত।

আরেশ হেসে বললে, আজ তা বড় মুখ করে বলতে পারছ বটে কিন্তু নিজে জমিদার হলে ওদেরই একটা দ্বিতীয় না হোক, আট আনা সংস্করণ হতে।

দৃঢ় স্বরে সতীশ উত্তর দিল, কখনই না! আমি যদি এমন মন নিয়ে জমিদার হতুম তা হলে বিয়ে করতুম না, পোষ্যপুত্রও নিতুম না, জমিদারির আয়ের সব টাকা দিয়ে দেশের অজ্ঞতা আর অজ্ঞান দূর করতুম,—তখন আমার এই শিক্ষাপ্রচারের কাজ দিন দিন বেড়ে চলত। আমার সব সম্পত্তি মানুষের সেবায় দিয়ে নিজে অন্যতম অভিভাবক মাত্র থাকতুম।

তারেশ বললে, কিন্তু তখনো যে তোমার এই মন থাকত তার প্রমাণ কি!

সতীশ কহিল, তার পরিচয় বড় রহস্যময়,—আমার সত্তা আমার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতই, এবং আমার এই জীবনে করবেই, এতে আমার এতটুকু সংশয় নেই। যে শিক্ষা-ধারা আমি বিস্তার করতে চাচ্ছি তা ভারতের চিরদিনের বস্তু, তা হচ্ছে আত্মজ্ঞানের ও আত্মপ্রকাশের শিক্ষা।

এমন সময় প্রশান্ত ও মোহন সেই ঘরের পাশ দিয়ে চলে যেতেই তারেশ ডাকল, মোহন, শুনে যাও।

মোহন কিন্তু শুনল না, সে প্রশান্তকে টেনে নিয়ে অবহেলায় চলে গেল। তারেশের মুখ কালো হয়ে উঠল।

সতীশ সে দিকে লক্ষ্য না করে বলল, এদের দুটিকে আমার বেশ লাগে, এদের ভালোবাসা এমন শুদ্ধ এত সুন্দর যে দেখলে চোখ জুড়োয়,—কখনো ইচ্ছে করে তাদের মত ওদের দুজনকেই বুকের মধ্যে চেপে ধরি!

তারেশ ঠোঁটের কোণে হেসে বললে, কেবল চোখের প্রতি পক্ষপাত করচ, বেচারা বুককেও কেন একটু জুড়োতে দিচ্ছ না। আহা, বৈষ্ণব কবি কোন্ যুগে বলে গেছেন, "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,—প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর!"—তা দেখছি এযুগেও সমান সত্যি রয়েছে!

সতীশ কহিল, আর কোনো বাধা নেই, কেবল ভয় হয় আমার এই আদরের অত্যাচারে হয়তো ওদের সহজ ছন্দটি নষ্ট হয়ে যাবে, মনের প্রকাশের পথ রুদ্ধ হবে। যদিও আমি জানি যে আদরের স্পর্শে সুপ্ত মন জেগে ওঠে, বিকশিত হয়।

তারেশ সকৌতুকে কহিল, তুমি ওদের মানসিক ক্ষতির ভয়ে কাহিল, কিন্তু ওরা যে দৈহিক নষ্ট হচ্ছে না তা কেমন করে জানলে? এই ত ওদের সোমত্ত বয়েস! এই বয়েস-কালে আজকাল বাংলাদেশের কোথাও কোনো ছেলে অনাঘ্রাত বা অক্ষত থাকে না।

সতীশ সবিস্ময়ে বলল, তুমি বলচ কি তারেশ? এরা যে ফুলের মত দুটি কচি শিশু!

তারেশ একটু হেসে বলল, আমার অভিজ্ঞতায় এদের চেয়েও কচি শিশুকে উক্ত কর্মে অভ্যস্ত দেখেছি! যে নষ্ট করে সেও নিজের ইচ্ছায় করে না, যে নষ্ট হয় সেও নিজের ইচ্ছায় হয় না, মানুষের রক্তমাংসের ভেতরে কোন্ শয়তানের বাসা জানিনে, যার অস্বাভাবিক প্রেরণায় দুজনেরই এই সর্বনাশের যাত্রা!

সতীশ কহিল, তুমি যা বলচ তার কিছু হয়তো সত্যি হতে পারে, আমিও এ সম্বন্ধে অনেক ভেবেছি,—কিন্তু আমার মনে হয় সুন্দর ছেলেদের সবাই কেবল ভালোবাসে, তাদের নিশ্চয়ই কেউ নষ্ট করে না। কবি বলেচেন, "যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস, যারে ভালবাস তারে করিছ বিনাশ!"

তারেশ কহিল, ঠিক তার উলটো—সুন্দর ছেলেদের বন্ধুর সংখ্যা যেমন বেশি, তাদের

সর্বনাশের মাত্রা তেমনি গুরুতর। দৈবাৎ যদি কেউ সত্যি সত্যি ভায়ের মত ভালবাসল তবেই রক্ষা, সেই সাবধান করে দিল, নিজের অন্তরের-শক্তিতে ভালোর পথে নিয়ে গেল। নইলে আজ যাকে দেখলে সৌন্দর্যে স্বর্গের দেবকুমার, দুবছর বাদে তার বিরূপ চেহারা দেখে তাকে আর চিনতে পারবে না।

সতীশ কিছুক্ষণ নতমস্তকে ভেবে বললে, ভালোবাসাই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান, আর তো আমি কিছু পাচ্ছিনে। যে ভালবাসল সে নিজেও মুক্ত হল, অপরকেও মুক্তি দিল। তাই আমার মনে হয়, ছেলেরাই ছেলেদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে, নইলে বাহির থেকে আর কেউই তাদের বাঁচাতে পারবে না।

তারেশ কহিল, সে কথা সত্যি। কিন্তু এই ভালোবাসাই দুর্লভ।

সতীশ কহিল, ভালোবাসার প্রেরণা অতি শিশুকাল থেকে সবার অন্তরেই আছে কেবল তার জাগরণ চাই, প্রকাশের পথ পেলে সে নিজের জোরে নিজেই বেড়ে উঠবে,—আলো যেমন অন্ধকার দূর করে তেমনি সহজে সে সব অমঙ্গল নষ্ট করবে। তুমি বলেছো যে সুন্দর ছেলেদের উপাসকের সংখ্যা খুব বেশি,—কিন্তু এতে সর্বনাশটা কোন্‌খানে? ছেলেবেলা থেকে সৌন্দর্যের দিকে টান, সুন্দরের পূজা, সৌন্দর্য-বোধ, ক্রমশ তাদের অমঙ্গল ও কদর্যতা থেকে নির্মুক্ত ও নির্মল করে তাদের জীবনের মহৎ সম্ভাবনাকে কি সত্যে পরিণত করবে না?

তারেশ চুপ করে রইল, সতীশ বলে চলল, জীবনে যারা বড় হয়েছে, মহৎ হয়েছে, কবি হয়েছে, শিল্পী হয়েছে, স্রষ্টা হয়েছে, যারা বিশ্বমানবের সেবা করেছে, মানুষের ভাগ্য গড়েছে তারা সবাই ছেলেবেলার বন্ধুর কাছে—ছেলেবয়সের ভালবাসার কাছে ঋণী। ভালোবাসা না পেলে ভালো না বাসলে মানুষ ভালো করে কিছু গড়তেই পারে না। আমার তো খুব সাধ যায়,—

তারেশ উৎসুক হয়ে কহিল, কি সাধ যায়?

সতীশ একটু থেমে বললে, সাধ যায় আমার একটি প্রাণের বন্ধু থাকে তা সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, আমার চেয়ে বয়সে বড়ই হোক আর ছোটই হোক,—যার সৌন্দর্য হবে আমার কর্ম-দিবসের আলো, যার প্রেম হবে আমার বিশ্রামরজনীর আনন্দ। আমি যদি জানি কেউ আমায় ভালোবাসে তাহলেই আমি 'আমি' হতে পারি,—আনন্দে বাঁচতে পারি, আবার তেমনি আনন্দে মরতে পারি।

মোহন সেই ঘরের বাহির দিয়ে চলে যাচ্ছিল, তারেশ সতীশকে বলল, মোহনকে এখানে ডাকোনা।

সতীশ বলল, আচ্ছা ডাকছি। ও এলেই যেন ঘরটা আলো হয়ে উঠে। মোহন, শুনে যাও ত।

মোহন চলে গেছল, ফিরে এসে দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, আমাকে ডাকছো সতীশদা?

সতীশ বললে, হ্যাঁ ভাই। তোমার বন্ধুটিকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত, এদিকে তোমার হতভাগা দাদাগুলো যে একান্ত অবহেলায় এক কোণে পড়ে থাকছে সেদিকে খেয়াল নেই?

মোহন সলজ্জ হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, দাদারই কাজ হচ্ছে ভাইদের দেখা, নইলে—

সতীশ হেসে বললে, নইলে কি? ভাইরা বেহাত হয়ে যাবে, নয়?

মোহন সতীশের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, এই কথার কোনো উত্তর দিল না, সতীশ বলল, এইখানে একটু বোসো।

মোহন সতীশের কাছ ঘেঁসে উভয়ের মাঝখানে জড়সড় হয়ে বসল।

সতীশ অরেশকে কহিল, হ্যাঁ, আমি এতক্ষণ যেজন্যে তোমার কাছে এসেছি তাই বলিনি, আমার এই কজের জন্য যে টাকার দরকার তার কিছু তোমাকেও দিতে হবে। তুমি রাঙা ছেলেদের জন্য এত টাকা নষ্ট কর, কালো ছেলেদের মানুষ হবার জন্য না হয় কিছু দিলে।

'রাঙা ছেলের' উল্লেখে মোহনের মুখ চকিতের জন্য লাল হয়ে উঠল। সতীশ লক্ষ্য না করলেও অরেশের তা চোখ এড়ায়নি। সে মোহনের দিকেই দৃষ্টি রেখে বললে, আমি ভস্মে ঘি ঢালিনে, আগুনে ঢালি। তুমি বলবে ওদুটোর একই ফল, আমার কাছে তা নয়। আগুনে ঘি ঢাললে আগুন আরো বেশি জ্বলে! যতক্ষণ ঘি ঢালি ততক্ষণই সে আমার, তার জীবন আমার, তার প্রেম আমার, তার সব আমার,—ততক্ষণই তার তাপে জীবনের এই পৌষমাসে আমার দুহাত গরম রাখতে পারি!

এই কথা বলতে বলতে অরেশ লণ্ঠনের 'বার্নারের' চাবিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, কথাটা শেষ করেই সে চাবিটা ঘুরিয়ে আলো নিবিয়ে দিল,—কয়েক মুহূর্তের জন্য সমস্ত ঘর অন্ধকার! 'একি-করলে,'—এই বলে সতীশ তাড়াতাড়ি পকেট থেকে দেশলাই বার করে বাতি জ্বালালো, কিন্তু এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মোহনের পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। মোহনের সমস্ত মুখ বিবর্ণ, চুলের থাক বিশ্রস্ত, তার গালে চুমোর দাগ জ্বলজ্বল করছে,—ইতিমধ্যে অরেশ যে তার প্রতি এই অত্যাচার করেছে তা তার অগোচর রইলো না।

নিজে না পারলেও কারও চুমো দেওয়া সে অপরাধ মনে করত না। অরেশ যদি তার সম্মুখেই মোহনকে চুমো দিত তাহলে সে কিছুই মনে করত না, কিন্তু এইভাবে আলো নিবিয়ে জোর করে চুমো খাওয়ায় সেই না-দেখা দৃশ্যটি যেন কদর্য হয়ে তার চোখের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হল, এবং ভালোবাসার সহজ প্রকাশ যে চুমো অপবিত্র অপরাধের মত তার গোপন উগ্রতার মধ্যে এই কুৎসিত সুযোগ অনুসন্ধানের চেষ্টা সতীশের মনে আরো কত বিশ্রী বিষয়ের ইঙ্গিত করল, সেখানকার বাতাস সতীশের এক মুহূর্তের জন্য আর সহ্য হল না। সে দাঁড়িয়ে উঠে কেবল মোহনকে ডেকে বলল, মোহন আমার সঙ্গে এসো। তারপরে উভয়ে চলে গেল।

তার এই এক মুহূর্তের অসংযমে একি বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল, তাই ভেবে অরেশ নিজের প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, জ্বালাময় চাবুক দিয়ে নিজের মনকে ক্ষতবিক্ষত করতে করতে সে কেবলি অন্তরে অন্তরে হাহাকার করে উঠতে লাগল—সোনা ফেলে তুচ্ছ কাঁচের প্রতি তার একি লোভ; যাকে চায় তার মন হারিয়ে গায়ের জোরে কেবল প্রাণহীন দেহটাকে নিয়ে দিনরাত তার একি নিরর্থক টানাটানি! দেহের দস্যু সে, রূপের রাক্ষস সে—ধিক্ তাকে।

১৫

মোহন কেমন করে তারেশের কবলে পড়ে ধ্বংসের মুখে যাচ্ছিল তার একটু ইতিহাস আছে,—যতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব এইখানে তার উল্লেখ হয়তো অসঙ্গত হবে না।

বোর্ডিংএ আসার কিছুদিন পরেই মোহনের একবার জ্বর হয়, সেই সময় তাকে একাই নিজের ঘরে পড়ে থাকতে হোতো। মোহনের ইচ্ছা করত অশান্তকে কাছে পায়, কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কড়া শাসনে সে কদাচ স্কুল কামাই করতে পারত।

এমনি একদিনে মোহনকে দেখবার কেউ ছিল না, তার অসুখটা হঠাৎ খুব বেড়ে যায়। পিপাসায় সে জল জল বলে চীৎকার করছিল,—সেই সময়ে তারেশ এসে দেখা দেয়। তারেশ স্কুলে যাওয়া খুব কমই পছন্দ করত, এবং প্রায় রোজই পালিয়ে এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে সুখে ঘুমোত,—মোহনের ডাক তার কানে যাওয়ায় সেদিন সেই এসে তার সেবার ভার গ্রহণ করল। লোকের অসুখ-বিসুখে সেবা করা আর বিপদে-আপদে প্রাণ দিয়ে দাঁড়ানো তারেশের একটি সহজ গুণ ছিল।

মোহন মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, তাকে জল খাইয়ে তার পাশে বসে আস্তে আস্তে কপাল টিপে দিতে দিতে সে বেশ আরাম পেল,—রক্তাভ চোখ দুটি মেলে এই অসময়ের বন্ধুটিকে তার বড় ভালো লাগল, সে অন্তরের শ্রদ্ধা নিয়ে তাকে মনে মনে বরণ করে নিল। পাখার হাওয়া দিয়ে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তারেশ মোহনকে ঘুম পাড়িয়ে নিজে চুপটি করে তার পাশে বসে রইল।

মোহনের স্বভাবসুন্দর মুখখানি রোগের তাপে আরো রাঙা হয়ে উঠেছিল এবং একটু কাহিল হয়েছিল বলে তার সৌন্দর্য যেন আরো বেড়ে গেছিল। তাকে দেখে তারেশের বড় মায়া করল, সে ভাবল এই বার একে ভালোবেসে সে ভালো হবে,—এমনি একটি পরশমণি যেন সে অগোচর অন্তরে খুঁজে ফিরছিল!

তারেশ ছিল 'ছেলে-শিকারী', কিন্তু সে নিজে জানত যে তার কাজ ভাল নয়, তবু কি যেন নেশার মোহে এমনি জড়িয়ে পড়েছিল যে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারছিল না। এই জীবনে একা সে যতজনের সর্বনাশ করেছিল, এখন তারা সবাই মিলে যেন তার সর্বনাশের ষড়যন্ত্র করেছে,—সে নিজে এর ভয়ঙ্কর পরিণাম প্রত্যক্ষ দেখে নিরস্ত হতে চাইলেও তার সঙ্গীরা আর তাকে রেহাই দিচ্ছিল না,—কাজেই দলবল নিয়ে সে পলে পলে রসাতলের দিকেই যাত্রা করে চলেছিল।

একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ! পাপের চক্র গড়লে চক্রান্তের যেন আর সীমা থাকে না। সে যদি নিজের ভালোবাসা নিয়ে স্নেহময় বন্ধুর দল গড়ে তুলত, তা হলে আজ প্রাণঢালা ভালোবাসায় তারা পরস্পরের সব বিপদ-আপদ দুঃখ অমঙ্গল ধুয়ে মুছে দিতে পারত, নিজে বড় হোতো, বন্ধুদের বড় করত, সমাজ বড় হোতো, দেশকেও বড় করত।

মোহনের মুখের দিকে চেয়ে আজ সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে কোন্ সর্বনাশা কুক্ষণে যে ভুল ঘটে গেছে এবার তাকে আমূল সে শুধরে ফেলবে, এবার থেকে সে ছেলেদের সত্যি সত্যি ভালোবাসবে, তাদের ভালো করবে, নিজে ভালো হবে।

মোহনের সম্মুখে বসে সে আজ প্রথম তার কাজের পরিণাম ভেবে বার বার শিউরে উঠল,—সে একা যত ছেলের সর্বনাশ করেছে তারাও যদি প্রত্যেকে ততগুলো ছেলেকে মজিয়ে থাকে তাহলে আজ গাঁয়ে গাঁয়ে শহরে শহরে দেশে দেশে তার অঙ্কুরিত বিপুল

সর্বনাশের তো আর অন্ত নেই। সেই তো দেশের সমাজের সত্যিকার শত্রু, অথচ তার দণ্ড দেবার কেউ নেই। জাতির যৌবনের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে সে তা অকাল বার্ধক্যে শূন্য করে দিচ্ছে, যারা মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঙলার মুখ আলো করত, ছেলে বয়স থেকেই তাদের দেহ মন আত্মা, রোগ লালসা আর মিথ্যায় ভরে দিচ্ছে। তারই মতো অকাল-যৌবন-গ্রস্ত ছেলেদের জ্বালানো অত্যাচারের আগুনে, কে বলবে, ঐ মোহনের মতই কত অজ্ঞান ও অশক্ত ছেলে আজ আত্মবলি দিয়ে বাংলাদেশে ছেলে-হয়ে-জন্মানো-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

তারপর থেকে রোজই দুপুরে সে মোহনের কাছে আসত, কখনো কখনো নানারকম সন্দেশ এনে তাকে খাওয়াত, জ্বরের পর খাবার খেতে তার বেশ লাগত। মোহন বিছানায় শুয়ে থাকত, তার পাশে বসে তারেশ কত কী মজার মজার গল্প বলত, সেসব কথায় মোহন ভারি আমোদ পেত। তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিত, চুল টেনে দিত, গাল দুটি আস্তে আস্তে টিপত,—এই সব ছোটো খাটো বৈশিষ্ট্যে মোহনের মনে সে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারেশ চলে গেলে মোহন নিজের হাতে গাল টিপে দেখত—তারেশের আদর তার এত ভালো লাগে কেন তাই সে বুঝবার চেষ্টা করত।

এমনি হতে হতে একদিন একটু বেশি দূর গড়াল। স্কুলের ছুটির পর ছেলেরা বোর্ডিংএ ফিরছে, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বোর্ডিংএ ঢুকছেন, এরই মধ্যে মোহনের কাছে বিদায় নেবার সময় তারেশের মাথায় হঠাৎ খুন চেপে গেল,—সে দুহাতে মোহনের মুখখানি কাছে টেনে তার গালে একটি চুমু খেয়ে চলে গেল। সমস্ত রক্ত এক পলকে মোহনের মুখে ছুটে এল, সে চট করে হাতে গাল মুছে নিল; সেই মুহূর্তে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ঘরে ঢুকে সে কেমন আছে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তাঁর কথার সুর মোহনের কানে গেলেও সে এতো অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে কিছুই বলতে পারল না।

তার পরের দুপুরে আবার তারেশ এল, মোহনের একটু ভয় ভয় করছিল, কিন্তু কথাবার্তায় আগের ঘনিষ্ঠতা ক্রমে সহজ হয়ে এল। মোহন আজ তারেশের পাশেই বসে গল্প করছিল, তারেশ আস্তে আস্তে তাকে কোলের উপর টেনে নিল। তার বাহু-পাশের মধ্যে বাঁধা পড়ে বাধা দেবার এতটুকুও শক্তি মোহনের এল না,—হয়ত ইচ্ছাও হলনা। তারেশ অনায়াসে তার বন্দীর মুখে চোখে গালে কপালে অনেক চুমো দিল, মোহনের যখন বুদ্ধি ফিরল তখন সে একবার মুক্ত হবার ব্যর্থ চেষ্টা করে অবশেষে অসহায়ের মত আদরের অত্যাচার সহ্য করতে লাগল।

তারপর থেকে সে তারেশকে একটু এড়িয়ে চলত, কিন্তু সুযোগ পেলে তারেশ তার সঙ্গ ছাড়ত না, নানারকম ছলছুতো করে মোহনের চুমো আদায় করত। সে কখনো কখনো বাধা দিত, কিন্তু তাতে তারেশের আবেগ আরো উগ্র হয়ে উঠত মাত্র। মোহন ধরে নিয়েছিল তারেশ তাকে ভালোবাসে, এবং চুমোটা অনাবশ্যক হলেও ওটা ভালোবাসার অনিবার্য বিপদ, ওকে অস্বীকার করা চলবে না। কিন্তু অশান্তও ত তাকে ভালোবাসে তার শান্ত স্নেহের মধ্যে সে যেমন আনন্দের স্পর্শ পায়, তার বুকে আশ্রয় নিলে যে স্নিগ্ধ শান্তির হাওয়া তার গায়ে লাগে, অশান্ত তাকে যত প্রাণের মত ভালোবাসে—এই কথা যখন ভাবত তখন তারেশের ভালোবাসা তার কাছে কেমন-কেমন মনে হত। সে অবশেষে স্থির করল তারেশের সব ভালো, কেবল ঐ আদরের বাড়াবাড়িটা বাদে।

অবশেষে সর্বনাশের সূচনা একদিন ঘনিয়ে এল। তারেশ মোহনের চুমু খেত বটে,

কিন্তু আর কোনো কল্পনা তার মনে তখনো স্থান পায়নি, সে ভেবেছিল কেবল এক-আধটু আদর করা ছাড়া এই ছেলেটিকে তার ও তার দলের কুসঙ্গ থেকে নিরাপদ রাখবে,—কিন্তু শনি যদি কাউকে ভালবাসে তাহলে সে যেমন তার মুণ্ডপাত ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না, তেমনি মনে মনে ভালো করবার ইচ্ছা থাকলেও, স্বভাবত সর্বনাশ ছাড়া হতভাগা তারেশের কাউকে দেবার আর কিছু পুঁজি ছিল না,—সে এতদিন তার একান্ত প্রিয়জনদের নিজে হাতে যে মৃত্যু-গরল পরিবেশন করে এসেচে মোহনের বেলাও তার অন্যথা হলনা।

মোহনের মামা নরেন্দ্রবাবু তখন দূরের এক থানায় বদ্‌লি হয়ে ছিলেন, সেখান থেকে তার স্কুল ও বোর্ডিংএর খরচের টাকা তিনি মনিঅর্ডার করে পাঠিয়েছিলেন,—মোহন সেটা বিছানার তলায় গুঁজে রেখেছিল কিন্তু পরে আর খুঁজে পেলনা। এই সামান্য চুরি নিয়ে হৈ চৈ করা তার শান্ত স্বভাবের বিরুদ্ধ, অথচ স্কুলের বেতন আর বোর্ডিংএর চার্জও নির্দিষ্ট দিনে দিতে হবে, নইলে মহা মুস্কিলে পড়বে, কি করে, সে যেন অকূল সমুদ্রে পড়ে গেল।

অশান্তকে একথা বলা চলেনা, কেননা সে অত টাকা যোগাড় করতে পারবে না কেবল অযথা ব্যস্ত হয়ে উঠবে, কাজেই সে ভেবে চিন্তে অবশেষে তারেশের কাছে গেল। তারেশকে ঘটনাটা জানিয়ে বলল, এই টাকা হারিয়ে ফেলেচি জানলে মামা বড় রাগবেন, অথচ এদিকে স্কুলে নাম কাটা যায়, কি করব আমি কিছুই ঠিক করতে পারচিনা।

তারেশ বল্লে, হারিয়ে ফেলেচো ত কি হয়েচে। তুমি কিছু ভেবনা। আমি এক্ষুনি দিচ্চি, কটাকা চাই? পনের টাকা?—তখনই সে টাকাটা দিয়ে দিল।

মাথা থেকে বোঝা নেমে গেলে যেমন অপূর্ব সুখ হয় তেমনি খুশিতে মোহনের সারা মুখ ভরে গেল। তারেশকে তার এমন ভালো লাগল, যে তার মনে হল তারেশদাকে এত ভালো সে কোনদিন বাসেনি। সে তারেশের হাত চেপে ধরল, হাতখানা তার মুখের উপর টেনে আনল।

তারেশ একটুক্ষণ কি ভাবলে, তারপর বললে, একটা কথা আছে, রাত্রে খাবার পর আমার ঘরে এসো বলবো।

মোহন তখনি রাজি হয়ে চলে গেল। তারেশদার কথাটা সে বুঝতে পারল, সে ভাবল এমন স্নেহময় সহৃদয় তারেশদার আদরের অত্যাচারে আর সে কোনোদিন বাধা দেবেনা, যদি পারে সেও তারেশকে দাদার মত শ্রদ্ধাভরে ভালবাসতে শিখবে। অনাহৃত কিশোর সে, তখনো বুঝতে পারেনি তারেশ তুচ্ছ পনের টাকার বিনিময়ে তার সব স্বপ্ন সব শ্রদ্ধা এক নিমেষে ভেঙে দিতে কি নিষ্ঠুর আঘাত সেই রাত্রে তার জন্য উদ্যত রেখেছিল।...

—এমনি করে স্বর্গের ফুল দানবের লালসার তাপে দিন দিন শুকোতে লাগল।

১৬

প্রাণের দরদ নিয়ে সতীশ যখন জিজ্ঞেস করল তখন এই সর্বনাশের কাহিনী মোহন অকপট চোখের জলে তার কাছে বলল। সব শুনে সতীশ স্তম্ভিত হয়ে গেল,—এটা তার ধারণার বাইরে ছিল। সে মোহনকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব সব আলোচনা করে বুঝাল কেমন করে ক্ষণিক সুখের প্রলোভনে উত্তেজনার বশে এই আত্মঘাতের ফলে ছেলেরা

দেহে মনে রুগ্ণ অকেজো হয়ে পড়ে, কেমন করে তাদের জীবন যৌবন ভবিষ্যৎ, ঘুণধরা বাঁশের মত থেকেও থাকে না—মোহন প্রতিজ্ঞা করল সে আর তারেশের ছায়া মাড়াবে না, এবং এই ভয়ানক কাজ জীবনে দ্বিতীয়বার করবে না।

তখন তারেশকে ভালো করা সতীশের সংকল্প হল, সে দেখল কেবল তারেশের এই রোগ সারলে অনেক ছেলের ভবিষ্যৎ বিপন্মুক্ত হয়, সে আর নতুন ফাঁদ না পাতলে ইতিমধ্যে তার ফাঁদে যারা পড়েচে, যে করেই হোক তাদের উদ্ধার করা তার পক্ষে সহজ হবে।

কয়দিন সুযোগমত তারেশকে না পেয়ে অবশেষে একদিন বিকেলে পথে তাকে পাকড়াও করল, একি তারেশ যে! কোথায় চলেচ?

তারেশ মৃদু হেসে বললে, সুভদ্র হরণে বেরিয়েচি।

তার মানে?

সুভদ্রাহরণ ত পুরনো ব্যাপার পুরাণে পড়েচ। এটা নতুন কিছু।

এই সুভদ্রাহরণ-ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। সব শহরেই ছেলেশিকারীদের একাধিক দল থাকে। একটি বা দুটি রাঙা ছেলেকে কেন্দ্র করে তার উপাসকদের একটি দল গড়ে ওঠে, রাঙা ছেলেটি হয় সেই দলেরই মক্ষিরাণী। অন্যদলের বা বাইরের কোন ছেলের তার সঙ্গে ভাব করবার কোনো দাবি থাকে না, তার রক্ষণ ও ভক্ষণ করবার কেবল তার দলের ছেলেদেরই একমাত্র অধিকার।

এক দলের রাঙা ছেলেকে যদি অন্যদলের চোখে ধরে তাহলে তখন কুরুক্ষেত্রের মত দলাদলি বেধে যায়, মারামারি লাঠালাঠি করে অপর দলকে হটিয়ে তাদের রাঙা ছেলেটিকে ছোঁ মেরে লুটে আনতে হয়। বীর ভোক্তা বসুন্ধরা, যে দলের জোর বেশি তারা জেতে, ছেলেটি সেই দলেরই পাত্র হয়ে পড়ে—এই নিয়ম। তখন থেকে সে তাদের সঙ্গেই মেশে, খেলা করে, বেড়ায়, আড্ডা দেয়, আগের দলের বন্ধুদের কথা তার মনেও থাকে না।

এই রকম একটি শিকারের অভিযানে তারেশ বেরিয়েছিল। তার দলবল আগেই চলে গেছে।

সতীশ কহিল, এই রকম ছেলের পিছু পিছু ঘুরতে তোমার ভালো লাগে? এই সব কাণ্ডে কোনদিন তুমি প্রাণ হারাবে।

তারেশ, কিছু না বলে গুন্ গুন্ করে গাইল,—

"বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্ব জয়;
এ কি গো বিস্ময়!
অস্ত্র তোমার গোপন রাখ কোন্ তূণে।"

দ্যাখো সতীশ, কাল এই ছেলেটিকে বাগাতে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিলুম,—কেবল সমুদ্র মন্থন করাই সার হলো, লক্ষ্মী লাভ হলোনা।

তারেশ তার হাতের পটি খুলে আঙুলের মূলের দগ্‌দগে ক্ষতচিহ্ন দেখাল, এই দেখ।

সতীশ চমকে বললে, এ কি!

তারেশ হেসে বললে, স্বর্গ দখলের চেষ্টা করার এটা উপসর্গ। কাল তাদের দলের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের লড়াই যখন খুব জমে উঠেছে, তারা হেরে যায় আর কি—আমি ছেলেটির হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছি, এমন সময়ে ওদের এক ব্যাটা কোথা থেকে

এক নালা-বন্দুক নিয়ে এসে হাজির, আমার ওপর গুলি চালাবে। বন্দুক দেখে আমাদের দলের যত বীরপুরুষ আমাকে ফেলে চম্পট দিল, আমি একা গিয়ে সেই বন্দুক চেপে ধরলুম। গুলিটা কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বন্দুক ছাড়াতে না পেরে হতভাগাটা পকেট থেকে ছুরি বের করে হাতে বসিয়ে দিয়েচে। এ হচ্ছে সেই।

সতীশ কহিল, তবে লাভ তো ষোলো আনা হয়েচে।

তারেশ বললে, নেহাৎ মন্দ লাভ হয় নি। হাত দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়চে, তখন সেই রাঙা ছেলেটিই নিজের কাপড় ছিঁড়ে হাত বেঁধে দিল,—এটুকু বড় কম লাভ নয়। ক্ষত-আবরণের ওপর চুমু দিয়ে তারেশ বললে আমার মনে হয় ছেলেটি আমাকে ভালোবেসেচে, টানের জোর যাবে কোথায় ?

সতীশ বললে, রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চার বটে, কিন্তু এই আহত হাত নিয়ে আজই আবার কেন ?

তারেশ বলল, তার পাণি-গ্রহণ করতে। ছেলেটিকে, বলতে কি, আমার একটু ভালো লেগে গেচে। সে যদি আমার সঙ্গে চলে আসতে চায় তবে তাকে কে ধরে রাখতে পারে ? আজ আমি একাই তাকে ভুলিয়ে আনতে চেষ্টা করব, কিন্তু যদি দেখি গতিক সুবিধা নয়, দলের ছেলেরা আশেপাশেই থাকবে, অমনি যুদ্ধং দেহি বলে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

সতীশ কহিল, চমৎকার প্ল্যান। কিন্তু আমি একটা কথা বলি, এই ছেলেশিকারের কাজ কি ভালো ?

তারেশ বললে, ভালো কি মন্দ তা ভাই জানিনে, তবে এই শিকারের প্রবৃত্তি সেই আদিম যুগ থেকে মানুষের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাছই ধর, আর বাঘই ধর, মেয়ে ধর আর ছেলেই ধর সবই শিকার, মানুষের হাজার রকম পেশার কথা ভেবে দেখ তাহলে বুঝবে মানুষ শিকার করেই মানুষ বেঁচে আছে। আর শিকার করতে যে আনন্দ, সমস্ত স্নায়ু যেন ঝন ঝন করে বাজতে থাকে, ধমনীতে ধমনীতে রক্ত-ধারা যেন নেচে চলে !

সতীশ বলল, কিন্তু এই দেহ ছাড়া হৃদয় বলে একটা জিনিস আছে, তাকে জয় করাই সত্যিকার আনন্দ।

তারেশ কহিল, হৃদয় জয় করা, তার অর্থ তো আর ও নিগূঢ় ভাবে শিকার করা ছাড়া কিছু নয়। বুঝে দেখ।

সতীশ কহিল, এই মনহীন দেহ হাতে পাওয়া মানে ক্যাশ বাক্স হারিয়ে কেবল তার চাবিটি পাওয়া,—সেটা কত বড় দুঃখ, তাকে তুমি বলচ সুখ ?

তারেশ কহিল, বলচি বই কি। তোমারি কবি বলেছেন,

> "মন নিয়ে কেউ বাঁচে নাক মন বলে যা পায়রে,
> কোন জন্মে মন সেটা নয় জানে না কেউ হায়রে!"

সতীশ বলল, কবি তোমার মাথা বলেছেন। সত্যিকার ভালোবাসা পেলে আর ভালোবাসতে পারলে তোমার সারাজীবনের ভুল এক মুহূর্তে বুঝতে পারতে, আমাকে এত কষ্ট করে বোঝাতে হত না।

তারেশের মুখ পলকের জন্য মলিন হয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে হেসে বলে উঠল, কিন্তু তোমার কবির মতেই আমাদের মত সতীশ!—

> "চাইনেরে মন চাইনে!

মুখের মধ্যে যেটুকু পাই,
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নেরে মন তাই নে!"

একজন চানাচুরওয়ালা পথ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল, তারেশ কিছু চানাচুর কিনল, সতীশকে দিতে গেলে সে বলল, আমি পথে যেতে যেতে খাইনে।

তারেশ কহিল, সব জিনিসই পথে খেতে বেশি মিষ্টি। এমন কি যে বস্তু লোকে স্থির হয়ে খায় এবং খেয়ে স্থির হয়ে যায়, আমি তাও পথে চলতে চলতে খেতে ভালোবাসি।

সতীশ গম্ভীর হয়ে গেল, কিছু বলল না।

তারেশ বলে চলল, সত্যি ভাই, এই চুমো জিনিসটা অপূর্ব—আমার মতে মানুষের সব চেয়ে বড় সৃষ্টি,—আমি যতই এই বিষয়ে ভাবি ততই তন্ময় হয়ে যাই।—

"এই বস্তু কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।"

সতীশ কিছু কহিল না।

তারেশ বলল, তুমি মিছে রাগ করছ ভাই! ভেবে দেখ আমার বড় দোষ নেই;—তোমাদের সমাজ মেয়েদের পিঁজরের ভেতরে বন্দী করে রেখেছে, তাদের পাচ্ছিনে, তাইত তাদের ভাইদের ভালোবেসে এই Noble Revenge নিচ্ছি।

সতীশ রাগ করে বলল, ভালোবাসো—এই কথা বলতে মুখ কালো হচ্ছে না! এরই নাম ভালোবাসা! অকাল-যৌবন যে অকাল-বার্ধক্যের গোড়া এ তুমি জানো, জেনেও ছেলেদের জীবনে সেই সর্বনাশ ডেকে দিচ্ছ। বাংলা দেশে তোমরাই সৌন্দর্যকে অভিশাপ, বন্ধুত্বকে বিপদ, আর ভালোবাসাকে হত্যার কাজ করে তুলেছ! যাক, তোমাকে বোঝানো বৃথা, তবে এই বলে যাচ্ছি, অবসর হলে ভেবে দেখো, তোমাদের কথা মনে হলে আমার রাগও ধরে, দুঃখও হয়।

মোড়ের মাথায় সতীশ অন্যপথে ফিরল, তারেশের দিকে ফিরেও চাইল না। তারেশ খুব গম্ভীর হয়ে গেল,—কিন্তু যার শিকারে বেরিয়েছিল অনতিদূরে একাকী তাকেই দেখে জোর করে মুখের ওপর হাসির আবরণ টেনে দিল।

১৭

বিকেলে বেড়াতে যাবার জন্য প্রশান্ত বোর্ডিং-এর ঘরে ঘরে মোহনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, মোহন সেই সময়ে ছাতের সিঁড়ির ঘরে একটা দীর্ঘ পত্র অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়তে নিযুক্ত ছিল।

সে এই চিঠিখানি সেদিন টিফিনের ঘণ্টায় স্কুলে পেয়েছে, যে ছোট ছেলেটি দৌত্য কাজে এসেছিল সে চিঠিখানি মুড়েসুড়ে তার গায়ে ফেলে হেসে পালিয়ে গেল,—চিঠিটি খুলে দুএক ছত্র দেখেই তখন থেকে সে বুক-পকেটে লুকিয়ে রেখেছে। সিঁড়ির ঘরে কদাচ কেউ আসে, সেইখানে বসে তার প্রণয়প্রার্থী কোন্ অজ্ঞাত বালকের এই গোপনীয় প্রেমপত্রখানি সে চুপিচাপি পড়ছিল।

এই ধরনের চিঠি পেতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এই ভাবে চিঠি পাওয়া ভালো

না লাগলেও তার মন্দ লাগত না,—পড়ে শেষ করেই এই লোভনীয় আপদগুলো সে পুড়িয়ে নিঃশেষ করত।

একটি ছেলে তাকে প্রায়ই 'বৌদি' সম্বোধন করে পত্র লিখত। এ চিঠিখানি তার নয় সে বিবেচনা করল,—এটি কার রচনা হতে পারে অনেক ভেবেও সে ঠিক করতে পারল না। চিঠিখানি আগাগোড়া প্রেমের উচ্ছ্বাসে ভরা, হয়ত কোনো নামজাদা সাহিত্যিকের উপন্যাসের রোমান্টিক নায়ক তার রোমান্টিকা নায়িকাকে যে চিঠি লিখেছে—এটি তারই হুঁকা নকল। চিঠির সব অংশের অর্থও সে ভালো বুঝতে পারছিল না, এর প্রেরকও যে চিঠির মানে জানত এমন বোধ হয় না।

এর সঙ্গে পূজার ছুটিতে অশান্ত তাকে যে সব চিঠি লিখেছিল তার তুলনা করল। অশান্তের চিঠিগুলো সাধারণ নয়, অথচ কত সহজ সরল, পড়লেই তার অর্থ যেন মনকে গিয়ে স্পর্শ করে। সে তাকে 'ভাই অশান্ত' বলে লিখত, অশান্ত 'প্রাণের মোহন' বলে তার চিঠি শুরু করত। সেই চিঠিগুলো কত মিষ্টি,—তাদের মোহন কত আদর করত, সব সময়ে দামী জহরতের মত সঙ্গে সঙ্গে রাখত, মাঝে মাঝেই পড়ে দেখত—এখনো তাদের চিঠিগুলো তারা কত যত্ন করে বাক্সে তুলে রেখেছে।

প্রথম প্রেমের চিঠি আর প্রথম প্রেমের চুমো মানুষের সারাজীবনের স্মৃতি মধুময় করে রাখে।

বোর্ডিং-এর একটা ঘরে সেইসময়ে অশান্ত ও মোহনকে জড়িয়ে অত্যন্ত মুখরোচক একটা আলোচনা জমে উঠেছিল, মোহনের খোঁজে অশান্ত সেই ঘরে পা দিতেই ছেলেদের মধ্যে একজন বলে উঠল, এই যে মানিকজোড়ের একটি এখানে!

সরিৎ [illegible] তাকে ব্যঙ্গ করে থিয়েটারী সুরে গেয়ে উঠল,—

"পরের পরাণ তুমি কেন এলে এখানে,
যাও যাও ফিরে মন বাঁধা যেখানে!"

অশান্ত সেদিকে কান না দিয়ে প্রশ্ন করল, মোহন কোথায় জানো ?

ভূপেন গান ধরল,—"তোমার মোহন রূপের তুলনা নাই!" এবং সেই সঙ্গে সব কটি ছেলে তাকে সপ্তরথীর মত এমনভাবে ছেঁকে ধরল যে বেচারা অশান্ত তাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে করতে হাঁপিয়ে উঠল। অত্যন্ত দরকারি কাজে রাস্তা অতিক্রমের সময় পথের মোড়ে গরুর গাড়ির বহর ক্রমাগত একটির পর একটি চলতে থাকলে, পারে যাবার ফাঁক ও ফুরসৎ না পেয়ে পথিকের মনের অবস্থা যেমন হয়, বেড়াতে যাবার মুখে মোহনকে খুঁজতে এসে অশান্তর অবস্থা প্রায় সেই রকমই হল, দাঁড়াতেও পারে না, পালাতেও পারে না।

সেই সময়ে মোহন এসে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল। মোহন জানত এই ছেলেগুলি সবাই তার সঙ্গে ভাব করতে উৎসুক, অথচ সে অশান্তকে পছন্দ করে বলে এরা কেউই তাকে দেখতে পারে না,—তার জন্য এদের কাছে অশান্তকে অনেক খোঁটা সইতে হয়। বিপুল কলরব-ধ্বনিকার মুখে বিভ্রান্ত অশান্তর পাশে সে নীরবে এসে দাঁড়ালো, দুটি কোমল হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল, এবং ইচ্ছা করেই এতগুলো ছেলের সামনে তার গালে সুনিবিড় একটা চুমু দিল।...কেউ যার লাঞ্ছনার বাকি রাখল না, সুন্দর নিজে তার তপ্ত ললাটে জয়টীকা রচনা করে দিলেন।

অশান্ত এতক্ষণ পক্ষ সমর্থনের জন্য সমবেত চিৎকারের বিরুদ্ধে নিজের কণ্ঠস্বরকে

যথাসাধ্য উচ্চ করবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু মোহনের চুমুতে কি ছিল জানি না, এর পরে সে একেবারেই নীরব হয়ে গেল, তর্ক চালাবার তার কোনো উদ্যম রইল না,—সমস্ত কলরব তার কানের বাইরেই পড়ে রইল। তার বিপক্ষ ছেলেদেরও যেন জোর কমে গেল, কেউ মুচকি হাসল, কেউ ক্ষুন্ন হল, কেউ রাগল, কিন্তু সকলেই মনে মনে বুঝল জয় অশান্তরই হয়েছে।

অশান্ত কিন্তু খানিক পরে একাকী নীরবে বেরিয়ে গেল, মোহনের জন্যই যে সে এখানে এসেছিল, মোহনকে নিয়ে বেড়াতে যাবে, এ কথা তার মনেই পড়ল না,—সে তন্ময়ের মত হন্ হন্ করে হেঁটে চলল। মোহনের এই চুমুটি তার কতদিনের কামনা, কত রাত্রে ঘুমিয়ে সে এরই স্বপ্ন দেখেছে—এই স্বর্গের সৃষ্টি মর্তের মিষ্টি পরম আনন্দ। অশান্তর স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন অগোচরে এরই তৃষ্ণা জড়িয়ে গেছল—এটি পেতেই তার সব শিরা-ধমনী যেন এক সঙ্গে বেজে উঠে বলল—পেয়েছি, পেয়েছি! শরীরের সমস্ত লোমকূপ যেন এই আঙুরের রস পান করে মাতাল হয়ে উঠল—অশান্ত অভিভূতের মত পথ চলতে লাগল।

শুধু তাই নয়, মোহন আজ সকলের সামনে নিঃসংশয়ে জানাল সে অশান্তকে ভালোবাসে, তাকেই চায়। মোহন আজ তার ভালোবাসার অগ্নিপরীক্ষা দিল। এতগুলো ছেলের সামনে সে যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে, ভালোবাসায় এত বড় বুকের পাটা হয় বটে, কিন্তু বোর্ডিংএ বাস করে এতজনের সন্দেহ বিদ্রূপ ও ঈর্ষাভাজন হয়ে একজন ছেলের এতটা বেপরোয়া ভাবের পরিণতি কোথায় হবে কে জানে! মোহন যে আজ তাকে বিপদের মধ্যে বরণ করে নিল এই দুঃসহ সৌভাগ্যের আত্মহারা পুলকে অশান্তর দুচোখে জল এল।

অশান্তর সারা বুক আনন্দের আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, তার ইচ্ছা হচ্ছিল সে খুব লাফায়, খুব ছুটে বেড়ায়, জলে পড়ে খুব সাঁতার কেটে এই ভয়ানক খুশির উপশম করে। পথের ধারে একজনের ঘোড়া বাঁধা ছিল, সে তার লাগাম খুলে লাফিয়ে চেপে বসল, পাগলের মত তাকে দিগ্বিদিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল।...

তার পরদিন অশান্ত নদীতে স্নান করে বোর্ডিংএ ফিরছে, মোহন সেদিন তার সঙ্গে ছিল না, দূরের একজনকে দেখে তার মনে হল—নিশ্চয়ই তার দেবেনদা। দেবেন সেদিনই সকালে মালদায় এসেছিল।

কাছে আসতেই অশান্ত ছুটে গিয়ে ভিজে কাপড়েই দেবেনকে জড়িয়ে ধরল।—দেবেন দা!

কলকাতায় থাকতে দেবেন ও অশান্তর ভালোবাসা খুব নিবিড় হয়ে উঠেছিল—তার অনেক দিন পরে এই দেখা! অশান্ত অত্যন্ত খুশিতে দেবেনের বাহুমূলে কামড়ে দিল।

দেবেন তার কপালে একটা টুঁ মেরে বললে, কিরে, কেমন আছিস?

খুব ভালো।

তার ভঙ্গী দেখে একটু হেসে দেবেন বল্লে, খুব ভালো? বেশ। পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?

খুব চমৎকার।

বটে? আর দুষ্টুমি কেমন চলছে? অশান্তর মুখখানি তুলে ধরে একটু নিরীক্ষণ করে বলল, না, অশান্ত আর দুষ্টুমি করে না দেখছি।

দুষ্টুমির ইঙ্গিত অশান্ত বুঝল। সে সলজ্জে ঘাড় নেড়ে বললে, তুমি বারণ করে দিলে—সেই থেকে আর আমি করিনি।

ভিজে চুলগুলি কপালের দুপাশে সরিয়ে দিতে দিতে দেবেন বলল, তাই ত আমার এই ভাইটিকে এত ভালোবাসি, এত আদর করি।

অশান্তর মুখ হাসিখুশিতে ভরে উঠল। সে উৎসাহভরে বলল, দেবেনদা, বোর্ডিংএ চল একজনকে তোমায় দেখাব।

দেবেন সকৌতুকে বলল, কে সেই একজন রে? তোর নতুন বন্ধু নাকি?

নতুন নয় অনেক দিনের চেনা। তোমার সঙ্গে যতদিনের ততদিনের। চল না দেবেনদা।

আমার ভাইটিকে দেখেই সুখী হয়েছি, আর কারুকে দেখতে যাবার আমার সখ নেই।

অশান্ত একগাল হেসে বলল, দেখলে কিন্তু তুমি আরো ভারি খুশি হবে দেবেনদা, সে আমার চেয়েও সুন্দর।

দেবেন তার গাল দুটি ধরে বললে, আমার এই রাঙা ভাইটির চেয়েও দেখতে ভালো? তবে তো তাকে দেখতে হচ্ছে।

তখন তুমি হয়ত আমাকেও ভুলে যাবে, তাকেই ভালোবাসবে।

দেবেন একটু গম্ভীর হয়ে বলল, তবে তুইও বুঝি আমাকে ভুলে গেছিস,—তাই আর চিঠি দিসনা!

তুমিও ত আর খোঁজ নাওনি আমার!—অভিমানে অশান্তর ঠোঁট ফুলে উঠল।

অশান্তর মুখে একটা টোকা মেরে দেবেন বলল, নে, আর রাগ করতে হবে না। আর কতদূর তোদের বোর্ডিং?

আর বেশীদূর নয়। মোড় ঘুরলেই কাছেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, আমার এতো আনন্দ হচ্ছে! সেও ভারি খুশি হবে দেবেনদা। এত ভালো ছেলে আমি দেখিনি, এমন ভালো মন। কারু উপর রাগতে পারে না, ঝগড়া করতে জানেনা, এত সবাই ওকে এত বিরক্ত করে, ও কিন্তু সকলকেই ভালোবাসে।

তুই তাকে খুব ভালোবাসিস?

একমুখ হেসে অশান্ত জবাব দিল, খু-উ-ব।

দেবেন দুষ্টুমিভরা চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, আর সে? সে বুঝি তোকে খুব আদর করে? নিরুত্তর অশান্তর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে দেখে দেবেন কথাটা ঘুরিয়ে নিল,—আমার এমন ভাইটিকে আদর না করে কি কেউ পারে?

অশান্ত দেবেনের হাতখানা নিজের গলায় জড়িয়ে নিয়ে চলছিল,—দেবেনের অন্যত্র একটু বিশেষ কাজ ছিল, সে বলল, আমার তো এখন সময় নেই ভাই, এখন ছেড়ে দাও। বিকেলে তোমাদের বোর্ডিংএ যাব।

না, সে হবেনা।—বলে তার সেই হাতখানি অশান্ত ভালো করে চেপে ধরল, এবং অন্য হাত দিয়ে দেবেনের কটি-বেষ্টন করল।

এমন অবস্থায় পড়লে পরে সবারই মত বদ্‌লায়,—প্রাণের টানে পড়ে দেবেনের দরকারি কাজ কোথায় ভেসে গেল। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছত্র তার কেবলি মনে পড়তে লাগল—

"কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা,
কাহারে কাঁদিয়ে বলে যেয়োনা যেয়োনা।

কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা—
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা!"

এই নিবিড় বন্ধন ছাড়িয়ে যাবার জোর না থাকলেও অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বলল, আমার যে দরকারি কাজ আছে শান্ত, এখুনি যেতে হবে।

যেতে দেবনা। দরকারি কাজ জানি, বোর্ডিংএ চল, সেখানে আগে নাওয়া খাওয়া করে, আজ ছুটি আছে, দুজনের সঙ্গে সমস্ত দুপুর গল্প করতে হবে। তারপরে বিকেলে আমরা বেড়াতে বেরুব।

তবে দেখছি আজ আমার আর ছুটি নেই। আচ্ছা এখন যাচ্ছি চল,—খেয়ে-দেয়ে কিন্তু আর ধরে রাখা চলবে না। আমি এবার এখানে দিনকত থাকব কিনা, একটা ভালো বাসা দেখতে হবে।

আচ্ছা ছাড়া চলবে কিনা সে মোহনের হুকুম নিয়ে খাওয়া দাওয়ার পর বিবেচনা করা যাবে।

ততক্ষণে তারা বোর্ডিংএ এসে পৌঁছেচে। অশান্ত দূরে মোহনকে দেখিয়ে দিল,—ওই ওই ওই!

মোহন কাছে আসতেই দেবেন তাকে চিনে ফেলল, এ যে তার সেই রেলপথের সাথী। সে বলল, অশান্ত এ যে আমাদের মোহন!

মোহন কাছে এসে অবাক হয়ে বলল, দেবেনদা! হঠাৎ কোথা থেকে?

অশান্ত অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, মোহনকে তুমি চেন নাকি? কি রকম?

মোহনকে দেবেনের কাছে পরিচিত করে দেবার আনন্দ, মোহন দেবেনের পরিচিত জানার সঙ্গে সঙ্গে, পূর্বেকার ঈর্ষা যেন নিবে গেল, কিন্তু পর মুহূর্তেই তার চিত্ত আবার নতুন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল।

১৮

অরেশ দিন দিন সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছিল। অবনতির এমন একটা সীমা আছে যেখানে নেমে হয় থেমে থাকতে হয় নয় উপরে উঠতে হয়, সে বোধ করি সেই লক্ষ্যেরই খোঁজে বেরিয়েছিল। আজকাল মাঝে মাঝে সে বাইরে নিশাযাপন করতেও অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মশায় একদিন রাত্রে তাকে বোর্ডিংএ না পেয়ে পরদিন আড়ালে ডেকে খুব ধমকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তাতে তার মনে অত্যন্ত বৈরাগ্যের সঙ্গে একান্ত রাগের সঞ্চার হয়েচে,—সে বোর্ডিং ছেড়ে চলে যাবে সেও স্বীকার তবু একবার সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে দেখে নেবে!

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মশায় এক-এক দিন নিশীথ-রাত্রে উঠে আঁধারে-আলো হাতে নিয়ে বোর্ডিংএর ঘরে ঘরে ছেলেদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন, অনেক 'ঘুমন্ত' ছেলেই তা জানত, অরেশও জানত। কিন্তু তারা যে জানে অবিনাশবাবুর তা জানা ছিল না। অরেশ এক দিন গভীর রাত্রে এই অবস্থায় তাঁকে পাকড়াও করে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে এই মৎলব আঁটল।

এমনি এক গভীর রজনীতে অবিনাশবাবু তাঁর চোরা-বাতি হাতে নিয়ে বোর্ডিংএ ঘুরছেন, অরেশ টের পেয়ে মাথার কাছে তার মোটা বাঁশের লাঠিটা রেখে নিজের বিছানায় অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল। অবিনাশবাবুর ধারণা ছিল তাঁর এই কাজে ছেলেদের সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা বাড়ে, কিন্তু আজ যে সেই অভিজ্ঞতা একটু বেশি মাত্রায় তাঁর জন্য সঞ্চিত ছিল তা

তিনি কল্পনা করেননি। অবিনাশ বাবু ছেলেদের আন্তরিক ভালোবাসতেন, এবং তাঁর এই কাজের মূলে ছিল তিনি ছেলেদের গোপন অবস্থা অবগত হয়ে তাদের সত্যিকার কল্যাণ-কাজে আসতে পারবেন—এই একান্ত ইচ্ছা।

কোনো কোনো ছেলে ঘুমের ঝোঁকে কথা বলছিল, তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কথা শুনে তাদের মনের মর্ম উদ্ধার করবার চেষ্টা করছিলেন। একটি ছেলে ঘুমের ঝোঁকে বিছানায় লাফিয়ে বসে চেঁচিয়ে উঠল—গোওল! আরেকটি ছেলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁকছে—সুবোধ, সুবোধ, পাস হিয়ার। তারা ফুটবল-মাঠের স্বপ্ন দেখছে। অবিনাশবাবু একটু হাসলেন, তারপরে উপবিষ্ট ছেলেটিকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অন্য ঘরে একটি শিশু ছেলে অস্ফুট কণ্ঠে বকচে—"বড় লাগচে আর মারবেন না স্যর্।" সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল,—অবিনাশবাবু অন্ধকারে তার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, এই শিশুকেও প্রাণ ধরে মারতে পারে এমন কসাই মাস্টারও দুনিয়ায় আছে! একটি ছেলে বুকে হাত বেঁধে ভয়ানক স্বপ্ন দেখে গোঁ গোঁ করছিল, তিনি চট্ করে তার কাছে গিয়ে হাতখানি তুলে পাশে রেখে দিলেন। ছেলেটি স্বপ্ন দেখছিল এক পাগলা হাতি ক্ষেপে গিয়ে তার পেছনে দৌড়চ্চে, সে কিন্তু কিছুতেই পালাতে পারচেনা, অবশেষে সে পড়ে গেচে, আর হাতি এসে তার বুকে পা চাপিয়ে দিয়েচে, বুকের হাড় পাঁজরা সব মড়্ মড়্ করে ভেঙে যাচ্চে,—এমন অবস্থায় তার বুক থেকে হাতটা তুলে নিতেই তার মুখে আবার ঘুমের শান্তি ফিরে এল।

একটি ছেলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল তার বিরহী খোকা ভাইটি যেন তার কাছে এসেচে, সে আধ আধ স্বরে "মুনি মুনি" বলে তাকে ডাকছিল, আদর করে তাকে অনেক চুমু দিচ্ছিল—তারই অস্ফুট শব্দ অবিনাশবাবুর কানে গেল। তিনি সেখান থেকে সরে অন্যত্র গেলেন।

অন্য ঘরে একটি ছেলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাকে মিনতি করছিল, ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন, আমার ভালো লাগচেনা।...ছেলেটি আরও কত কি বকে যাচ্ছিল, তিনি চুপটি করে কথাগুলো বুঝবার আশায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বোর্ডিং-জীবনের বিচিত্র রহস্য অবিনাশবাবু জানতেন, তিনি এই কথার সূত্র থেকে কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারলেন, পরদিন সকালে ছেলেটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে সব জানবেন এই স্থির করলেন। ঘরের অন্য কোণে তখন আরেকটি ছোটো ছেলে তার মার কাছে বায়না ধরেছিল, খেতে দে মা, বড় খিদে পেয়েচে। বোর্ডিংএর ছেলেদের উপোষী দেহ-মনের একান্ত নিবেদন!

অবশেষে তিনি তারেশের ঘরে গেলেন। বিছানায় সে আছে কিনা দেখবার জন্য কাছে যেতেই তারেশ "চোর চোর" চীৎকার করে লাফিয়ে উঠল—তিনি প্রথম ভেবেছিলেন এও এক অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শন! কিন্তু স্বপ্ন দেখার পদ্ধতি দেখে তিনি একটু ভড়কে গেলেন, তারেশ মোটা লাঠিটা হাতে নিচ্চে দেখে তিনি আলো ফেলে দিয়ে লাঠিটা সবলে ছিনিয়ে নিলেন। তারেশ তাঁকে দুই হাতে চেপে ধরে তখনো হাঁকছে—চোর, চোর!

তিনি কম্পিত স্বরে বললেন, ও তারেশ আমি চোর নই। আমি, আমি।

কে তুমি, আমার ঘরে এত রাত্রে কেন? কি জন্য?

ও তারেশ, আমি সুপারি—আমি সুপারি—!

সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বাকি দ্বিতীয় ভাগের অংশটা তাঁর ভয়াতুর কণ্ঠ দিয়ে বেরুল না।

আমি পান-সুপারি জানিনে। আর এত রাত্রে আমার ঘরে পান-সুপারির আমদানি পছন্দ করিনে!

তারেশ তখনো তাঁকে জোরে জাপটে ধরে রয়েচে। তার হাঁক-ডাকে ঘরের ছেলেদের ঘুম ভেঙে গেল, তারা লণ্ঠন জ্বেলে, যার হাতের কাছে যা ছিল,—পেন্সিল টানা রুল, কাগজকাটা ছুরি, ক্রিকেট ব্যাটের ভগ্নাংশ—তাই হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়ে চোরকে দেখে সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল—এ যে মাস্টার মশাই!

তারেশ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ছেড়ে দিল, এঁ্যা, সে কি! মাস্টার মশাই?

মাস্টার মশাই মানে মানে মুক্তি পেয়ে, তারেশ সুযোগক্রমে যে কয়টা অন্তর টিপুনি তাঁকে দিয়েছিল তারই ঠেলায় তখন হাঁপাচ্ছিলেন, তাঁর মুখে কথা সরল না।

তারেশ বলল, মাস্টার মশাই, আপনি এত রাত্রে এখানে!

এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম বাবা, ভাবলুম—

যাই ভেবে থাকুন, কিন্তু কী ভয়ানক! যদি চোর মনে করে আমি মোটা লাঠিটা আপনার মাথায় বসিয়ে দিতুম তাহলে আপনি ত মরতেনই, আমাকেও গুরু-হত্যার পাপে পাতকী করতেন!

অবিনাশবাবু শিউরে উঠে বল্লেন, যা হয়ে গেছে গেছে, আর হবেনা বাবা। তোমরা ঘুমাও।

আমরা ঘুমুচ্চি, কিন্তু আপনি এত রাত্রে—! মাস্টার মশাই, বলতে কি, আপনার ওপর আমাদের কত শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু, আপনার এই রোগ?—

ইঙ্গিতটা বুঝে অবিনাশবাবু লজ্জায় ঘেমে উঠলেন, তিনি নিজেই যেন চোর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই এসব কথারও প্রতিবাদটুকু করতে পারলেন না। এই লাঞ্ছনার জন্য মনে মনে নিজেরই কান মলতে মলতে, অপরাধীরূপীত তিনি ঘাড় হেঁট করে চলে গেলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে বোর্ডিংএ ভয়ানক ভূতের উৎপাৎ শুরু হল। বোর্ডিংএর কোণে উনুনের ছাই-গাদার পাশে কে যেন নাকি সুরে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। সন্ধ্যার পর ছেলে বুড়ো সকলেরই গা ছম্ ছম্ করতে শুরু হলো। রোজই রাত্রে এই কান্না! কারু সাহস হয় না গিয়ে দেখে। সুপারিন্টেণ্ডেন্টের এ বিষয়ে কর্তব্য ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা লাভ ঘটেছিল, আবার ভূতের হাতে মার খেতে তিনি রাজি ছিলেন না।

অবশেষে এক দিন রাত্রে সকলে খেয়ে দেয়ে আঁচাচ্ছে, এমন সময়ে বোর্ডিংএর উঠানে কোথা থেকে সশব্দে কি একটা পড়ল। আলো নিয়ে গিয়ে সেটিকে দেখে সকলের চক্ষু স্থির! মড়ার মাথার খুলি, সাদা সাদা দাঁত বের করে বিকট হাসছে! সেদিন ভয়ে সকলের ঘন ঘন বুক কাঁপতে লাগল।

তারপর থেকে রোজই মড়ার মাথা পড়তে লাগল। এক একদিন মড়ার হাড়-গোড়ে মাথার খুলিতে সমস্ত উঠোন ভরে যেত। সারা শহরের লোক ব্যাপার দেখতে জমত,—কিন্তু কোথা থেকে পড়ে, কে ফেলে, কেউই ঠিক করতে পারে না,—সকলে দাঁড়িয়ে দেখচে তারই মধ্যে এসে পড়চে। একজন খুব সগর্বে আস্ফালন করছিলেন, ভূত না আরো কিছু! এসব বদ লোকের কাজ। এই বিজ্ঞানের যুগে—! তাঁর কথা আর শেষ হল না, তাঁরই কানের পাশ দিয়ে একটা মড়ার মাথা ছুটে এসে সকলের সামনে পড়ল। বক্তা বিবর্ণ-মুখে কাঁপতে লাগলেন।

অবশেষে এক সপ্তাহ পরে একদিন আপনিই উৎপাত বন্ধ হয়ে গেল,—কিন্তু সেই

ভয়ের জের চলল বহুদিন ধরে। খাওয়া-দাওয়া করে ঘরে ঢুকলে, ছেলেরা দূরে থাক, মাস্টাররা পর্যন্ত নিতান্ত প্রয়োজনেও বাইরে বেরুতে সাহস পেতেন না। কেবল তারেশ আর তার নিশাচর বন্ধুর দল, ভূতের তোয়াক্কা না রেখে যা খুশি তাই করত, কেউ তা জানতেও পেত না।

সেদিন রাত্রে তারেশ তার বন্ধুদের সঙ্গে মিলে শহরের কার বাড়ি থেকে খাসী চুরি করে এনেছিল, বোর্ডিংএর রান্নাঘরে এতক্ষণ সেটাকে কেটেকুটে পাক করে এখন সবাই মিলে খাওয়া শুরু করেছিল। খাসী আর মুরগী এরকম তারা প্রায়ই চুরি করে আনত।

একটা হাড় চুষতে চুষতে তারেশ বল্লে, সে কদিন যে ভূতের খাটুনি খেটেছিলাম, এখন তা বেশ উসুল হয়ে যাচ্ছে।

বিনোদ বলল, খাটুনি কি কম? দশ বারো মাইল থেকে সাইকেলে করে হাড়ের পাঁজা বয়ে আনা! কদ্‌লার শ্মশান,—সে কি এখানে!

পরেশ বলল, তার পরে বিপদ ঘাড়ে ষোল আনা! ওই মাল আবার বোর্ডিংএ লুকিয়ে রাখা! ধরা পড়লে পত্রপাঠ বিদায়, তার সঙ্গে উপযুক্ত দক্ষিণা!

তারেশ মাংসটা ভালো করে চিবিয়ে নিয়ে বল্লে, মনে কর ছেলেরা যদি রাত্রে শুয়ে জানতে পারত যে তাদেরই চৌকির তলায় কারা বত্রিশপাটি দাঁত বের করে রয়েছে তা হলে কী হত!

সুরেশ বলল, পণ্ডিত যদি জানতে পারে তার পূজোর ঘরের হাঁড়িকুড়ির মধ্যে এই পদার্থ ছিল তাহলে আর রক্ষা নেই! বেচারা পাগল হয়ে যাবে।

বিনোদ খানিকটা ঝোল চেখে বলল, রান্নাটা হয়েছে বেশ। যাই বল, সুরেশ রাঁধে খাসা!

তারপর কিছুক্ষণ রান্নার গুণবর্ণনা চলল। তারেশ বললে, আমার বড় সাধ হচ্ছে মোহনকে এনে এই মাংস খাওয়াই। কিন্তু সে ত ডাকলে আসবে না, একে ত ভূতের ভয়েই অস্থির, তার ওপরে আবার আমার ভয়!

পরেশ বলল, তাই ত, মোহনকে যে আর বড় তোমার কাছে দেখি না। ওর ঘাড় থেকে নামলে কবে?

তারেশ হাড়ের টুকরা ছুড়ে ফেলে বললে, দূর ভাই। ও আর ভালো লাগে না। ধরে বেঁধে প্রেম করা কদিন চলে। আর ছেলেটাও ভারি স্টুপিড্।

সুরেশ জবাব দিল, ঠিক বলেচ, ও আজুর টক হয়ে গেচে।

বিনোদ বলল, ধরে বেঁধে প্রেম করা অন্যায় কিছু নয়। তবে নাসিকাটিকেও ত বাঁচাতে হবে।

তারেশ বলল, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ঐ নাকে ঘুষি মারার পরেই আমার ওকে সত্যি সত্যিই ভালো লেগেছিল। এত ছেলে আমার কাছে একটুতেই লুটিয়ে পড়েচে, কিন্তু সেদিনই প্রথম দেখলাম, একজন বাধার মত বাধা দিলে!

প্রবোধ এতক্ষণ গিলবার কাজে ব্যস্ত ছিল, এবার বলল, যাই হোক, তারেশ দা, আবার তুমি লেগে যাও। ছেলেদের সাইকলজি আমারও একটু জানা আছে, সেদিন তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে এখন নিশ্চয় ওর আফ্‌শোস হয়েচে।

পরেশ বলল, যেমন তোমার একদিন হয়েছিল,—কিন্তু ও সে ছেলে নয়,—ছেলে দেখলেই চেনা যায়! তবে তোমাকেও বলি তারেশ, যদি সত্যিই ভালোবেসে ফেলে

থাকো তবে একবার 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি' করে দেখনা কেন বাবা! জানই ত, **There is nothing unfair in Love and War!**

তারেশ হেসে বল্লে, ভালোবাসায় আর যুদ্ধে কিছু অনুচিত নেই সেকথা ঠিক, কিন্তু তা বলে ভালোবাসাকেই যুদ্ধে পরিণত করা উচিত কি?

বিনোদ বলল, আর তা ছাড়া তারেশ এখন গোলাপের গোলাপী নেশায় মশ্‌গুল! ও ছোঁড়াটা ত না জানে নাচতে, না জানে গাইতে, না জানে সাজতে, না জানে চাইতে!

তারেশ বলল, সত্যি ভাই, গোলাপ যা গায়! মাইরি! আজকের রাতটা খাসী খেতেই ব্যর্থ হল, কাল আর না!

১৯

অক্ষয়বাবু সুধীরের অনুসরণ করছিলেন, তিনি সি-আই-ডির একজন কর্মচারী। কত কৌশল করেও সুধীর কিছুতেই তাঁর দৃষ্টি-পথের বাইরে যেতে পারছিল না। অবশেষে তার সঙ্গ ছাড়বার আশায় সে একটা জনবিরল গলিপথে ঢুকল, কলকাতায় বিচিত্র গলিপথের তো আর অন্ত নেই।

সুধীরকে অনুসরণ করে অক্ষয়বাবু যাচ্ছিলেন, এবং তাঁর পিছনে দুটি লোক সেই পথেই যাচ্ছিল। সেটা একটা কানা গলি, কিছুক্ষণ পরে বাধা হয়েই সুধীরকে ফিরে দাঁড়াতে হল। হঠাৎ সুধীরের আক্রমণ আশঙ্কা করে অক্ষয়বাবু তৎক্ষণাৎ তার ললাট লক্ষ্য করে রিভলভার তুলে ধরলেন।

সুধীর একটু মুচকি হেসে অক্ষয়বাবুকে বলল, পিছনে তাকান মশাই!

অক্ষয়বাবু পিছনে তাকিয়ে দেখেন, যে দুটি লোক এতক্ষণ নীরবে নিরীহ পথিকের মত পিছনে আসছিল, তাদের হাতে এক জোড়া রিভলভার তাঁরই মস্তক লক্ষ্য করে উদ্যত! অক্ষয়বাবুর মাথা ঘুরে গেল।

ততক্ষণে, তাঁর পিছনে তাকাবার অবসরে, সুধীর নিজের রিভলভার হাতে করেছে। অক্ষয়বাবুকে সে বলল, ভানুমতীর ভোজবাজি মনে হচ্ছে, নয়? আপনাকে খুব আশ্চর্য করে দিয়েছি কিন্তু!

অক্ষয়বাবু বল্লেন, এ বাজিতে হেরেছি স্বীকার করি। না করে উপায় কি?

সুধীর বলল, দেখুন, আপনারা ভাবেন যে আপনারাই শুধু আমাদের অনুসরণ করেন, তা নয়, আমরাও আপনাদের ওপর নজর রাখি! তা নইলে কি পারি!

অক্ষয়বাবু শুধু বললেন, তাই ত দেখছি।

সুধীর হেসে বললে, এখনো যে দেখছেন এই আপনার সৌভাগ্য! আরো দেখুন, এটা একটা কানা গলি, কেউ এ পথে বড় আসে না, আর আমরা তিনজনই বিপ্লবী—। ব্যাপারটা অনুমান করতে পারছেন তো? কাল সকালে বড় বড় হরফে কোন খবরটা সকলের আগে লোকের চোখে পড়বে? আপনাকে অমর করে দেবার এমন সহজ পন্থাটা ছাড়া আমরা সঙ্গত মনে করিনে।

এই রহস্যটা অক্ষয়ের কাছে বড় ভালো ঠেকল না। তবু তিনি সাহস বজায় রেখে সপ্রতিভ ভাবে বল্লেন, আপনারা কি আমাকে কাপুরুষের মত হত্যা করতে চান?

সুধীর বলল, আপনার একান্ত অনিচ্ছা থাকলে তা চাইনে। তবে আপনি যদি বীরপুরুষের

মত যদি বাঞ্ছনীয় মনে করেন তাহলে আমাদের যে কোনজনের সঙ্গে 'ডুয়েল' লড়তে পারেন—যদি হাতের লক্ষ্য ঠিক থাকে তাহলে আপনি একে একে তিনজনকেই মেরে নিরাপদে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে যেতে পারবেন। ভেবে দেখুন।

অক্ষয় বলল, আমি একটা প্রস্তাব করি। তার চেয়ে আমরা যে যার পথে চলে যাই না কেন ? আমি কথা দিচ্ছি আর কখনো আপনার বা আপনাদের কারুর অনুসরণ করব না।

সুধীর একটু ভাবল, বলল, বেশ একথা মন্দ নয়। কিন্তু আপনার বিশ্বস্ততার পরিচয় স্বরূপ আপনাকে নিরস্ত্র যেতে হবে, আপনার রিভালবারটা আমাকে দিন।

সুধীর তাঁর কাছ থেকে রিভলভারটা নিল। তারপরে গলি থেকে বেরিয়ে একটা বড় রাস্তার চৌমাথায় গিয়ে চারজনে চারদিকে চলে গেল।

হাওড়া স্টেশনে গিয়ে সুধীরের মনে হল আবার যেন অক্ষয় তার অনুসরণ করছে,—সে লক্ষ্য রাখল, দেখল সে যে গাড়িতে উঠেচে, অক্ষয় তারই পাশের কামরায় উঠল—তখন তার বুড়োর ছদ্মবেশ, তবু তার ভাবভঙ্গীতে সুধীর তাকে ধরে ফেলল।

হাওড়া থেকে কয়েক স্টেশন পরেই সুধীর নেমে পড়ল, ছদ্মবেশী অক্ষয়ও নেমে তার পিছু পিছু চলল। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় সুধীর দেখল চমৎকার এক কাঁদি কলা পেকে আছে। সে ছুরি দিয়ে কাঁদির সুললিত একাংশ কেটে নিয়ে খেতে খেতে চলল। কদলীকর্তনের অবসরে অক্ষয়কে বাধ্য হয়ে সুধীরের কাছাকাছি আসতে হয়েছিল, তাই কথা তোলার জন্য সে-ই প্রথমে জিজ্ঞেস করল, এ গাঁয়ের নাম কি হে ছোকরা ?

সুধীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে গম্ভীরভাবে বলে, অক্ষয়গোলা।

বাঃ বেশ নামটি ত।...এই নামোল্লেখে তার মনে কোনো সন্দেহ জাগল না, সুধীর তাকে চিনেছে এ কল্পনা সে করেনি, ভাবল সত্যই বুঝি এই নাম!

কলা খাবেন ? এই প্রস্তাবে অক্ষয়কে ঘাড় নাড়তে দেখে সে বলল, আপনি বুঝি এই বস্তুটি খেতে এতই অভ্যস্ত যে এতে আপনার আর রুচি নেই !

উচ্চহাস্য করে অক্ষয় উত্তর দিল, না বাপু, এ বয়সে আর ওসব ভালো হজম করতে পারিনে।

যেতে যেতে এই রকম কথাবার্তা চলছিল। সুধীর কলার খোসাগুলো সামনের পথে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিল, হঠাৎ সেই খোসায় পা হড়কে গিয়ে অক্ষয় প্রায় পড়ে যায়,—এমন অবস্থায় সুধীর তাকে ধরে ফেলল,—এই অবসরে তার জামার পকেট থেকে গুলিভরা রিভলভারটি অদ্ভুত কৌশলে তুলে নিয়ে নিজের পকেটে রাখল, অক্ষয় তা টেরও পেল না।

দুপুরবেলা আসন্ন, মাঠের শেষে তারা পৌঁছেচে, নির্জন চারি ধার রোদে যেন খাঁ খাঁ করছিল। বৃদ্ধ কোথায় যাবেন, এই অনাবশ্যক প্রশ্ন এতক্ষণ সুধীর করেনি, এইবার একটা ছোটোখাটো জঙ্গলের ধারে পৌঁছে, একটা গাছের গুঁড়ির উপর আরাম করে বসে সুধীর প্রশ্ন করল, তারপর, অক্ষয়বাবু, আপনার কি খবর ? কি মনে করে ?

এই প্রশ্ন শুনে অক্ষয় বেশ একটু চমকে গেল। সে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত পুরে দিল। কিন্তু সেখানে কিছুই ছিল না।

সুধীর তাঁর রিভলভারটি বার করে বলল, এই খেলনাটি আপনারই বোধ করি ?

অক্ষয়ের মুখে হতাশার ভাব ফুটে উঠল, সুধীর বলল, আপনি বিশ্বাস ভেঙেছেন, আর এবার কাপুরুষের মত হত্যায়—অরুচির ওজর চলবে না। আপনি প্রস্তুত হন।

এই বলে সুধীর রিভলভারটি পরীক্ষা করতে মনোযোগ দিল। তারপরে আরেকটি রিভলভার, বের করে অন্য হাতে নিয়ে বললে—এ দুটিই আপনার রিভলবার, এর কোন্‌টিতে মরতে চান আপনিই পছন্দ করুন। আমি দুহাতেই চালাতে পারি।

অক্ষয় এতক্ষণে কথা বলল, সুধীরবাবু, এতটা পথ ভুলে ভুলে তোমার পিছু পিছু এসে পড়েছি বটে, কিন্তু আমার হত্যা ছাড়া কি এ সমস্যার মীমাংসা হতে পারে না?

সুধীর বল্ল, এক হতে পারে আপনি যদি আমাদের দলে নাম লেখান তাহলে এ যাত্রা আপনার প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারি।

অক্ষয় কিছুক্ষণ ভাবল, তারপরে বল্ল, আমি বিপ্লবীদলে যোগ দিতে পারি কিন্তু তার আগে, বিপ্লব করে তোমরা দেশ স্বাধীন করতে পারবে—এই ধারণা আমার জন্মানো দরকার। আমাকে অন্ধবিশ্বাসে দলে পাবে এ কি তোমরা আশা কর?

সুধীর বলল, আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় কিছু কিছু দেখাতে পারি, কিন্তু শত্রুর গুপ্তচরকে বিশ্বাস কি?

অক্ষয়। কিন্তু ভেবে দেখ যদি সরকারের কর্মচারী থেকেই আমি বিপ্লবীদলে যোগ দিই তাহলে এমন অনেক গুপ্ত খবর তোমরা পাবে যাতে তোমাদের কার্য-সিদ্ধি সহজ হবে। আমাকে মারার চাইতে বাঁচিয়ে রাখলে তোমাদের লাভ বেশি।

সুধীর। বেশ, আমি আপনাকে নিয়ে যাব এক জায়গায়, কিন্তু যে ভাবে নিয়ে যাব তাতেই রাজি হতে হবে।

অক্ষয় রাজি হল, সুধীর তাকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে একটা ঝোপের পাশে গেল, সেখানে একখানা খালি মোটর পড়ে ছিল। দড়ি দিয়ে অক্ষয়ের দুহাত পিছনের দিকে শক্ত করে কসে, পুরু কাপড়ে চোখ বেঁধে দিল, তারপরে পাশে বসিয়ে মোটর ছেড়ে দিল।

তারপরে কতক্ষণ কাটল অক্ষয়ের কিছু মনে নেই, সারা পথ কেবল গাড়ির শব্দ ছাড়া মানুষের কণ্ঠস্বর তার কানে এল না, সে অনুমান করল বিজন পথ দিয়ে গাড়ি খুব বেগে ছুটেচে। কয়েকবার তার মনে হল গাড়ি যেন উপরের দিকে উঠচে, আবার মনে হল ঢালু পথে নেমে চলেচে,—কলকাতার উপনগর থেকে এরই মধ্যে কোথায় কোন্ পার্বত্যপ্রদেশে এসে পড়ল তাই সে ভাবছিল।

অবশেষে গাড়ি থামল, সে জায়গায় লোকজনের পায়ের শব্দ, কথাবার্তার সুর তার কানে গেল, সুধীর গাড়ি থেকে নামল, সে চুপ করে বসে রইল,—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসচি।

এ স্থানের নামটা কি জানতে পারি?

এটা আমাদের একটা কেন্দ্র। আপনি চুপ করে বসুন। নড়াচড়া করবেন না, আপনার ওপর পাহারা রইল।

তুমি কিজন্য যাচ্ছ?

আপনার ভয় নেই, এতদূর এনে কোতল করব না। কর্তারা কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করবেন কিনা তাই জানতে যাচ্ছি। তাঁদের অনুমতি না হলে আপনাকে এই অবস্থায় ফিরে যেতে হবে, আমাদের কোনো কাজের পরিচয় পাবেন না।

সুধীর চলে গেল, খানিক বাদে ফিরে এসে তার হাতের আর চোখের বাঁধন খুলে দিল। অক্ষয় সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে, এ এক অদ্ভুত জায়গা! দূরে দূরে ছোটোখাটো পাহাড় চোখে পড়ে, দুর্গম কেল্লার মত সুরক্ষিত চারিদিক—বাংলা, বেহার, উড়িষ্যার কোন্ অঞ্চলে যে এটা অবস্থিত কিছুই তার ধারণায় এল না।

কিছুদূরে একদল ছেলে বন্দুক হাতে কুচ করছিল, তাদের কাউকেই সে দূর থেকে চিনতে পারল না। বিপ্লবীর দল কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেচে বলে তার মনে হল।

সুধীর তাকে নিয়ে একটা ঘরে গেল, সেই ঘরের চারিদিকেই খোলা তরোয়াল ঝুলচে, দিনের আলোয় সেগুলো ঝকমক করচে। সেখানে দুজনে একটা টেবিলের দুধারে বসল। সুধীর বলল, এখন কোনো কর্তার সঙ্গে আপনার দেখা হবে না। যদি পরে আপনি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারেন তাহলে আবার আপনাকে এখানে আনা হবে। এখন আমাদের বিপ্লব-আয়োজনের এই যে যৎসামান্য পরিচয় পেলেন এরই উপর নির্ভর করে আপনাকে বিবেচনা করতে হবে আপনি আমাদের দলে আসতে পারেন কি না।

চোরা-হাসি হেসে অক্ষয় বললে, এই আয়োজন যা দেখলুম, তা বিপ্লব-আয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট না হলেও এতে কিছু কাজ চলতে পারে আমার মনে হয়। হাঁ, আমি বিপ্লব দলে যোগ দিলাম। আমাকে কি করতে হবে বল?

সুধীর লাফিয়ে উঠল, অক্ষয়ের কর মর্দন করে বলল, এখন কিছুই না। আপনার জন্য যা ঠিক হবে পরে আমিই গিয়ে জানাব। এখন আসুন, কিছু খাওয়া যাক।

দরোজার পাশে কেউ যেন প্রতীক্ষা করছিল, বলার সঙ্গে সঙ্গেই খাবার এনে টেবিলের ওপর রাখল। সুধীর বলল, এ পর্যন্ত আমাদের কিছু খাওয়া হয়নি। নিন খান।

অক্ষয় খেতে ইতস্তত করচে দেখে সুধীর হেসে বলল, আপনাদের যে সন্দিগ্ধ মন! বিষ-টিষ নেই, দেখুন আমি আগে খাচ্চি। আমরা প্রতারণা করিনে, কিন্তু যে প্রতারণা করে তাকে কুকুরের মত খুন করি।

অক্ষয় ও সুধীর একই পাত্র থেকে আহার করল। জয়ের আনন্দে সুধীরের মন ভরপুর ছিল, তার শেষ কথায় অক্ষয় যে একটু বাঁকা হাসল তা তার চোখে পড়ল না।

না না; আমি গিয়েই কাজে ইস্তফা দেব। দেশের মুক্তি কি আমরা চাইনে?

আচ্ছা চলুন, আপনাকে যথাস্থানে রেখে আসি। যেমনভাবে এসেছিলেন ঠিক সেইভাবে যেতে হবে।

চোখ বাঁধাবাঁধি আর কেন? আমি তো এখন তোমাদেরই একজন?

বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং—বলে কি একটা কথা আছে না? আমরা ওটা বড় মানি। আপনার একটু চাক্ষুষ অসুবিধা হবে বটে, কিন্তু কি করব এই বিয়ের এই মন্ত্র!

২০

শহরে এক যাত্রার দল এসেচে, ছেলেবুড়ো সবাই তাই নিয়ে মেতে উঠেচে। পরদিন রবিবার,—তাই ছেলেদের বহু আবেদন-নিবেদনে অবিনাশবাবু তাদের যাত্রা দেখবার ছুটি দিয়েছিলেন। প্রশান্ত ও মোহন দুজনে মাথায় মাথায় ঠেকিয়ে পাশাপাশি বসে যাত্রা শুনছিল।

যাত্রার দলে একটি কিশোরী নাচওয়ালি বিবিধ ভঙ্গীতে নাচছিল, প্রশান্ত ও মোহন

তারই দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিল। সব ছেলেরই দৃষ্টি ও মন সেই বালিকা হরণ করেছিল।

এতো সহজে মনে বিপ্লব ঘটাতে পারে দুটো জিনিস—বাঁশী আর নাচ। বাঁশীতে সুরের খেলা, নাচে রূপের লীলা—এই রূপ ও সুরের কাছে মানুষের আত্মা বাঁধা। সব বয়সেই বাঁশীর ও নাচের প্রভাব কেউ এড়াতে পারে না, তরুণ বয়সে ত এর মোহ অসীম। যে বাঁশী বাজায়, যে নাচে তার পায়ে প্রাণটা দিয়ে ফেলতে পারলে যেন বাঁচা যায়। মেয়েটির প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে ছেলেদের বুক দুলে উঠছিল।

মেয়েটি সকলের কাছে ঘুরে ঘুরেই নাচছিল, তবে সব ছেলেদের মাঝে সে মোহনের দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল, মোহনের তা অগোচর ছিল না। মোহনের দৃষ্টির সঙ্গে তার মুগ্ধ দৃষ্টি বাঁধা—এযেন অনন্ত কালের রহস্য। যেন দুটি আকাশের তারা দুজনের দিকে অনিমেষ চেয়ে থাকত বা এখন তারা দুটি অপলক চোখের তারায় ফুটে উঠেচে। তারা প্রশ্ন করচে অথচ উত্তরও যেন পেয়ে গেচে।

নাচতে নাচতে সে যখন মোহনের একান্ত কাছে আসছিল তখন মোহনের গালদুটি রাঙা হয়ে উঠছিল, চেষ্টা করে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে কেমন লজ্জায় সে চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল, মেয়েটি অমনি মুচকি হেসে সরে যাচ্ছিল।

অবশেষে গভীর রাতে যাত্রা ভাঙলে যখন অশান্তকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল, তখন কোথায় যেন একটু ব্যথার টান লাগল, মনে হল কাকে যেন ফেলে রেখে যাচ্চে!

বেরুবার পথে ভিড়ের ঠেলায় অশান্তর সঙ্গে মোহনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল,—গভীর রাতের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় বাইরে বেরুতেই হঠাৎ তার মনে হল এ যেন অপরিচিত জগৎ! এই যে এত লোক কলরব করে চলেচে এরা কেউই তার চেনা নয়, সে যেন পথহারা কোনো পথিক। পাশেই যাত্রার যাত্রীদের ছোট ছোট তাঁবু খাটানো, সেদিকে চাইতেই সেই নাচওয়ালি মেয়েটি হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলে।

মোহন একবার তার দিকে একবার জনতার দিকে তাকাল, তার পরে কিসের আকর্ষণে পায়ে পায়ে এগিয়ে তার কাছে গেল। যেতেই সে খপ্ করে তার হাত ধরে 'এসো' বলে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে গেল। চৌকির ওপর বসিয়ে আলোটা উসকিয়ে জিজ্ঞেস, করল, আমার সঙ্গে দেখা না করেই যাচ্ছিলে? আমরা যে কালই যাবো।

তার এই অভাবিত ব্যবহারে মোহন বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গেল।

কালই যাবে—সে কেবল তার কথারই পুনরুক্তি করল।

হ্যাঁ। আমার নাম অমিয়া। অমি বলে সবাই ডাকে। তোমার নামটি কি ভাই?

মোহন।

কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে মেয়েটি বল্লে, রাত অনেক হয়েচে। তোমার খিদে পেয়েচে নিশ্চয়। রাজবাড়ি থেকে খাবার এসেচে, তুমি একটুখানি বোসো,—আমি নিয়ে আসি।

খাবার-ভরা রেকাবি হাতে সে ফিরে এল, রেকাবিটা বিছানার ওপরে তার কাছে রেখে বল্লে, খাও।

খেতে তার বাধছিল না, কোনদিনই বাধে না, তবে খেতে বাধা ছিল। একটু ইতস্তত করে সংক্ষেপে বলল, আমার খিদে নেই।

খিদে নেই কি রকম? বোস, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

খাবার হাতে করে মুখের কাছে ধরে বলল, খাও। কোন দোষ নেই।

স্নেহের অনুরোধে মোহনকে খেতে হল,—সে বলল, আমি নিজেই খাচ্ছি।

মেয়েটি মোহনের পাশেই বসে পড়ল, মোহন একটু সঙ্কুচিত হয়ে বসল।

মোহনের বাঁ হাতের আঙুলগুলো নাড়তে নাড়তে হঠাৎ সে পরিহাস করে বল্লে, আচ্ছা তুমি আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছিলে কেন ? আমাকে তোমার ভালো লাগছিল ?

মোহনের ঘাড় আপনিই হেঁট হয়ে এল, মেয়েটি চিবুকে হাত দিয়ে মুখটি তুলে ধরে বল্লে, আমাকে ভালবেসেচ বুঝি ?

উপন্যাসে আর সহপাঠীদের কৃপায় ভালবাসার সঙ্গে সে অপরিচিত ছিল না, তবু এই নীরব নিশীথে একজন সমবয়সী সুন্দর মেয়ের মুখে এই সুলভ কথা ও দুর্লভ জিনিসটির প্রশ্ন শুনে অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার সারা দেহ শিউরে উঠল। সে চুপ করে রইল।

ভালবাসনা তা হলে ?

মোহন নিরুত্তর রইল। এই ধরনের কথাবার্তায় সে বড় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। দৈবাৎ এসে পড়ে যে তাকে এইভাবে বিপদগ্রস্ত হতে হবে তা সে ভাবেনি। কথাটার ধরন বদলাবার জন্য সে বলল, তুমি খাচ্ছ না যে। তুমিও খাও।

খাচ্ছি। একটা কথা বলব, বিশ্বাস করবে ?

নিশ্চয় করব।

তবে শুনে কাজ নেই।...আমার ব্যবহার দেখে তোমার বোধ হয় আশ্চর্য মনে হচ্ছে ? বয়সে তোমার চেয়ে আমি বেশি বড় নই, কিন্তু এইটুকু জীবনেই অনেক লোকের সঙ্গে মিশে, অনেক অবস্থায় পড়ে, অনেক ভেবে আমার অনেক অভিজ্ঞতা জন্মেচে। কিন্তু তোমার ঐ সুন্দর মুখখানি আজ এক নিমেষে আমার সব ধারণা ওলোটপালোট করে দিয়েচে। এতদিন আমি কী জীবন যাপন করেছি! প্রাণের মধ্যে টান বলে যে একটা কিছু আছে, তা তুমিই আজ আমাকে জানিয়েচ !

আর খেতে পারচি না। এবার আমি উঠি ?

আর খাবে না ? আর একটুখানি বোসো, আমি চট করে আসচি।

অমিয়া খাবারের রেকাবিটা তুলে কি ভেবে পাশের টিপয়ে রেখে দিল, তারপরে হঠাৎ দুহাতে মোহনের মুখখানি তুলে ধরে টপ করে একটু চুমু খেয়ে রেকাবি হাতে দ্রুতপায়ে চলে গেল।

মেয়ের চুমু! মোহনের সমস্ত শরীর বার বার শিউরে উঠল, কি এক বিদ্যুন্ময় চেতনার আড়ালে তার সমস্ত জগৎ এক মুহূর্তে হারিয়ে গেল।

ক্ষণেক পরে যখন তার মধ্যে সে ফিরে এল তখন, অনিচ্ছাতেও মেয়ের চুমু নিয়ে কত বড় অপরাধের বোঝা তার ঘাড়ে চেপে বসেচে, এই কথা ভেবে তার মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। মেয়েটি ফিরে এসে তাকে নিস্তব্ধ দেখে তার মনের অবস্থা বোধ করি বুঝল, একটিও কথা না বলে সহজ স্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। একটু পরে বলল, তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন ? আমি ত মেয়ে নই—

এই বলে সে গায়ের ওড়নাটা মাটিতে ফেলে দিতেই, সুন্দর কিশোর-তনু প্রকাশ হয়ে পড়ল। মোহন তার দিকে চেয়ে বিমূঢ় হয়ে শুধু বল্লে, তুমি ?

হ্যাঁ। আমি ত মেয়ে নই, যাত্রাদলের ছেলে অমিয়। তুমি আমায় ধরতে পারোনি। কি মজা !

মোহন তার হাসিতে যোগ না দিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, তুমি তাহলে এতক্ষণ আমার সঙ্গে কেবল মজা করছিলে?

অমিয় তার মুখখানি ধরে বল্লে, না ভাই লক্ষ্মীটি! রাগ কোরো না। আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবেসেছি,—

তার হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে মোহন বল্লে, এখন তবে যাই। বেশি দেরি করলে বোর্ডিংএর দরজা খোলানো দায় হবে।

অমিয় ম্লানমুখে বলল, এত রাত্রে বাড়ি যাবে? একলা?

হুঁ।

ভয় করবে না ত?

তৎক্ষণাৎ মোহনের মনে হল যে নদীর ধারের সেই পথ দিয়ে যেতে শ্যাওড়া গাছের ডালে লম্বমান মস্তক ও দোদুল্যমান দীর্ঘ পদযুগলের বিশ্বাসযোগ্য কত জনশ্রুতি আছে। তবু সাহস সঞ্চয় করে বলল, ভূত আমি মানিনে।

ভূতের কথা বলছিনে। সাপখোপ।

চাঁদ এখনো ডোবেনি।

আচ্ছা এসো তাহলে। বোর্ডিংএর ছেলে না হয়ে যদি বাড়ির ছেলে হতে তাহলে আজ তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতুম না, আমার কাছে রাখতুম!

মোহন উঠে দাঁড়াল। অমিয় বল্লে, একটু দাঁড়াও। তার হাতের চুণী বসানো সোনার আংটিটা খুলে মোহনের আঙুলে পরিয়ে দিল, এই দামী জিনিসটা কোনো জমিদারের ছেলের মনোরঞ্জন করে এসে পেয়েছিল। বল্ল, এটা তুচ্ছ জিনিস। এমনি তুচ্ছ হলেও আমাকে তোমার একটি রাতের বন্ধু বলে মনে রাখবে ত?

রাখব। কিন্তু এটা নাও।

এটা রাখবে না? এমন সুরে কথাগুলো বল্লে সে, যে মোহনের না-বলবার শক্তি রইল না। সে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল, তার যাওয়ার কথা ভুলে গেল। যে ছেলেটি তাকে একটি রাতের জন্যই ভালোবেসে এমন দামী আংটিটা উপহার দিল, তারই মনের আশ্চর্য রহস্যে যেন সে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইল। বিদায় নেবার কথা তার মনে এল না।

অমিয় দুহাতে মোহনের গলা জড়িয়ে ধরল, মোহন বাধা দিল না, তাদের গালে গালে ঠেকল—তারই নিবিড় স্পর্শ এবার তার মনে মোহ সঞ্চার করল। একটু পরে তাকে ছেড়ে দিয়ে অমিয় বল্ল, তোমার রাত হয়ে যাচ্ছে, আর দেরি কোরো না। কাল সকালে তুমি যদি না আসো ত আমি তোমার বোর্ডিংএ যাবো। মনে থাকে যেন।

ঘাড় নেড়ে মোহন বেরিয়ে গেল। বিছানার ওপর একলাটি বসে অমিয় কত কি ভাবতে লাগল, অনেকক্ষণ বসে থেকে বাতিটা নিবিয়ে সে শুয়ে পড়ল বটে, কিন্তু আরো বহুক্ষণ তার চোখে ঘুম এল না।

মোহন পথটা খাটো করবার জন্য একটা নিষিদ্ধ অঞ্চলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা বাড়ির দরজা খুলে তারেশ বেরুল, তখন তার বেশ একটু মদের নেশা হয়েছে।

মোহন কাছে আসতেই তাকে লক্ষ্য করে জড়িতকণ্ঠে তারেশ বলল, এতরাত্রে কে বাবা দুষমনের মত চলেছ! কোন্ গাছ থেকে নামলে যাদু?

মোহন তার দিকে তাকিয়েই অস্ফুট চিৎকার করে উঠল। তারেশ তাকে দেখে বল্লে,

কে বাবা মোহনচাঁদ যে ? কোথায় যাচ্ছ বাবা ? গোলাপীর গোলাপ-কুঞ্জে নাকি ? মাইরি !

মোহন তাড়াতাড়ি সরে পড়ছিল, তারেশ গিয়ে তার হাত চেপে বললে, ভয় নেই বাবা, আমি বাঘ ভালুক নই, খেয়ে ফেলব না। কিন্তু বাবা, এই বয়সে ডবল প্রমোশন নিয়ে আমাকে যে তাক লাগিয়ে দিয়েছ চাঁদ।

মোহন হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বল্লে, ছাড়ুন, আমি যাই।

আমার স্পর্শে তোমার সতীত্ব নাশ হবে না যাদু। আমি গোলাপী নই। পথে পেয়েছি, সহজে ছাড়ছি না, একটা চুমো খেতে দাও বাবা—

বলে সে মোহনকে চুম্বন করতে উদ্যত হল, মদের গন্ধে মোহনের মন দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। সে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগল।

নির্জন নিশীথ, কেউ কোথাও নেই, চাঁদও ডুবে যাচ্ছে। কেবল নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে একটা পথের কুকুর মোহনের এই দুর্দশায় দূর থেকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছিল, এবং মাঝে মাঝে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে প্রতিবাদ করে তারেশের এই অভদ্র আচরণের সমালোচনা করছিল। তারেশ বড় সেদিকে কান দিচ্ছিল না।

এমন সময়ে অত রাত্রে সাইকেল চালিয়ে দেবেন কোথা থেকে আসছিল, তাদের কাছে এসে গাড়ি থেকে নামল। বিস্মিত কণ্ঠে বল্লে, এ কি মোহন যে। এত রাত্রে এখানে ?

এই মাতালের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

দুঁতিনটা মোলায়েম গলাধাক্কা দিতেই তারেশ পথের পর সটাং শুয়ে পড়ল, তার আর উঠবার শক্তি হল না, শুয়ে শুয়েই সে বলতে লাগল, তোমরা যাও বাবা, আমি দেখে চোখ জুড়াই, না হয় আমি চোখ বুজছি। বাবা জগৎসংসার, তোমার [illegible] আলো, আয়েশ তোমারই, তুমিই আয়েশ কর।

দেবেন ঘৃণাভরে তার দিকে চেয়ে মোহনকে বল্ল, এখান থেকে চল। তোমাকে বোর্ডিংএ রেখে আসি, সাইকেলের পিছনে দাঁড়িয়ে যেতে পারবে ?

খুব পারব।

পথে যেতে যেতে দেবেন জিজ্ঞেস করল, এত রাত্রে কোত্থেকে আসছিলে ?

যাত্রা দেখে ফিরতে পথে এই।—

ওঃ, আজও বুঝি যাত্রা ছিল ? এত ব্যস্ত থাকি কাজে যে এ'কদিনের একদিনও দেখা ঘটে উঠল না। এই ত এখনি দশ মাইল দূর থেকে আসছি। কেমন যাত্রা হল ?

বেশ।

ওই মাতালটাকে তুমি জানো ? আমার চেনা চেনা মনে হল যেন ?

আমি জানিনে।

আর কখনো একলা যাত্রা দেখতে যেয়ো না। এই বলে তাকে বোর্ডিংএর সামনে নামিয়ে দিয়ে দেবেন চলে গেল।

২১

বোর্ডিংএর দরজায় একদিন সকালে কুড়ি বাইশ জন চাষী এসে হাজির, তারা সব বিভিন্ন গাঁয়ের মোড়ল, বহুদূর থেকে এসেছে! সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কাকে চাও ? উত্তর হল, সতীশবাবুকে।

সতীশবাবু কে ? সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বড় সমস্যায় পড়ে গেলেন, এ নামে ত এমন কেউ এখানে নেই যাকে এরা চাইতে পারে।

কৌতূহলী হয়ে মাস্টাররা সব এলেন, হেডমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি চাও ?

ঐ একই উত্তর ! সতীশবাবুকেই তারা চায় !

হেডমাস্টার পুনরায় বলিলেন, তিনি কি করেন ? এখানে ঐ নামে কোনো ভদ্রলোক নেই !

তারা বলল, নিশ্চয় আছেন। তিনি নিজেই আমাদের এই ঠিকানা দিয়েছেন। আমাদের বিপদে আপদে বুদ্ধি দিতে তিনিই একমাত্র ভরসা। আমাদের ছেলের বয়সী হলেও তিনিই আমাদের বন্ধু ! জমিদারের অত্যাচারে আমরা মারা যাচ্ছি তাই তাঁকে আমাদের বাইশীতে নিয়ে যেতে এসেছি !

বাইশীটা কি ?

বাইশ গ্রামের চাষী প্রজা মিলে সতীশবাবুর হুকুম শুনতে এক ঠাঁই জড়ো হয়েছে।

বটে ? কিন্তু কে এই অদ্ভুত সতীশবাবু ? তাঁরা সকলে মিলে গবেষণা করছেন, এমন সময়ে সতীশ এক কোণ দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে দেখে চাষীরা সকলে কলরব করে উঠতে সে থমকে দাঁড়াল।

এই যে আমাদের বাবু ! এই যে আমাদের সতীশবাবু !—চাষীরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সমস্বরে তাদের অভিযোগের বর্ণনা শুরু করল,—মাস্টারদের সামনে এই ভাবে ধরা পড়ে সতীশ লজ্জিত হয়েছিল, সে তাদের নিরস্ত করবার জন্য বললে, চলো, এখুনি আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি, সব সেখানেই শুনব।

সতীশ তাদের সঙ্গে চলে গেল, মাস্টার ও ছাত্ররা কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময়ে এমন বিমূঢ় হয়ে রইলেন যেন তাঁরা এইমাত্র চোখের সামনে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য প্রত্যক্ষ করছেন !

সতীশের অন্তরে চাষীদের জন্য সত্যিকার দরদ ও ভালোবাসা ছিল, তারা যাতে তাদের দাবি-দাওয়া বুঝে মানুষের মত উঁচু মাথায় বেপরোয়া চলাফেরা করতে পারে তাই ছিল তার কামনা ও সাধনা। চাষীরাও তাদের এই তরুণ বন্ধুটিকে চিনেছিল, তাই সব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিঃশেষে তার ওপরে ন্যস্ত করতে তাদের বাধেনি। জাতের, শ্রেণীর ও বয়সের পার্থক্য—ভালোবেসে যারা মিলতে চায় তাদের মধ্যে কোনদিনই বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। মনে ও মাথায় বড় বলে চাষীরা সবাই সতীশকেই তাদের একচ্ছত্র নেতা ও চালক বলে মেনে নিয়েছিল। সতীশও তাদের সঙ্গে মিশত ঠিক বন্ধুর মত, আপন জনের মত, কোনোদিনই নিজের চারিধারে ভেদের গণ্ডী রচনা করেনি—তাই মিলন-মন্ত্র তার মধ্যে সহজেই মূর্ত হয়েছিল।

সতীশের এই নেতৃত্ব লাভের মূলে একটা ছোট্ট ঘটনা আছে। নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টায় এক রবিবারে এক গাঁয়ে গিয়ে শুনল, সেখানে বাইশী বসেছে। সেও সেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে বসল।

নিজের কাজের জন্য নিজের জমিতে নিজের রোপা গাছ কাটবার অধিকার প্রজার নেই, নিজের গাছ কাটতে হলে জমিদার-সরকারে আবেদন জানাতে হবে, সেজন্য যথেষ্ট আক্কেলসেলামি দিতে হবে, তবে যদি হুজুরের মর্জি হয়।

দুটি প্রজার এই অপূর্ব ন্যায়ের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম ছিল না, তারা দরকারে পড়ে নিজেদের দুটো গাছ কেটে ফেলে,—এজন্য জমিদার-কাছারিতে তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে জরিমানা করা হয়। এই জবরদস্তি জরিমানা দিতে রাজি না হওয়ার জন্য সেখানে তাদের ওপর অত্যাচার ও লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। জমিদারের এমনই ভীষণ আক্রোশ ও দুর্ধর্ষ প্রতাপ যে কেবল সেইখানেই ক্ষান্ত না হয়ে হাতি দিয়ে চষিয়ে এই হতভাগা প্রজাদুটির ঘরবাড়ি ভিটেমাটি নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়েছেন। এই অত্যাচারের প্রতিকারে কি করা যায় তাই নিয়ে আলোচনা করতেই সেদিনের বাইশী বসেছিল, কিন্তু তারা কোন উপায়ই খুঁজে পাচ্ছিল না, কেবল চেঁচামেচি করছিল। তখন নবাগত সতীশ উঠে তাদের ভরসা দিলে,—তাদের ঐক্যের মধ্যেই অদ্ভুত শক্তি লুকিয়ে আছে—এই মন্ত্র তাদের প্রাণের মধ্যে সঞ্চার করে তাদের যেন নতুন জীবনের দীক্ষা দিলে!

তার পরদিনই সতীশের বুদ্ধিমত দুশো ঘর প্রজা মিলে নিজেদের দুশো গাছ কেটে ফেলল—দুজনের উদাহরণের জ্বলন্ত শিক্ষা যে দুশো গ্রাম উল্টো বুঝে নিল এই দেখে জমিদার-সরকার দস্তুরমত ভড়কে গেলেন। সহসা কারু ওপর অত্যাচার করতে তাঁদের সাহস হল না, হাতের নিসপিসানি হাতেই চেপে রাখলেন,—আদালতে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করলেন, প্রজারা চাঁদা তুলে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা লড়তে লাগল। অবশেষে আদালতে প্রজাদেরই জয় হল, তাদের দাবী সাব্যস্ত হল—সেইদিন থেকে প্রজারা সতীশকে দেবদূতের মত মানতে লাগল।

এবার তাদের বিপদ আরো গুরুতর—এবার তাদের জীবন মরণের সমস্যা! একটা প্রকাণ্ড বিল জমিদার বাঁধ দিয়ে বেঁধেছেন, জলকর থেকে বিপুল আয়ের প্রত্যাশায়। জেলেরা ঐ বিলে মাছের চাষ করবে তা থেকে জমিদার-সরকারের বছরে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা আয় হবে।

কিন্তু এই বিলের পাশে অসংখ্য প্রজার জমি,—বানের জল যদি বেরিয়ে যাবার পথ না পায় তাহলে তাদের সম্বৎসরের ফসল মাঠে মারা যাবে। খণ্ড দুর্ভিক্ষে, মহাজনের পীড়নে, আর জমিদারের অত্যাচারে বাইশ গ্রামের দশ হাজার প্রজা উচ্ছন্ন উজাড় হয়ে যাবে। তাঁদের বাঁচবার স্বত্ব, তাদের হাড়মাসকে একত্র রাখবার অধিকার আছে কিনা—উদ্ধত জমিদার এই প্রশ্নই যেন তাদের মনুষ্যত্বের কাছে দাবি করেছে; তারই উত্তর দেবার জন্য এই দুর্যোগ-দুর্দিনে বাইশ গ্রামের প্রজা একত্র।

সেই বিলের পাশেই বাইশী বসেছিল। পৌষের শেষে এবার যে বিপুল বর্ষণ হয়ে গেছে তারই জল ঐ বিলে থৈ থৈ করছিল। সতীশ সেই বিরাট সভায় তরুণ জয়ন্তের মত দাঁড়িয়ে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলছিল—ভাই সব, এই যে জমিদারের উচ্চ প্রাসাদ ও আমাদেরই বুকের রক্তে লাল! আর এই যে সামনে বিপুল বিল এ আমাদেরই চোখের জল! ঐ রাজপ্রসাদের রক্ত যুগিয়েছে আমাদের বাপদাদারা, আমরাও যোগাচ্ছি! আর এই বিলভরা চোখের জল যোগাব আমরা, আর যোগাতে থাকবে আমাদের ছেলে, ছেলের ছেলেরা! আমাদের মধ্যে যদি প্রাণের মিল থাকে, যদি হাতে জোর, মনে বল থাকে, যদি ঐক্য থাকে, তবে এসো আজই আমরা এই অশ্রুজলের শেষ করে দিই! একটা করে কোদাল আর একটা করে ঝুড়ি! এই চাই! এক্ষুনি আমরা সবাই মিলে বাঁধ কেটে জলের পথ করে দেব!

সবাই একসঙ্গে মহাকলরবে জয়ধ্বনি করে উঠল,—এই ত পথ, এত সহজ! এতক্ষণ

কারু মনে পড়েনি! সতীশবাবু ঠিকই বলেছে, বাঁচবার দাবি তাদের সবারই আছে, সে অধিকার নিজের বাহুর জোরেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে—এর জন্য ভিক্ষা কার কাছে, ক্রন্দন কিসের! ভগবানের আইনের বড় দুনিয়ায় আর কী আছে!

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি বাড়ি থেকে অনেক কোদাল আর ঝুড়ি জোগাড় হয়ে গেল,—এতক্ষণ যে দশ হাজার লোক আসন্ন বিপদের ভয়ে মনমরা হয়ে ছিল, এখন যেন প্রাণের স্পর্শে এক বিরাট দৈত্যের মত বিপুল উৎসাহে জেগে উঠল! সতীশ নিজেও তাদের সঙ্গে কোদাল ধরল,—কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁধ কেটে পথ করা হল,—বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা সেই পথে জলের মত হু হু করে খরচ হয়ে চলল।

ভগ্নদূতে জমিদারের কাছে খবর নিয়ে গেল—কি করবেন কিছুই তাঁরা স্থির করে উঠতে পারলেন না। এতগুলি বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে লাগা জাঁদের বিরাট কদাকবাহিনীর পক্ষেও হয়ত সম্ভব ছিল না—কেননা সত্যের দাবি ছিল ঐ দশ হাজার প্রজার দিকেই। কাজেই তাঁদের সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল একমাত্র সতীশের ওপর—তারই কুমন্ত্রে ত এতটা ঘটেছে। তাঁরা ঘোষণা করলেন, যে সতীশের মাথা এনে দিতে পারবে তার পুরস্কার হাজার টাকা! আর যে প্রজা তাকে আশ্রয় দেবে তার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে!

এই ঘোষণা যখন সতীশ ও তার চাষী বন্ধুদের কানে পৌঁছল তখন রাত দশটা বেজে গেছে—তারা সকলেই চিন্তিত হয়ে উঠল। কেননা দশ হাজার প্রজার প্রতি যে অত্যাচার সম্ভব নয়, বিশিষ্ট কয়েকজনের প্রতি তা অনায়াসেই তারা করতে পারে—মাথা নেওয়ার আর ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া ত জুড়ি সামান্য কথা! এই ঘোষণার পর সতীশ একান্ত অনুরোধেও তাদের কারও বাড়িতে অতিথি হতে রাজি হল না,—তাদের অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করল। অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে তারা সতীশকে বিদায় দিল।

সতীশ বলল, এখান থেকে স্টেশনতো বেশি দূর নয়। রাত্রের গাড়িতেই আমি মালদা চলে যাব,—ট্রেনে এক ঘণ্টার তো পথ।

একজন বলল, মালদা গিয়ে পৌঁছতে পারলে আপনার আর ভয় নেই! সেখানে কোম্পানীর সরকার, জমিদারের টাঁ ফোঁ সেখানে চলছে না।

সতীশ হেসে বলল, আমি নিজের জন্য ভয় করিনে, কিন্তু তোমাদের জন্য ভাবনা রইল। মাঝে মাঝে তোমাদের লোক পাঠিয়ে খবর দিয়ো!

তা দেব। এখন চলুন, আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

না না, এত লোকজন ভিড় হৈচৈ করে গিয়ে কাজ নেই, এমনি একা চুপচাপ চলে যাব কেউ টের পাবে না। আর এতো রাত্রে জমিদারের কোন্ লেঠেল আমার মাথা নিতে বসে আছে!

তারাও ছাড়ে না, সতীশও রাজি হয় না। অবশেষে সতীশেরই জিৎ হল, ক্ষীণ চাঁদের আলোয় গ্রামের সরু পথ দিয়ে সতীশ একাই চলে গেল। সতীশ যাবার পরই তার কয়েকজন চাষী-বন্ধু হাতিয়ার-লাঠি নিয়ে দূর থেকে তার অনুসরণ করে চলল, সে নিরাপদে স্টেশনে পৌঁছল দেখে তারা নিশ্চিন্ত মনে ফিরে গেল,—তার দরদী বন্ধুরা যে তার পিছু পিছু এসে তাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে সতীশ তা জানতেও পেল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সতীশ যে মুহূর্তে স্টেশনে পৌঁছল সেই মুহূর্তেই ট্রেন স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তারপরে আর পরদিন ছাড়া গাড়ি নেই। সতীশ স্টেশনের এক কোণে একটা ভাঙা বেঞ্চিতে বসে এখন কি করবে তাই ভাবতে লাগল।

রাত্রের মত কাজ সেরে, রেলের কর্মচারীরা স্টেশনের বাতি নিবিয়ে নিয়ে চলে গেল,—গ্রাম্য স্টেশন, উপরে একটা টিনের ছাদ—চারিদিকে খোলা, হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আসচে। কোনো বিশ্রামের ঘর নেই, কোনো বিশ্রামার্থীও নেই। নিঃসঙ্গ সতীশ শীতে হি হি করে কাঁপতে লাগল।

সতীশ ভাবল, এই ভাঙা বেঞ্চের উপরে সারারাত ঘুমোলে ঠাণ্ডা লেগে পরদিন তার কি অবস্থা দাঁড়াবে তা অনুমান করা নিতান্ত কঠিন নয়। তার ওপরে চাইকি ভোরে উঠে হয়ত দেখবে তার মস্তকটির যেখানে থাকবার কথা ভুলক্রমে সেখানে সেটি নেই!

তার চেয়ে এই রেলপথ ধরে হেঁটেই মালদা চলে যাকনা কেন, ভোর নাগাদ গিয়ে পৌঁছবে। হাঁটতে হাঁটতে শরীরও একটু গরম হবে, মাঘের এই হাড়-ভাঙা শীতও সহজে চেপে বসতে পারবে না। এবং কাল সকালেই তার বোর্ডিংএ পৌঁছানো দরকার, পুরো একটা দিন বোর্ডিংএ অনুপস্থিত, এর তো কৈফিয়ৎ দিতে হবে!...সে হাঁটাই শুরু করল।

নির্জন রেলপথ—কখনো দুধারে সীমাহারা চষা-মাঠ, কখনো ফসল ক্ষেত, কখনো বন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেছে। কখনো তার দুই পাশে ক্ষুদ্রতম পাহাড়ের মত মাটির ঢিবি বহুদূর জুড়ে চলে গিয়েছে,—তার ওপর থেকে হালুম করে হঠাৎ নেকড়ে বাঘ লাফিয়ে পড়া বিচিত্র কিছু নয়!

এই স্টেশন থেকে মালদা স্টেশন অন্তত কুড়ি মাইলের ব্যবধান, অবশ্য চার পাঁচ মাইল অন্তর অন্তর ছোট ছোট স্টেশন আছে। পথের আশেপাশে যে সব গাঁ, রেললাইন থেকে তাদের কারুরই দূরত্ব তিন মাইলের কম হবে না, কোথাও দশ মাইলেরও বেশি! সতীশ একাকী এই পথ অতিক্রম করে চলল,—এই চলার পথে তার প্রাণে কোথা থেকে যেন অসীম শক্তির আভাস এসে স্পর্শ করছিল, তারই অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে গোপন আনন্দে সে চলছিল।

রেলের সাঁকোগুলি সে সন্তর্পণে পেরুচ্ছিল, কেননা চাঁদ তখন প্রায় ডোবে ডোবে, আর সেতুর মাঝে বড় বড় ফাঁক। এই রকমে সে পনের মাইল পথ অতিক্রম করে একটা বড় সাঁকোর কাছে এল, তখন চারিদিকে ঝাপসা আঁধার, কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সাঁকোর ওপর দিয়ে অতি সাবধানে পা টিপে টিপে চলল, কেন না পা-ফেলা-ছন্দের মধ্যে ঈষৎ ব্যতিক্রম হলেই মাঝের বড় বড় ফাঁক গলে একেবারে নিচের স্রোতস্বতীর মধ্যে অনিবার্য পতন!

সে যখন সাঁকোর প্রায় মাঝামাঝি গেছে তখন অদূরে দেখল একটা আলোর গোলা তার দিকে ছুটে আসচে—একটা মালগাড়ি! হেলির ধূমকেতুর মত এই মালগাড়িগুলো কখন আসবে কখন যাবে কিছু সুনির্দিষ্ট নয়। সতীশ দেখল ভয়ানক বিপদ, গাড়ি প্রায় তার ঘাড়ে এসে পড়েচে! তখন সাঁকোর যে ফাঁককে সে এতক্ষণ গুপ্তশত্রুর মত ভয় করে চলছিল তাই তার পরম বন্ধুর কাজ করল, এক নিমেষে সেই ফাঁক গলে সে নদীর নিরাপদ বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

ভালো সাঁতার জানত, তাই স্রোতের টানে খানিকদূর ভেসে গিয়েও আবার রেলপথে ফিরে এল। ভিজে কাপড়েই চলতে লাগল,—বরফের মত ঠাণ্ডা জল,—তার আপাদ মস্তক যেন প্রতিমুহূর্তেই জমে যাচ্ছিল। অবশেষে বাকি পাঁচ মাইলও সে অতিক্রম করল, অবশদের মত অতি ভোরে বোর্ডিংএ এসে পৌঁছল,—এতো ক্লান্তি, এতো শ্রান্তি, এতো

ঘুম তাকে পেয়েছিল, ছুঁচ্ছে-পেতে কাপড় বদলাবার অবসর তার হলোনা, ভিজে কাপড়ের শীতল আলিঙ্গনের মধ্যেই সে বিছানায় ঢলে পড়ল।

২২

মোহনের মধ্যবর্তিতায় আলাপের সূচনা হয়ে এত দিনে সতীশ ও দেবেনের মধ্যে বন্ধুত্ব পাকা হয়ে উঠেছিল। সেদিন বোর্ডিংএর একটি ঘরে বসে সতীশ দেবেনকে খবরের কাগজের সর্বপ্রধান খবরটি পড়ে শোনাচ্ছিল—

রসা রোডে অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড

সি-আই-ডির কর্মচারী শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সাহা সাইকেলে চড়ে রসা রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একটি যুবক এসে তাঁর ললাট লক্ষ করে তিনবার পিস্তল আওয়াজ করে, তিনটি গুলিই তাঁর ললাটে বিদ্ধ হয়েছে। অক্ষয় বাবু সাইকেল থেকে পড়ে যান, তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রাণবিয়োগ হয়। রাস্তার লোকজন এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় এমনই হতভম্ব হয়ে যায় যে যুবকটি অক্ষয়বাবুরই সাইকেলে চড়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেও কেউ তাকে বাধা দিতে পারেনি।

কিছুদূর চলে যাবার পর সকলের চেতনা হয়, এবং অনেকেই তার পিছু পিছু তাড়া করে দৌড়ায়, তবু তাকে ধরা সম্ভব হতনা যদি না একজন সাহেবের পিস্তলের গুলিতে তার সাইকেলের চাকা ফাটত। সাহেবটি মোটরে তার অনুসরণ করেছিলেন।

ধরা পড়ে যুবকটি তার নামধাম কিছুই প্রকাশ করেনি। তাকে লালবাজার থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার পকেটে একখানা চিঠি পাওয়া গেছে সেখানি তার কোনো বন্ধুকে লেখা—তাতেই জানা গেছে তার নাম সুধীর। তার বয়স অন্তত পঁচিশের কম নয়, দেখলে তাই মনে হয়। পুলিসের জোর তদন্ত চলচে।...

সতীশ কাগজ পড়ছিল, ও মাঝে মাঝে দেবেনের দিকে তাকাচ্ছিল, সুধীরের নাম শুনে তার দুটো চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে এল দেখে সে ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, একি ?

খাপছাড়ার মত দেবেন বলল, শীঘ্রি দেখ ? কোন সুধীর ? সুধীর রায় কি ?

সতীশ দেখে বলল, তাতো কিছু লেখেনি, এই শোন না :—

বাকিটুকু শুনে দেবেন আশ্বস্ত হল। বলল, ওঃ, তাই ভালো। বয়স পঁচিশের বেশি, এ সে নয়।

তুমি কার কথা বলচ ?

আমি সুধীরকে জানি, এ সে নয়। সে বড় জোড় কুড়ি, প্রায় আমার বয়সী।

সে কি বিপ্লববাদী ?

হ্যাঁ-না,-তা নয়। সে বিপ্লববাদী বটে, তবে এত সুন্দর, তার প্রাণ এত কোমল যে সে কিছুতেই এমন বীভৎস কাজ করতে পারে না। মানুষ খুন, কি ভয়ানক !

শুনেছি তাদেরকে অনেক সময়ে কর্তার আদেশে কর্তব্যের অনুরোধে, প্রাণের ধর্মের বিরুদ্ধ অনেক কাজ করতে হয়।

তা, হয় ত হয়। কিন্তু সুধীরের পক্ষে, সে মুখে খুব বড়াই করলেও, তা কাজে

করা অসম্ভব। আমি ছেলেবেলা থেকেই তার মন জানি। তার অন্তরে দেশের স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিরন্তর জ্বলছে একথা সত্যি, তা বলে সে কখনই হত্যাকারী হতে পারে না।

সে তোমাকে চিঠি লেখে? এর মধ্যে তার চিঠি পেয়েচ?

সে এখন ভাগলপুরে। কিছুদিন থেকে তার চিঠি পাইনি বটে তবে তার শেষ চিঠি আমার পকেটেই আছে, এই দেখ।

একটি খাম সতীশের হাতে দিল, সতীশ চিঠিখানা বের করে তার ওপর চোখ বুলিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, এরত আমি একবিন্দুও বুঝতে পারছিনে। এটা চিঠি, না, equation-এর আঁক?

দেখি!...তাইত! এটা আমাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা, এতে আমাদের কাজের কথা আছে, এ তুমি কিছু বুঝবে না, আর তোমাকে বলবারও অধিকার আমার নেই। কিছু মনে কোরো না। বাংলা চিঠিখানা বাড়িতে ফেলে এসেচি, তোমাকে দেখাব।

তুমি তাকে খুব ভালোবাসো, না?

আমি? আমি তাকে ভালোবাসি আমার প্রাণের মত, আমার দেবতার মত, দেশের মত। আমি মনে মনে তার পূজা করি, ঘুমিয়ে তারই স্বপ্ন দেখি। অনেক ছেলেই আমার প্রিয়, কিন্তু সে আমার প্রিয়তম।

ভারি আশ্চর্য ত! অনেক রকম বন্ধুত্বের কথা শুনেচি, কিন্তু এরকম ভালোবাসার কথা ত শুনিনি। তুমি কি ছেলেবেলা থেকেই তাকে এমনি ভালোবাসচ?

ছেলেবেলায় তাকে আরো বেশি ভালোবাসতুম, সে ভালোবাসার কতকটুকু এখন আমার মনে জাগে,—তেমন ভালোবাসা আমি এপর্যন্ত কাউকে ভালোবাসতে পারিনি, বোধ হয় কেউই তেমন ভালোবাসতে পারে না।

বটে? কি রকম?

তার কতটুকুই স্মরণ করে এখন তোমাকে বলতে পারব! বারো বছর বয়সে যেদিন আমি স্কুলে ভর্তি হই পঞ্চম শ্রেণীতে, সেই দিনই আমি আমার এই পরম সুন্দর সহপাঠীটিকে ভালোবেসে ফেলি—যাকে বলে প্রথম দর্শনেই প্রেম। কিশোর দেবকুমার—তার হাসিতে চাউনিতে, কথাবার্তায়, চলাফেরায় যেন অপরূপ রূপ অনুক্ষণ ঝরে পড়ত!

বল কি? এ তো ভারি রোমান্টিক!

দুটি বছর আমি তার সঙ্গে পড়েছিলুম, সেই দুটি বছর আমার যেন স্বপ্নে স্বপ্নেই উড়ে গেছে। পড়াশুনা কিছুই করতুম না, দিনরাত কেবল তার কথা ভাবতুম। তার নাম লিখে লিখে আমার খাতাপত্র ঘরের দেয়াল সব ভরে গেছল, তাকে একটুখানি দেখবার জন্য বিশেষ বিশেষ জায়গায় কতক্ষণ অপেক্ষা করতুম, আড়ালে আবডালে জানলার ফাঁকে তাকে একটু দেখে নিতে পারলে নিজেকে কত ধন্য মনে করতুম,—সে ছিল এক অদ্ভুত ভালোবাসা। এখনো আমি তাকে সারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি বটে, কিন্তু ছেলেবয়সের সেই ভালোবাসার কথা মনে হলে আমারই এখন হাসি পায়!

সেও তোমাকে ভালবাসতো?

সে কথা জানবার আমার কোনদিন অবসর হয়নি। আমি নিজে ভালোবেসেই এত বিভোর ছিলুম যে তার ভালোবাসা পাবার কথাই আমার মনে জাগেনি। তখন জানতুম একা একা ভালোবাসাই হচ্ছে প্রেমের সত্য এবং তাতে আমার আনন্দ কম ছিল না।

তার প্রতি আমার প্রেম এত গভীর ছিল যে দুবছরে আমি তার সঙ্গে একটি কথাও বলতে সাহস করিনি, নীরবে চোখের ভাষায় আমাদের আলাপ চলত। তার চোখ দিয়ে চাঁদের মত এমন স্নিগ্ধ কিরণ ঝরত, সেই সুধাতেই আমার প্রাণের তৃষ্ণা মিটত। সে বেশ জানত আমি তাকে ভালোবাসি, তাই আমি কাছে গেলেই তার গাল দুটি গোলাপের মত লাল হয়ে উঠত। কেন জানি না, দুবছর আমরা কেউই কারু সঙ্গে মিশতে পারি নি। এটাও আমার এখন খুব আশ্চর্য ঠেকে।

সতীশ। বৈষ্ণব কবিদের প্রেমের গাথায় অনেকটা এই ভাবের পরিচয় আছে। সৌন্দর্য ও প্রেমের আকর্ষণে দেখছি লিঙ্গভেদ নেই!

দেবেন। বৈষ্ণব কবিরার-রাধাকৃষ্ণকে যেমন ভালোবাসতেন তার প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল তেমনি তন্ময়, তাকে নিয়ে আমার কত কি সাধ মনে জাগত, শুনলে তুমি হাসবে, আমার নিজেরই এখন হাসি পায়! কিন্তু এত কাছে পেয়েও তার-আমার মধ্যে যে বিরহের ব্যবধান ছিল, তা বোধ হয়, আজও ঘোচেনি, হয়ত সত্যিকার প্রেমে তা কোনদিন ঘোচে না।

সতীশ বলল, তাই ত কবি বলেচেন—

আমি তোমারই বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ-মাস!—

দেবেন হেসে বললে, অরুণা! তার কারণ অনেকটা আমাদের নিজের গড়া, আমি ছিলাম ভীরু, আর সে ছিল লাজুক, তাই আমরা সে-সুযোগে মিশতে পারিনি। এখন তো আমার প্রাণ যাকে চায় তাকে আমি এক মুহূর্তের মধ্যে আপনার করে নিতে পারি অতি সহজেই,—কিন্তু তখন এই কাজটিই কত শক্ত ছিল।

তারপর আবার কবে তোমাদের মিলন হলো?

সে বহুদিন পরে, কলেজে ভর্তি হয়ে। ভাগ্যক্রমে সে আর আমি একই কলেজে পড়েছিলুম তাই,—নইলে এজীবনে আর পরস্পরকে চেনবার, পাবার সুযোগ হত কিনা কে জানে! তখন আমরা অতি সহজেই মিশলুম, যেন ছেলেবেলার বন্ধুর মত, তখন সেও লাজুক নয়, আমিও আর ভীরু নই।

তারপর থেকে কেমন ভালোবাসা চলচে? আজ কাল?

অত কথা কি এক নিশ্বাসে বলা যায়? বিপ্লবের পথে পা দিয়ে সে আর আমি দুজনেই কলেজ ছেড়েচি, সে আগে ছেড়েছিল, পরে সেই আমাকে দলে টেনে নিল, তারই কাছে আমার স্বাধীনতার প্রথম মন্ত্রদীক্ষা! আমি তাকে এখনও তেমনি ভালোবাসি, কিন্তু তার প্রেমের মধ্যে তাকে সম্পূর্ণ—যতটা তাকে চাই ততটা যেন আমি পাই না, সে ভালবাসে, কিন্তু তার মধ্যে ব্যবধান একটা কেমন যেন ঘোচে না!

সত্যি, তোমার সুধীরকে দেখবার আমার এত লোভ হচ্চে, তেমনি খুব শ্রদ্ধাও জাগচে! তিনি কি এখানে আসবেন, তাঁকে একবার এখানে আনাতে পারো না?

আনাতে পারি কিন্তু সাহস হয় না। তার পদেপদেই এখন বিপদ। তোমাকে গোপনে বলতে বাধা নেই, এই তরুণ বয়সেই সে এখন বাঙলার বিপ্লবী-নেতাদের একজন। আবার তার দেখা পাব আমি নিজেই কখনো এ আশা করি না!

তবে থাক, কাজ নেই। তুমি যাকে দেখে ভালোবেসেছিলে, আমি তাকে না হয়

না দেখেই ভালবাসলুম। হাসচ যে? সুধীরকে ভালবেসে তোমার মত আমি অধীর হব না, ভয় নেই!

দেবেন কহিল, কথায় বেলা পড়ে এল। বিকেলে আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। তোমার বোর্ডিংএর খবর কি? অশান্ত-মোহনকে দেখতে পাচ্ছিনে যে? কোথায় গেল?

সতীশ বিরসমুখে বলল, তাদের নিয়েই ত যত গোল বেধেছে। তাদের বন্ধুত্ব নিয়ে ছেলেরা কুৎসা রটাচ্ছে, মাস্টাররা তাদের নৈতিক চরিত্রে সন্দেহ করছেন। তারা নাকি—

সে কি? তারা পরস্পরকে নষ্ট করচে এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনে।

কিন্তু অনেক ছেলেই চোখে দেখেছে যে। অবশ্যি বেশি কিছু দেখেনি,—তবে সকলের সামনেই তারা চুমো খায়!

দেবেন উচ্চহাস্য করে বলল, চুমো খায়, এই কেবল! শুনে আমার এত পুলক হচ্ছে, কি বলব! প্রাণ খুলে ভালবাসবে না ত বাঁচবে কিসে, জীবনে অমরত্ব অর্জন করবে কোন অমৃতে?

কিন্তু তাতে বোর্ডিংএর আর সব ছেলের খারাপ হবার ভয় আছে।

অমন খারাপ হতে পারলে তোমার বোর্ডিংএর ছেলেরা উদ্ধার হয়ে যাবে। আমি এসে অবধি দেখচি তোমাদের বোর্ডিংএর একটি ছেলেও নষ্ট না হয়ে নেই, সবাই নিজের ও পরের মস্তক চর্বণে অভ্যস্ত,—অথচ যা তাকালেই চোখের ওপর ধরা পড়ে সেদিকে কর্তাদের দৃষ্টি নেই,—কিন্তু যে ছেলেদুটির নিষ্কলঙ্ক মুখ দেখলে মূর্ত ব্রহ্মচর্যের কথা মনে পড়ে তাদেরকেই তোমরা অপরাধী সাজিয়ে বসে আছ। বেশ ত মজা!

সতীশ আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি কি বলতে চাও শুধু চুমু খাওয়াতে কোনো দোষ নেই! নৈতিক নষ্ট না হয় মাফই করলুম, কিন্তু কেবল চুমো খাওয়াতেই কী হতে পারে জানো?

জানি বই কি। চুমোর কি মন্ত্রশক্তি তা আমি আর জানিনে! কেবল একটিমাত্র প্রাণের চুমো দিয়ে একটি ছেলের ঘুমন্ত প্রাণকে জাগানো যায়, তার অন্তরের উদ্বোধন হয়, তাকে ভালো করা যায়, সে ভালোবাসতে শেখে, তার মনে সত্যের—সুন্দরের বোধ জাগে—যা শত শত বক্তৃতা, উপদেশে হবার নয়। যাকে বলে আত্মার জাগরণ তাই হয়—ভালোবাসার একটি চুমুর ইন্দ্রজালে।

সোজা কথায়, চুমু দিয়ে তাকে এঁচোড়েই বেশ পাকিয়ে তোলা যায়, তাতে আর ভুল নেই!

দেবেন গম্ভীরভাবে বলল, তা হবেও বা। এই জন্যই বোধ হয় মানুষের দাড়ি গোঁফ পেকে যায়, কেবল বউ-এর চুমু পেয়ে পেয়ে।

সতীশ হেসে ফেলে বল্লে, কিন্তু ভাই, তোমার চুমোর মন্ত্রশক্তির কোথায় যেন গলদ আছে। যে চুমুতে অশান্ত ও মোহন পরস্পরের প্রাণের ফুল ফোটাল তাতে কিন্তু গুরুজনদের মানসিক অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠেচে, তাঁরা ঐ ইন্দ্রজালে ঠিক মুগ্ধ হতে পারচেন না।

মাস্টাররাও তাদের চুমু খেতে দেখেচেন নাকি?

দেখেননি, তবে শুনে তাঁদের বিশ্বাস হয়েচে। তাইতেই ত বিপদ। তাঁরা নিষেধ করে পরস্পরের সঙ্গে মেশামেশি বন্ধ করে দিলেন, দুটো দিন সবুর কর্ তা নয়, হতভাগা ছেলেদুটো তবু মিশতে ছাড়বে না, আবার তাঁদের দেখিয়ে দেখিয়েই। বলে, মিশে তারা কোন্ অন্যায়টা করচে!

বটে? এখন ওদের কি হবে তাহলে?

ঠিক বলা যায় না। বড় ছেলে হলে এত স্পর্ধা তাঁরা সহ্য করতেন না, কোনদিন "রাস্টিকেট" করিয়ে তাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু নেহাৎ ছোট বলে মাস্টারদের মনেও মায়া হচ্ছে, এই যা রক্ষা!

সাধে কি বঙ্কিমবাবু তাঁর দুর্গেশনন্দিনীতে লিখে গেছেন সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র! লাখ কথার এক কথা! এই সর্বপ্রত্যক্ষ মন্ত্রের তিনিই সর্বপ্রথম দ্রষ্টা এজন্য তাঁকে বারম্বার নমস্কার করি! —এই বলে দেবেন যুক্ত-কর কপালে ঠেকাল।

তাদের নিয়ে সতীশ ও দেবেনের মধ্যে যখন এইসব আলোচনা চলছিল, অশান্ত ও মোহন তখন অশান্তর দাদার বাসাতে নানারকম জল্পনকল্পনায় মশগুল। তারা ঠিক করেছে আর বোর্ডিংএ থাকা নয়, কেউ কাউকে ছেড়ে যখন একদণ্ড থাকতে পারবে না এটা স্থির, তখন এই বাঁধাবাঁধির মধ্যে থেকে প্রাণকে পিষে মারা কিছু নয়। তারা ত জানে পরস্পরকে তারা নষ্ট করেনি, কোনদিন করবেও না, তা হলেই হল—পরের কাছে তার সাফাই দেবার এত কি গরজ! তারা ভালো, আর তারা কেবল ভালোবাসে, —আর কেউ না জানুক মা দুর্গা ত একথা জানেন। মা দুর্গা ছাড়া আর কাউকেই তারা কেয়ার করে না।

তাই তারা বোর্ডিং ছেড়ে স্কুল ছেড়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে আজ সন্ধ্যার ট্রেনেই নিরুদ্দেশ-যাত্রা করবে। কোথায় যাবে সেটা গাড়িতে বসেই ঠিক হবে, যেখানে খুশি হবে সেখানেই নেমে পড়বে, তারপরের কথা তারপরে। ভয় বা ভাবনার কী আছে, মা দুর্গা ত সর্বদাই তাঁর এই ছেলে দুটিকে দেখবেন।

সামনের ছুটিতে বৌদি শাশুড়ী দেখবে বলে অশান্ত তার বৌদির কাছে কিছু টাকা চেয়ে নিয়েছিল, তাই এখন তাদের পথের সম্বল। অবশ্যি বৌদির শাশুড়ী দেখবার তাদের খুবই সখ ছিল, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না, —যখন আরো বড় হবে তখন দেখবার অনেক অবসর পাবে এই হল সান্ত্বনা। ছোট্ট উল্কাকে মোহনের কাছে রেখে অশান্ত ভেতরে গেল দুজনের কাপড়চোপড় ও আর সব দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে।

মোহন আদর করে ডাকল, উল্কা!

উল্কা কাছে এল, আধ-আধ ভাষায় বলল, কি বলচ!

অশান্তর এই ক্ষুদ্র ভাইপোটিকে মোহনের বড় ভালো লাগত, আজ একে ছেড়ে যাবে তার বড় দুঃখ করতে লাগল। সে তাকে টেবিলের ওপর বসিয়ে গালে একটা চুমু খেল।

এই সমাদর উল্কার পছন্দ হল না, সে ছোট্ট হাতে ঘুষি তুলল, কিল খেয়ে মোহন তার সেই হাতে চুমু দিল। উল্কা তখন লাথি তুলল, মোহন তার পা ধরে চুমু খেল, —উল্কা তখন আর কোনো উপায় না দেখে মোহনের চুল আঁকড়ে ধরল, একমাত্র এই অস্ত্রেই সে তাকে কাবু করতে পারত।

মোহন তখন এই বিদ্রোহী ক্ষুদ্র শিশুকে তার কোলের কেল্লায় বন্দী করে হাত পা চেপে ধরে তার দুই গালে অজস্র চুমু দিল— আদরের চাপে উল্কার দুই গাল আপেলের মত লাল হয়ে উঠল। সেই রাঙা রাঙা গাল দুটি সে আপনার গালে চাপতে লাগল।

মোহনকে যখনি দেখতে পেত তখনি উল্কা তার কাছে ছুটে আসত, কিন্তু তাই বলে, মোহনের এত আদর তার ক্ষুদ্র প্রাণে সহ্য হত না, —প্রথম প্রথম কিছুক্ষণ চুপ করে সইত, তারপরেই রীতিমত বাধা দিতে শুরু করত। কিন্তু তাকে মোহনের এত

ভালো লাগত যে সে আদরের মুখে কেবল তাকে পীড়ন করছে একথা তার খেয়ালই হত না। মোহন দস্তুরমত একজন শিশু-শিকারী হয়ে উঠেছিল!

এইভাবে বন্দী হয়ে উল্কা বড় ফাঁপরে পড়ল, আর কিছু না পেয়ে মোহন যতবার তার চুমু খেল ততবার সে তার মুখে কামড় দিল— তার দংশনে মোহনের ঠোঁট দুটি জ্বালা করতে লাগল। শিশুর কচি কচি দুধে দাঁতগুলি যে মধু-বিষ ছড়ায় তার লোভ ত কম নয়, তবু সেই প্রলোভন দমন করে মোহন অবশেষে তাকে মুক্তি দিল!

অশান্ত একটা ছোট পুঁটুলি নিয়ে ফিরে এল। মোহন জিজ্ঞেস করল, কি কি নিলে ওতে?

খান কয় কাপড়চোপড়, আমার মার ছবিখানা, খান দুই গল্পের বই যা হাতের কাছে পেলাম, আর—

আবার কি?

চিঁড়ে আর পাটালি গুড়, কি জানি যদি খাবার না জোটে, পথে পথেই দুদিন কেটে যায়, তাই আগে থেকে রসদ সঙ্গে রাখলুম।

ঐ সঙ্গে কিছু খাজা আর রস-কদম বেঁধে নিলে না কেন? তোমাদের মাজনার বিখ্যাত দুটি চীজ!

এখন ত ঠাট্টা হচ্ছে, কিন্তু বলি, কার বেশি খিদে পায়? আমি শিবরাত্রির উপোস করে দেখেছি এক দিন এক রাত কিছু না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু তোমার যে মুখটা অন্তর অন্তর খিদে পেতে থাকে, তখন কি উপায় হবে?

নিয়েছ বেশ করেছ, আমি কি মানা করেছি? পাটালি গুড় ত আমিই নিতে বলেছিলাম, মনে নেই?

খুব মনে আছে, এখন চল, বেলাবেলি বেরিয়ে পড়ি। একেবারে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, যাবার আগে চারধারটা চোখ ভরে দেখে নিই!

নদীর ধারের পথটা দিয়ে চল, বেড়াতে গিয়ে যেখানে আমরা বসি সেখানেও আজ একটু বসতে হবে।

অশান্ত উল্কাকে কোলে নিয়ে বলল, উল্কা-মণি, যাচ্ছি। তুমি দুষ্টুমি কোরো না। নদীর ধারে যেয়ো না। ঘরে বসে খেলা কোরো, কেমন?

উল্কা তার দিকে অবাক চোখে চেয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বল্ল, আমিও বেড়াতে যাব কাকু।

না লক্ষীটি! তুমি মার কাছে যাও, মা ডাকছেন।

অশান্ত উল্কাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল, বুকটা যেন তার সত্যিই জুড়িয়ে গেল। সে উল্কাকে বলল, আমাকে একটা চুমু দাও ত মণি!

উল্কা চুমু দিল। অশান্ত আর একটা, আর একটা বলে যতগুলো চুমু চাইল উল্কা ততগুলি চুমু দিল। —অশান্তর চোখে জল এল।

মোহনকে দেখিয়ে বলল, একেও চুমু দাও।

উল্কা মোহনকেও চুমু দিল।

অশান্ত একবার বলল, দেবেনদার কাছে বিদায় নেওয়া হল না, বড় দুঃখ থেকে গেল। কিন্তু কি করব, জানতে পেলে তিনি কিছুতেই আমাদের ছাড়তেন না।

উল্কার চুমু খেয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল।...

২৩

গ্রেপ্তার হয়ে সারাদিন সুধীরকে লালবাজার গারদে আটক থাকতে হল, সমস্ত দিন তাকে কিছু খেতে দিল না, সন্ধ্যার পর মুড়ি আর চিনি দিয়ে গেল, সে তা স্পর্শও করল না। ক্ষুদ্র ঘরটির মধ্যে অবরুদ্ধ সিংহের মত সে অনবরত ঘোরা-ফেরা করতে লাগল।

দলের আদেশে অক্ষয়কে সে খুন করেছিল, কাজের জন্য অনুতাপ না হলেও অক্ষয়ের জন্য তার দুঃখ হচ্ছিল। হোক সে শত্রু, তবু এমন একটা প্রতিভা, যা তাদের বিরুদ্ধে লেগে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল, তা দেশের সেবায় নিযুক্ত হলে কত বড় কাজে আসত, —আজ পরাধীন দেশের দুর্দৈব, তাকেই তাদের হত্যা করতে হল।

ভেবে দেখলে, তাদের সঙ্গে যে ছলনা করেছিল তাতে অক্ষয়ের দোষ ছিল, না—ফাঁকি দিয়ে তাদের কর্মকেন্দ্র দেখে এসে সব কথাই সরকারের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল সেজন্য তাকে বড় অপরাধী করা যায় না। কেননা ঐ কাজই তার কর্তব্য,—আর প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলার অধিকার মানুষ-মাত্রেরই আছে। সরকারের সঙ্গে এতদিনের বিশ্বাস যে সে নষ্ট করেনি, বিপ্লবীর হাতে মৃত্যু অনিবার্য জেনেও তার কর্তব্য পালন করেছে—এখানেই ত তার মনুষ্যত্বের সত্য পরিচয়! অক্ষয়ের জন্য সুধীরের সহানুভূতি জাগছিল।

কিন্তু সেও ত অক্ষয়ের পথেরই যাত্রী! আজ না হোক কাল তাকেও ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিতে হবে! মরতে তার একটুও ভয় নেই, কারুর জন্য ভাবনাও তার ছিল না,—মৃত্যু ত তাদের খেলার সহচর! এই ত সেদিন আর দুর্জয়দাদা হাসিমুখে আলিঙ্গন করেছে!

মরতে ভয় সংসারীদের,—তাদের হাসি আছে কান্না আছে, সম্মান আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, ভালোবাসা আছে, সংসার আছে, তারাই মরণকে এড়িয়ে চলতে চায়! আর বিপ্লবীদের! মৃত্যু নিশিদিন তাদের শিয়রে জেগে পাহারা দিচ্ছে! হয়ত পরলোকে সে দুর্জয়দার সঙ্গে মিলবে, আবার তারা বাংলাদেশে জন্ম নেবে, মানুষকে, মানুষের দেশকে, স্বাধীন করবার সাধনা এইখানেই তারা করবে! কতদিনে যে মানুষের এই ব্রত উদ্‌যাপিত হবে কে জানে, আরো কতবার তাদের জন্মমৃত্যুর মোহনা ঘুরে আসতে হবে।

সুধীর সারারাত ঘুরে ঘুরে কত কি ভাবতে লাগল,— সে তার অন্তরের মধ্যে বিচিত্র সমস্যার দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। একবার তার মনে প্রশ্ন হল—হত্যা কি ভালো? যতই সে এর জবাব খুঁজছিল, হত্যার বীভৎসতা ততই তার মনের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। উত্তেজনার বশে যে এই কাজ করেছিল, এখন ঠাণ্ডা মাথায় সে কথা ভাবতেই তার সর্বাঙ্গ সিটিয়ে উঠল!

পাশের গারদে একটা পাগলের চোখেও সারারাত ঘুম ছিল না। সে মাঝে মাঝে হাউ হাউ করে কেঁদে কেঁদে উঠছিল,—কখনো কখনো অব্যক্ত স্বরে কি কথা বলে যাচ্ছিল। সুধীর কদাচ থমকে দাঁড়িয়ে তার মর্ম জানবার চেষ্টা করছিল,—এই অব্যক্ত ক্রন্দন ধ্বনির সঙ্গে তার অন্তরের কোন্ হতভাগা পাগলের যেন সুরে মিল ছিল।

সুধীরের মনে হল, তারা বিপ্লবীরা হয়ত ভুলপথে চলেছে। যে কাজ সুন্দর নয়, তা কখনো কল্যাণের কাজ—সত্যের কাজ হতে পারে না। যা প্রকাশ্যে করা চলে না তার মধ্যে নিশ্চয় সৌন্দর্যের দৈন্য আছে। হয়ত তা বিধাতার কাজ নয়।

ক্রমশ যতই রাত গভীর হতে চলল, একটি দুটি করে কনস্টেবলের খোলায় চেপে মাতালের আমদানি বেড়ে চলল,—তারা সবাই সামনের গারদে ভর্তি হল। তাদের চেঁচামেচিতে গারদঘরের দ এবং অর্ডার দুইই অত্যন্ত ক্ষুন্ন হতে লাগল।

পরদিন সুধীরকে আদালতে নিয়ে গেল, হত্যাকারী দেখবার জন্য সেদিন ভিড় কম হয়নি, কিন্তু আসামীর কাঠগড়ায় এই তরুণ সুকুমার মূর্তি দেখে সকলের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। সেখান থেকে কয়েদী-গাড়িতে আর সব চোর ডাকাতের সঙ্গে বদ্ধ করে তাকে আলিপুর জেলে নিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে তার কেবলি মনে হতে লাগল, পুলিস তার কাছ থেকে দেবেনকে-লেখা চিঠিটা নিয়ে গেছে, হয় ত তাকেও এই লাঞ্ছনা পোহাতে হবে।

জেলের ফটকের মধ্যে ঢুকে আর সব কয়েদীর সঙ্গে তাকে জোড়া জোড়া সারি বেঁধে দাঁড়াতে হল; সেখানে তাদের কয়েকবার গুনতি হল,—আদালতের নথিপত্রের সঙ্গে তাদের নামে নামে মিলিয়ে নেওয়া হল।

তারপরে কয়েদীদের তল্লাসী শুরু হল,—সকলের সামনে প্রত্যেকের বস্ত্রহরণ করে, তারা কেউ একটা বিড়ি বা একটা পয়সা দেহের কোথাও লুকিয়ে রেখেছে কিনা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। যারা এই তল্লাসীতে আপত্তি করল বা একটু বাধা দিল, জেলের ওয়ার্ডারদের হাতে তাদের লাঞ্ছনার আর সীমা রইল না।

সুধীরের তল্লাসীর আগেই সে সহকারী জেলারকে দিয়ে জানাল যে সে রাজনৈতিক কয়েদী, আর ভদ্রঘরের ছেলে, এই ভাবে তল্লাসীতে সে অভ্যস্ত নয়। জেলার তাঁর মুখ দেখে দয়া করলেন, তাকে আর সম্পূর্ণ নগ্ন হতে হলনা। যে প্রাণ দিতে যাচ্ছে সে যে এই তুচ্ছ লজ্জাটুকু ছাড়তে পারছে না এই কথা ভেবে জেলার ও সুধীর, দুজনেরই মনে মনে হাসি পেল।

তারপরে সুধীরকে বিখ্যাত ৪৪ডিগ্রীর একটা সেলে নিয়ে বদ্ধ করে রাখল। ছোট্ট একটুখানি ঘর, তার মধ্যেই মলমূত্রের ব্যবস্থা,—কম্বলের শয্যায় শুয়ে সুধীর ভাবতে লাগল, বিপ্লব-গুরু বারীন্দ্র-উপেন্দ্রদের পাদস্পর্শে এই কুঠরী পুণ্য তীর্থে পরিণত হয়েছে! সে মাথা ঠেকিয়ে দ্বীপান্তরের পরপারে তাদের উদ্দেশে প্রণাম জানাল।

সকালে উঠে তার সব আগে চোখে পড়ল মাটিতে খোদা রয়েছে কোন্ অজানা বিপ্লবী কবির রচনা দুছত্র কবিতা—

"এইরূপে যেন শত শত দাস,
আজীবন করে হেন কারাবাস।"

বারবার সেই দুটি ছত্র আবৃত্তি করে পড়ছে, এমন সময় প্রাতঃভোজনের তলব এল। ফ্যান-ভাতের একটা দুঃখাদ্য সংস্করণ—সেই লপসী, দুদিন অনাহারের পরে, যতটা পারল তাকে খেতে হল।

সেদিন যখন সে আবার আদালতে গেল, তখন দেখতে পেল অনেক বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার স্বেচ্ছায় তার পক্ষ সমর্থনের জন্য দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু সে স্থির করেছিল যে আপনাকে আহুতি দিয়ে বাঙালী যুবকদের সাধনার জন্য তার কর্মপন্থার একটা জ্বলন্ত আদর্শ রেখে যাবে। সে যে হত্যা করেছে এ অস্বীকার করে ফল নেই, কেননা এ অপ্রমাণ করা চলবে না—কেবল এই নিয়ে মিথ্যা উকিলি তর্ক বাড়িয়ে তার আদর্শকে খাটো করে তার দলের বা দেশের কোন লাভ হবে না। সে তো দেশের মুক্তির জন্য বিশেষ

কিছু করে উঠতে পারল না, এখন যদি এই বীরত্বের আদর্শটা শুধু রেখে যেতে পারে তাই হবে দেশবাসীর কাছে তার সব চেয়ে বড় দান।

মামলা লড়লে, অপরাধ অস্বীকার করলে, হয়ত প্রাণদণ্ড না হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড বা দ্বীপান্তর নিশ্চয় হবে,—জেলের দেয়ালের মধ্যে তিলে তিলে মরার চেয়ে ফাঁসিকাঠে মরা তার পক্ষে অনেক সহজ। আর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এই প্রাণ বাঁচিয়ে রাখলে প্রাণ ত বাঁচবেই না, তার ওপরে আদর্শও মারা যাবে। কাজেই উকিল ব্যারিস্টাররা তাকে যা করবার পরামর্শ দিলেন, সে তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে সবিনয়ে বলল, ঐ উপদেশ গ্রহণ করবার তার শক্তি নেই।

সে কোর্টে দাঁড়িয়ে অপরাধ স্বীকার করে এক অনতিদীর্ঘ জবানবন্দী দিল, তার ছত্রে ছত্রে তার গভীর দেশপ্রীতি, নির্ভীকতা, আত্মত্যাগের আদর্শ, আগুনের অক্ষরে ফুটে উঠেছিল। শ্রোতারা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, সহানুভূতিতে অনেকের চোখেই জল এল,—উকিল ব্যারিস্টাররা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। এর ফলে বিচারকের রায় অনিবার্যরূপে কি দাঁড়াবে তা অনুমান করা কারুপক্ষেই কঠিন হল না।

সেদিন জেলে ফিরে গেলে সকলেই তাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতে লাগল, একজন কর্মচারী জিজ্ঞেস করলেন তার এমন কোন ইচ্ছা আছে কি না যা তারা পূর্ণ করতে পারে। সুধীরের মন তখন সম্পূর্ণ শান্তিতে ভরা, সে বলল, ধন্যবাদ, আর কোনো ইচ্ছাই আমার নেই।

৪৪ ডিগ্রির পথে একটি ফুলের গাছ আছে, ডিগ্রীর মুখে ঢুকতে রোজই তার লোভ হত গাছটিকে একটু স্পর্শ করে, কিন্তু রোজই সেই ইচ্ছা দমন করত। আজ সে সেই গাছটির কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে নিল, তার কচি ডালের পাতাগুলি নিজের মুখের ওপর বুলোতে লাগল—যেন এই ছিল তার জেলের পরমবন্ধু। এই গাছটির মতই সে উদ্ধত মুক্তির দাবি নিয়ে এসেছিল, তাই আজ তাকে প্রাণের দেনা চুকিয়ে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হচ্ছে।

২৪

অশান্ত ও মোহনের পলায়নের পর কয়েকদিন কেটে গেছে, এই নিয়ে সারা শহর জুড়ে একটা মুখরোচক আলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে সতীশের কুড়ি মাইল দূরের কীর্তিকথা প্রকাশ হয়ে পড়ায় সকলের বিপুল বিস্ময়ের ধাক্কার মধ্যে এই অত্যন্ত মজার আলোচনাটা হঠাৎ চাপা পড়ে গেল। সতীশের এই অদ্ভুত হঠকারিতার খবরই তখন লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

ক্ষতিগ্রস্ত জমিদার নিজে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এসে এসম্বন্ধে কত কি অভিযোগ করেছেন, তাঁদের কথাবার্তা গোপনে হয়ে থাকলেও শহরের গুজবের মুখে তা প্রকাশ হতে বাকি ছিল না। সতীশের অদৃষ্টে কি ঘটবে তাই নিয়ে ভবিষ্যদবাণীর অন্ত ছিল না, অবশেষে অনেকের মতেই সাব্যস্ত হল, নিতান্ত ফাঁসি না হলেও, দ্বীপান্তর বাসের মত ছোটোখাটো কিছু নিশ্চয়ই তার বরাতে আছে।

সতীশ সেদিন দেবেনের বাসায় এসেছিল, তাদের মধ্যেও এই নিয়েই কথা হচ্ছিল। দেবেন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলছিল, জমিদার কচু করবে! দু-দশ হাজার লোকের বিরুদ্ধে

জমিদারই যে জিতবে তার কি ঠিক? প্রজাদেরও ত প্রাণের দাবি আছে? আর তোমার নিজের কোনই ভয় নেই, তোমার চুলও তারা স্পর্শ করতে পারবে না।

সতীশ বলল, তুমি যা বলচ আমিও তা ভেবে দেখেছি। তবে আমার তারা যা করবে আমি এঁচে নিয়েছি, বড় জোড় আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। সেজন্যেও আমি বড় ভাবিনা। মানুষের সেবার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্যই পড়াশুনা যা কিছু,—যখন সেই সেবার ডাক আমার কাছে এসে পৌঁছেচে, তখনই আমি স্থির করে রেখেছি যে পড়াশুনা ছেড়ে সেই ডাকেই সাড়া দেব। তবে দুদিন পরে দিতাম, না হয় আজই দিলাম।

স্কুল ছেড়ে তুমি কি করবে ভেবেচ?

মনে আমার অনেক কল্পনা আছে, আপাতত তার একটার কাজে আমি হাত দেব। জার্মানীর Wander-vogel দলের কথা বইয়ে পড়েচি, আমাদের জেলায় সেই রকম একটা দল গড়ে তুলব। লক্ষীছাড়া ছেলের অভাব তো নেই, দেখবে আমার দলে এসে তারা সমাজের কত বড় কাজে আসে। জার্মানীর সঙ্গে আমাদের উড়োপাখী দলের তফাৎ এই যে, কেবল ফুর্ত্তি করা ওদের আদর্শ, আর ফুর্ত্তির সঙ্গে কাজ করাই হবে আমাদের উদ্দেশ্য।

তা তো যেন হল, কিন্তু কি কাজ করবে তোমরা?

দল বেঁধে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াব, ম্যাজিক লণ্ঠন দেখিয়ে অজ্ঞতা ও অস্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশের লোককে সচেতন করে, যতটা পারি দৈন্যের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব। দেশের যুবকদের মধ্যে যৌবনের আন্দোলন জাগাব। এই ত এখন স্থির, তারপরে কাজ করতে করতেই কত জন ছেড়ে যাবে, কত জন জুটে যাবে—তার হিসাব এখন দিই কি করে?

কিন্তু তোমাদের এই দলবলের খরচ চলবে কিসে?

লোকের সত্যিকার সেবা করতে পারলে কেবল সহানুভূতি নয় তাদের সাহায্যও নেহাৎ দুর্লভ হবে না। দেশের লোকের প্রতি আমার সে বিশ্বাস আছে। তাদের ভালোবাসলেই তারা জানতে পায়, ফাঁকি দিলেও ঠিক ধরতে পারে। আমরা যদি তাদের যথার্থ মঙ্গল চাই তাহলে অর্থের অভাবে কোনদিনই আমাদের কাজ বন্ধ হবে না। তারা কি আমাদের ভালোবাসেনা তুমি বলতে চাও?

তুমি খাটতে পার, কিন্তু তোমার দলের ছেলেরা কতদিন এই ভূতের বেগার খাটবে?

আনন্দের আকর্ষণে তারা খাটবে। এই যে উড়োপাখীর মত ভবঘুরের জীবন এর সুখ কি কম? রোজই অ্যাড্‌ভেঞ্চার, রোজই পিকনিক। স্ফূর্তির সঙ্গে কাজ করলে কাজের স্ফূর্তি আপনিই হয়।

এই সব কথা হচ্চে এমন সময়ে স্কুলের পিয়ন ঘরে ঢুকল, সতীশকে বলল, আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি। বোর্ডিংএ না পেয়ে, একটা ছেলের কাছে শুনে এই খানে এলাম। এই নিন, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু আপনাকে দিতে বলেচেন।

সতীশ কাগজখানা হাতে নিল, সেখানা হেডমাস্টারের নোটিশ। তার সংক্ষিপ্ত মর্ম, কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছানুসারে তাঁকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাতে হচ্চে যে স্কুলের খাতা থেকে সতীশের নাম কেটে দেওয়া হয়েচে; সে যেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বোর্ডিং ছেড়ে চলে যায়।

সতীশ হেসে নোটিশখানা দেবেনের হাতে দিল—এই দেখ। আমরা যা ভাবছিলুম

তাই হয়েছে।—একটুকরা কাগজে, সে যে রাজি আছে এইটুকু লিখে পিয়নের হাতে দিয়ে বলল, হেডমাস্টার আর অবিনাশবাবুকে দিয়ো। পিয়ন চলে গেল।

নোটিশখানা পড়ে দেবেন বলল, আমার ভরসা ছিল হেডমাস্টার তোমার পক্ষ সমর্থন করবেন।

সতীশ বলল, তাঁর এসব বিষয়ে কোনই হাত নেই। ছেলেদের প্রতি তাঁর স্নেহ কোনোদিন কম নয় আমি তা ভালোমত জানি। তাঁর শক্তি নেই, তিনি কি করবেন ?

দেবেন কহিল, যাক গে সে কথা। স্কুল কলেজে না পড়লেই যে শিক্ষা হয় না, একথা আমি মানিনে। কিন্তু আমি একটা কথা বলি, তুমি ভেবে দেখ,—গাঁয়ে গাঁয়ে অমন টো টো করে না ঘুরে, তুমি কেন আমাদের দলে এসো না ?

তোমার দলে ? মানে, বিপ্লবীদের দলে ?

হ্যাঁ, আমি সেই কথাই বলচি। দাঁড়াও, আমি সদর দোরটা বন্ধ করে আসি, কেউ হঠাৎ এসে পড়ে।

দেবেন ক্ষণপরে ফিরে এলে, সতীশ তার দিকে চেয়ে হেসে বললে, যে কথা গোপনে বলতে হয়, যে কাজ লুকিয়ে করতে হয়, তার মধ্যে অন্তরের সত্য নেই, এ তুমি জেনো। সে কাজ করবার শক্তি, সিদ্ধি, আনন্দ জুটবে কোথা থেকে ?

দরজার খিল এঁটে এলাম বলে বলচ ? বিপ্লব যেদিন আত্মপ্রকাশ করে সেদিন তার রুদ্র মূর্তি লুকোন থাকে না, কিন্তু তার সাধনা তো গোপনেই করতে হয়।

কে বললে ? বিপ্লব যদি সত্য হয়, মঙ্গল হয়, তবে প্রকাশ্যেই তাকে ঘোষণা করতে হবে, তার মধ্যে লুকোবার ঢাকবার কিছু থাকবেনা—যদি থাকে তবে তেমন বিপ্লবে কোনোদিন মানুষের স্বাধীনতা আসবেনা। আমার মনে হয় শুধু সাধনায় এদেশের মুক্তি নেই।

তবে মুক্তি হবে কিসে শুনি ?

গোড়ায় রোগের কারণ কি ছিল কে জানে, কিন্তু এখন আমাদের যে রোগ দাঁড়িয়েচে তা হচ্ছে জাতির বিপুল দৈন্য। দারিদ্র্যই আমাদের সমস্ত গুণ ঢেকে রেখেচে, সমস্ত শক্তি ক্ষুণ্ন করচে, জাতীয় ধর্ম সঙ্কুচিত করেচে। দৈন্য কত দিকে! অর্থের দৈন্য, সামর্থ্যের দৈন্য, দেহের দৈন্য, মনের দৈন্য, প্রাণের দৈন্য, আত্মার দৈন্য—দেশজোড়া এই বিরাট দৈন্যের সমস্যা সব আগে সমাধান করতে হবে, তবেই মুক্তিপথের যাত্রী-দল "হাজির হাজির" বলে ছুটে আসবে।

কিন্তু এও ত অস্বীকার করতে পার না যে এই বিবিধ দৈন্য একটি রোগের বিভিন্ন উপসর্গমাত্র,—আসল রোগ হচ্ছে পরাধীনতা। আমরা সেই গোড়াতেই হাত দিয়েচি;—দেশ স্বাধীন হলেই এই দৈন্যের সমস্যা মিটতে পারে, নইলে নয়।

কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেই জাতি স্বাধীন হবে না এটা তুমি ঠিক জেন। দেশের এই অধীনতা আজকের নয় ও কেবল ইংরেজের নয়;—বহুদিন থেকে আমরা পরাধীন বহু জনের কাছে। এই পরাধীনতার শিকড় অন্তর থেকে উপড়ে ফেলতে হবে,—বিদেশীদের তাড়াতে পারলেই আমরা স্বাধীন স্বচ্ছন্দে স্বতন্ত্র হয়ে উঠব না। নিশ্চয়!

তার মানে ? তোমার বক্তব্য আমি বুঝে উঠতে পারচিনে। তুমি বলতে চাও কি ?

আমি বলতে চাই, জাতির অধীনতা কেবল ইংরেজের কাছে নয়, জাতির এই শোচনীয় দীন অবস্থার কারণ আমাদেরই জমিদার, আমাদের মহাজন, আমাদেরই সমাজপতি ব্রাহ্মণ।

বেশি করে এদের অধীনতাই আমাদের মর্মে মর্মে পীড়িত পঙ্গু শঙ্কাহত করে রেখেছে। যদি সত্যিই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হয় তবে স্বদেশী দড়াদড়ি বিদেশী চেনের সঙ্গেই বিসর্জন দিতে হবে।

অর্থাৎ তুমি চাচ্ছ সমাজবিপ্লব। আমি বুঝেছি।

বিপ্লবের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এমন বিশেষ বিশেষ কোনো রূপ নেই। মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের অভিযানই হচ্ছে বিপ্লব,—রাষ্ট্র, সমাজে, ঘরে, বাইরে, ধর্মে, কর্মে, শিক্ষায়, সভ্যতায় যেখানেই মিথ্যা মেকি ছেয়ে আছে—বিপ্লবের আগুন তার যে কোণে জ্বলে উঠুক না কেন সব কোণের জঞ্জাল সে সাফ করে মুক্ত করবে।

আগুন ধরে গেলে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে দেরি লাগে না তা জানি, কিন্তু এই আগুন ধরাতেই যে কষ্ট।

সেই সাধনা করতে হবে। জাতির মুক্তি কত বড় ধন, সে ত কম দামে বা ফাঁকি দিয়ে মিলবে না। গুপ্তহত্যা, দাঙ্গাহাঙ্গামা এমন কি তোমার ওই গরিলা-যুদ্ধেও কিছু হবে না,—অন্য দেশের ইতিহাস যে সাক্ষ্যই দিক, অন্তত এদেশের মুক্তি, এ জাতির কল্যাণ ও পথে নয়। সত্য যদি লক্ষ্য হয় তবে উপায়ও করতে হবে বৈধ। প্রাণ দান করলেই এই মুক্তি পাওয়া যাবে না, এর জন্য জীবন দান করতে হবে—সারাজীবন ধরে প্রতিদিনের কথায়, কাজে, চিন্তায় এই মুক্তির সাধনা চলবে। প্রতিদিন ধরে!

কিন্তু এই মুক্তির সাধনা করবে কারা? সে ত এই ছেলের দল?

ছেলের দলই অবশ্য পথ দেখাবে, সব দেশে সব কাজেই তারা অগ্রদূত। কিন্তু বিপ্লব দিয়ে মুক্তি অর্জন করতে হলে সমগ্র জাতিকেই বিপ্লবে যোগ দিতে হবে। সমস্ত মিথ্যার সঙ্গে সমস্ত সত্যের সংঘর্ষ বাধবে। ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অব্রাহ্মণের, উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণীর, পুরুষের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে নারীর, জমিদারের বিরুদ্ধে চাষীর, মহাজনের বিরুদ্ধে মজুরের বৈধপথে নিজের সত্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়তে হবে। মিথ্যাকে অমান্য মিথ্যাকে অস্বীকার করলেই মিথ্যা আলোর স্পর্শে অন্ধকারের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায়। সকলের মুক্তির জন্য প্রত্যেকে, এবং প্রত্যেকের মুক্তির জন্য সকলে প্রাণপণ করবে। তারপরেই সত্য জাতি বিশ্বের কল্যাণে, বিচিত্র সৌন্দর্যের বিপুল মহিমায় নবীন জন্ম নেবে। তার আগে নয়।

এই সময়ে সদর দরজায় প্রবল করাঘাত শোনা গেল, দেবেন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বললে, সর্বনাশ! চারিধার পুলিশে ঘিরে ফেলেছে, বোধহয় বাড়ি খানাতল্লাস করবে!

তাই নাকি? তবে ত তোমার ভারি বিপদ!

বিপদ কিসের! আমি দরজা খুলে ওদের কিছু সময় আটকে রাখবার চেষ্টা করব। তুমি ততক্ষণে এদিকে এই কাগজপত্রগুলো পুড়িয়ে শেষ করে দাও।

এসব ত দরকারি কাগজ? একেবারে পুড়িয়ে ফেলব?

সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা এই চিঠিগুলো আগে পুড়োও। আর এই পুঁথিগুলো,—আগুনেই এদের জন্ম, এদের ভেতরেও আগুন, আগুনেই এদের সমাপ্তি হোক। উপায় কি?

আচ্ছা আমি পুড়োচ্ছি। তুমি যাও।

দেবেন বাইরে গিয়ে দেখল দলবল নিয়ে পুলিশসাহেব নিজে বাড়ি তল্লাস করতে

এসেছেন। সে যেতেই সাহেব সার্চওয়ারেন্ট দেখালেন, গ্রেপ্তারের হুকুম নেই দেখে দেবেন একটু আশ্বস্ত হল।

সাহেব বললেন, আমি এখুনি তোমার বাড়ি সার্চ করতে চাই।

দেবেন বলল, তার আগে আমি আপনাকে সার্চ করে দেখব, কে জানে আপনি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়ে আমার বাড়ির মধ্যে রেখে দেবেন না?

সাহেব বললেন, বেশ, যাতে তোমার সন্তোষ হয় সেই ভাবে তুমি আমায় সার্চ করতে পারো, আমি রাজি আছি।

দেবেন সাহেবের পকেটগুলো খুঁজে দেখল, প্যান্টের পকেটও দেখল, তারপরে সাহেবের জামার হাতার ভেতর থেকে হঠাৎ একখানা বিপ্লবের পুঁথি বের করল,—এটা কি?

বিপ্লবের পুঁথিখানা নিশ্চয়ই জামার হাতার মধ্যে ছিল না, তবু ম্যাজিকের মত সেখান থেকেই বেরুতে দেখে সাহেব এবং আর সবাই নিতান্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সাহেব আমতা আমতা করে বল্লেন, আমি ত জানিনা। ওটা কোথা থেকে এল?

ভগবান জানেন। কিন্তু এর পর কিছুতেই আমি আপনাকে আমার বাড়ি তল্লাস করতে দিতে পারি না। আপনি অনুগ্রহ করে চলে যান। ...হাঁ, এই পুঁথিখানাও নিয়ে যান।

সাহেবের সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি নীরবে সাইকেলে উঠে চলে গেলেন, তাঁর দলবল তাঁর পিছনে পিছনে গেল। দেবেন হাসিমুখে ভেতরে ফিরে দেখে ইতিমধ্যে সতীশ পত্র-যুগ্ম সমাধা করে বসে আছে। সতীশ জিজ্ঞেস করল, কি খবর? ওঁরা আসছেন নাকি?

ওদের ভাগিয়ে দিয়েচি। আর তিনদিনের মধ্যে এবাড়ি সার্চ করবার নাম করবে না। ওটা কি কাগজ!

একটা প্রেমের কবিতা। তুমি সুধীরকে উৎসর্গ করেচ দেখে রেখে দিয়েচি।

কই দেখি! তুমি যে এটা আগুনে দাওনি এজন্য তোমাকে শত শত ধন্যবাদ!

হাতের লেখাটা কাঁচা দেখছি, এটা তোমার কতদিনের রচনা?

এই আমার জীবনের প্রথম কবিতা। সুধীরকে ভালবেসেই আমি কবি হই, অবশ্য বেশি কবিতা আমি লিখিনি। এটি আমার অতি কিশোর কালের রচনা। মনে পড়ে এই কবিতাটি লিখে সুধীরের হাতে দেবার জন্য স্কুলের পথে ঝাউবনের ধারে কতক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করেছিলাম। সে যখন এল তখন কত ভয়ে ভয়ে তার কাছে গিয়ে প্রেমের এই প্রথম উপহারখানা তার হাতে গুঁজে দিলাম। তার সমস্ত মুখ রাঙা হয়ে উঠল, আমার বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল,—এখনো বুকের সেই স্পন্দন যেন অনুভব করতে পারি।

এটি বুঝি সেই কবিতারই নকল? তাই বুঝি এতদিনেও এটি কাছছাড়া করতে পারোনি। নাও, এখন এটিকে মাদুলি গড়িয়ে বুকে ঝুলিয়ে রাখো। হৃদরোগের অব্যর্থ ঔষধ!

তা না হয় রাখচি। কিন্তু তুমি কি কালই বোর্ডিং ছেড়ে দেবে?

হাঁ, কাল সকালেই।.....

কোথায় যাবে?

কোথায় যাব, কে বলতে পারে?

যদি আর কোথাও না যাও এবং তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমার দ্বার তোমার জন্যে উন্মুক্ত রইল, আমি নিমন্ত্রণ করে রাখছি।

আচ্ছা, সে হবে এখন।

২৫

বাঙালীর স্বপ্ন, বাঙালীর স্মৃতি, বাঙালীর গল্প, বাঙালীর গীতি, বাঙালীর সৌন্দর্য, বাঙালীর প্রীতির কাল হচ্ছে তার ছেলে বয়স। নিশ্চিন্ত, নির্মুক্ত, নির্বোধ জীবন হচ্ছে বাঙালীর এই কৈশোর। বাঙালীর যৌবনে কোন রোমান্স নেই,—তা' শুধু বেদনা, বোঝা আর ব্যর্থতায় পুঞ্জীভূত। যৌবনে বাঙালী ভালোবাসতে পারে না, প্রাণ খুলে হাসতে পারে না, দারিদ্র-দুর্ভাবনার জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট নীরস কেরানীগিরির নিরীহ জীবনটাকেই প্রতিদিন কোনোমতে টেনে নিয়ে চলে। বাঙালী সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখে, সাহিত্যের সাধনা করে, সমাজের সেবায় লাগে, আদর্শের উপাসনা করে, আত্মহারা হয়ে ভালোবাসে তার তরুণ বয়সে।...

সতীশকে তাদের জন্যই স্কুল ছেড়ে দিতে হচ্ছে এ খবর বাইশ গ্রামের দশ হাজার প্রজার কাছে পৌঁছাতে বেশি দেরি হল না। সতীশ তার জিনিসপত্র আগের দিনই দেবেনের বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছিল, পরদিন সকালে বোর্ডিংএর চারিধার তার চাষী বন্ধুতে ভরে গেছে। ব্যাপার কি, জানবার আগেই গ্রামের মোড়লরা এসে তার গলায় ফুলের মালা দুলিয়ে দিল। চারিদিকে অমনি জয়ধ্বনি উঠল।

আগের দিন রাত থাকতেই বাইশ গ্রামের সব চাষী সতীশের জন্য অভিযান করে বেরিয়েছিল,—সূর্যোদয়ের পরে লোকের ভিড়ে শহরের পথ ঘাট বোঝাই হয়ে গেল। যেদিকে চোখ পড়ে সেই দিকেই চাষীর দল! চারিদিকে যেন মহোৎসব লেগে গেছে! প্রজারা যেন তাদের কোন রাজাকে অভিনন্দন দিয়ে সম্বর্ধনা করতে এসেছে।

একদল চাষী সতীশকে কাঁধে বসিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে বেড়াতে লাগল! কর্তারা যাকে লাঞ্ছিত করেছে তাদের সেই তরুণ নেতাকে তারা যুবরাজের সম্মান দিয়ে বরণ করে নিল। শহরসুদ্ধ লোক বিস্ময়ে থ হয়ে এই অবাক কাণ্ড দেখতে লাগল।

দেখতে পেল না কেবল দেবেন। অতি ভোরে পুলিস তার বাড়িতে গিয়ে অন্তরীণের পরোয়ানা দেখিয়ে গ্রেপ্তার করে,—পুলিস কনস্টেবল দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেই সকালে স্টেশনের ওয়েটিংরুমে সে গাড়ির প্রতীক্ষা করছিল।

গাড়ি আসতেই সে প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে বসল, তার সঙ্গে পাহারাওয়ালারাও উঠতে বাধ্য হল। সমস্ত গাড়িতে একটিমাত্র প্রথম শ্রেণী,—তাতে একজন সাহেব আরোহী। তিনি আবার কোনো জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, ছুটি নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিলেন, দেবেনের এই হঠকারিতায় তিনি অত্যন্ত আপত্তি করলেন। দেবেন তাঁর কথায় কান না দিয়ে সেদিনের খবরের কাগজ পড়ায় মন দিল। সাহেব তখন গিয়ে স্টেশন মাস্টারকে জানালেন, তিনি এসে দেবেনকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই গাড়িতে কেন? কই দেখি আপনার টিকিট।

দেবেন কোন কথা না বলে ইন্টার্নমেন্টের অর্ডারখানা দেখাল। বাংলা গভর্নমেন্টের হুকুম! সসম্ভ্রমে পরওয়ানাখানা ফিরিয়ে দিয়ে স্টেশনমাস্টার সাহেবকে বল্লেন, উনি স্বেচ্ছায় না নামলে ওঁকে বাধা করবার এক্তিয়ার আমার নেই। আপনি অন্য গাড়িতে চলুন, রেল-কর্তৃপক্ষের কাছে আপনি অতিরিক্ত ভাড়াটা ফেরৎ পাবেন।

সাহেব অগত্যা দুর্জনকে দূরে পরিহার করে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় আশ্রয় নিলেন। দেবেন পুনরায় খবর কাগজে মনোনিবেশ করল,—সে জানতেও পেল না তার সুধীর সেই মুহূর্তেই কারাগারে ফাঁসিকাঠে, তরুণ বয়সের মাঝখানে একটা দাঁড়ি টেনে দিল।...

মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি

ভূমিকা

মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি—বইটি অনেকদিন থেকে বাজারে মিলছিল না। অবশেষে ক্যালকাটা ক্লাবের মহিমায় নতুনরূপে এই সুলভ সংস্করণ হয়ে বেরুলো। এর লেখাগুলি দু'যুগ আগেকার—লেখকের তখন প্রথম যৌবন—তারুণ্যের সহজাত স্পর্দ্ধা এর পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে, তার কোনো কৈফিয়ৎ দেবার দরকার করে না। তরুণরা এই স্পর্দ্ধা যে কোত্থেকে পায় সে এক রহস্য! আরো বিস্ময়ের এই যে সেই স্পর্দ্ধায় উত্তরোত্তর কালের তরুণদের সহজ উত্তরাধিকার দেখা যায়, যে স্পর্দ্ধায় তৎকালীন তাবৎ প্রশ্নের নিজের মত করে উত্তর দেবার অধিকার তারা পেয়েছে বলে মনে করে। তারপর অনেক ভূয়োদর্শনের পরে— উত্তরকালে যখন নিরুত্তর থাকার দিন আসে তখন প্রথম বয়সের এই হঠকারিতাকে পরমাশ্চর্যের মতই মনে হয়।

রচনাগুলি প্রথমে বই হয়ে বেরোয়—'আজ এবং আগামী কাল'—এই নামে—১৯২৯ সালে। বলা বাহুল্য এসব লেখা আরো ঢের আগেকার। 'নবশক্তি' ইত্যাদি কাগজের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিলো, তাদের কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সাহিত্যিক ও সামাজিক—দু' ভাগ করে একাধারে আনা হয়। কিন্তু প্রথম সংস্করণের সময় অনেক লেখার খোঁজ মেলেনি বলে বাধ্য হয়েই সেগুলি বাদ দিতে হয়েছিল। পরের সংস্করণের প্রকাশক শ্রীমহাদেব সরকার অনেক কষ্ট করে পুরনো কাগজের কীটদষ্ট পাতা থেকে সেগুলির পঙ্কোদ্ধার করেন—তাঁরই চেষ্টা যত্নে পরিবর্দ্ধিতরূপে 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' নামে বইটি বেরোয়। তাঁর এ-ঋণ আমি কোনোদিন শুধতে পারবো বলে মনে হয় না। মার্জিতরুচির উচ্চমনা প্রকাশক আরো আছেন আমি জানি, বৈদগ্ধ্য ও কৃতবিদ্যতায় তাঁর চেয়ে হয়তো কম নন। কিন্তু মহাদেবের ব্যবহার, এককথায় দেবতুল্য। এই শুধু বলতে পারি, প্রকাশকের কাছ থেকে অতটা অন্তরঙ্গতা আর সৌহার্দ্দ আমি খুব কমই পেয়েছি। এই হেতু শুধু সেই ঋণের কথাই নয়, তাঁর নামটিও আমার বইয়ের সঙ্গে আমি যুক্ত রাখতে চাই। এই সূত্রে, তাঁর সংকলিত সংস্করণের গোড়ায় যে চমৎকার ভূমিকাটি তিনি লিখেছিলেন, সেটি পুরোপুরিই এখানে উদ্ধৃত করলুম—

"বহু বিপত্তির মধ্যে পাঠকসমাজের নিকট 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' উপস্থিত করা গেল। লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর অভিনব প্রবন্ধ-সংকলন 'আজ এবং আগামীকাল' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে এবং অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে তৎকালে প্রগতিবাদী কর্মী ও ভাবুকসমাজ 'আজ এবং আগামী কাল'-এর রচনায় নিজেদের ভাষা খুঁজে পেয়েছিল ; সুধী পাঠকবর্গ সেই বহুসমাদৃত রচনাবলীর পুনর্মুদ্রণে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ; বর্তমান 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' নামান্তরে সেই 'আজ এবং আগামী কাল' গ্রন্থেরই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ।

শিবরামবাবু নিজেকে পণ্ডিত ভাবেন না, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে তাই 'পণ্ডিতিয়ানা' কোথাও দেখান নি ; সহজ সংশ্লেষণবুদ্ধি তাঁর বৃত্তিগত—সাবলীল রচনায় তাঁর সূক্ষ্ম মননশক্তি ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে, ভঙ্গিতে মনোজ্ঞ করেছে।

'আজ এবং আগামী কাল'-এর পরবর্তী রচনাগুলি অধিকাংশই সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখের সহিত উত্তর-প্রত্যুত্তর ছলে লিখিত এবং 'নবশক্তি' ও দু'-একটি পত্রিকায় প্রকাশিত

হয়। বর্তমান সংকলনে 'সাধারণ মানুষ ও সুপারম্যান'— 'সুপারম্যানিয়া'— 'কবি-জয়ন্তী'— 'সঙ্ঘ মানে সাংঘাতিক'— 'বিজ্ঞানের সার্থকতা'— 'হরিজন আন্দোলনের নবদর্শন'—এই রচনা কয়টি নূতন সন্নিবিষ্ট হল। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি 'আজ এবং আগামী কাল' থেকে সংগৃহীত।

আশা করি, উৎসাহী পাঠকসমাজ 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' উপযুক্ত সমাদর লাভে সমর্থ হবে।"

এখানে উল্লেখ থাকে যে, 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'-এর সাহিত্য-সম্পর্কিত নিবন্ধগুলি আলাদা বই হয়ে বেরুবে বলে এই সংস্করণ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

এই লেখাগুলি যখনকার, তখন কমিউনিজমের নামগন্ধও এদেশে ছিল না, (কিছু নামগন্ধই খালি ছিল) ; মার্কসীয় সাহিত্যেরও আমদানী হয়নি। এই নামমাত্র কমিউনিজম সম্বল করে, ঐ-তত্ত্বে ওয়াকিবহাল না হয়েও যে আমি কলম ধরতে পেরেছিলাম তার কারণ সাম্যবাদ আসলে এদেশেরই চারা—বিদেশের কলম নয়। বিদেশে কমিউনিজমের বাস্তব চেহারা যাই কেন হোক না, তার আদর্শবাদী যে রূপ তা ভারতীয় মনেরই অনুরূপ। সাম্যের মূল ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত, তার অন্তর-গতি আমাদের মনের ফল্গুধারায়। সমস্ত মানুষের সমত্ব আর মানুষের প্রতি মমত্ব—এই বোধের সৃষ্টি এখানে এতই সহজ যে, এর জন্য মার্কসীয় অপেক্ষা রাখে না। উপনিষদে উপ্ত, আর বুদ্ধদেবে অঙ্কুরিত হয়ে গান্ধীজীতে এসে তা শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হয়েছে। গান্ধীবাদই, আমার মনে হয়, কমিউনিজমকে সম্পূর্ণ করতে পারে। একদিন তা করবেও। ভারতীয় আত্মিকসাম্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের আর্থিক রাষ্ট্রনৈতিক আত্মীয়তা ঘটলেই বিশ্বজনীন সাম্যবাদের সাফল্য ঘটতে পারে, আর স্থিতিও তাই।

আমার এই লেখাগুলির মূলকথাও ছিলো ঐ। এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ—'আজ এবং আগামী কাল'-এর গোড়ায় যা আমি বলেছিলাম—সেই ভূমিকাটিই এখানে হুবহু তুলে দেয়া হোলো :

"স্বাধীনতা আজ দূরে, তাই দূর থেকে তাকে আজ লক্ষ্যের (goal) মধ্যে দেখায় বটে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করলে দেখতে পাবো সেইখানেই আমাদের পথ ফুরোয় নি। তখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন করাই হবে লক্ষ্য। কিন্তু সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের পথ যেখানে শেষ হয়েচে, সেইখানেই আমাদের গতি-সমাপ্তি নয়, তারপরেও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

"রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের প্রভেদ আছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে রাশিয়া তার কর্মসাধনার ফলে সর্বমানবের যে কল্যাণ আহরণ করছে তার থেকে আমাদের বঞ্চিত রাখতে হবে। রাশিয়া প্রত্যেক মানুষ-মুখে রুটি দেবার ব্যবস্থা করেচে ; কিন্তু যেহেতু রুটি দেওয়াটা অতি তুচ্ছ কাজ, তার চেয়ে অমৃত দেওয়া ঢের বড়ো, সেই জন্য রাশিয়ার আর্থনীতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভারতের আভিজাতিক আত্মসম্মানে ঘা লাগবে, একথা মানতে পারিনে। প্রত্যেক মানুষকে যদি অমৃতের সন্ধান দিতে পারি, সে তো ভালোই, কিন্তু আগে তাকে রুটির সন্ধান দিয়ে তার পরে।

"ভারতের বৈশিষ্ট্য আছে, ঐশ্বর্য আছে—ভারতেরও মানুষকে দেবার নিজস্ব-কিছু আছে, একথাও অস্বীকার করবো না। ভারতকে অমৃতের সন্ধানই দিতে হবে। এবং এই জন্যই, জগতের সভ্যতার রাশিয়ার কাজ যেখানে শেষ হয়েচে, একমাত্র সেখানেই

ভারতের কাজ সুরু হতে পারে। রাশিয়া মানুষকে ভাণ্ড যোগালেই ভারত সেই ভাণ্ডে অমৃতরস বিতরণ করতে পারে। এই জন্যই সমাজতন্ত্রের পথকে এড়িয়ে গেলে আমাদের চলবে না, সে পথ আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে।”

অবশেষে একটি কথা। কথাটি বিশ্বভারতীকে নিয়ে। এই প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে 'কবিজয়ন্তী'তে একটি অপবাচক বাক্য ছিলো (এখনো আছে); লাইনটি এবারে আমি তুলে দিতে পারতাম কিন্তু ইচ্ছে করেই দিইনি। সে-যুগের এক লেখকের উদ্ধত রূপের উদাহরণস্বরূপ রেখে দিয়েছি। কিন্তু একথা আমি এখানে বলতে চাই যে, বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রনাথের অপকর্ম বলে এখন আমি মনে করিনে। মনে করি, এটা তাঁর অপত্যকর্ম। জাতির পিতৃজনোচিত তাঁর বিপুল সৃজনীশক্তির পরাকাষ্ঠা ঠিক এ না হলেও তাঁর বিরাট বাৎসল্যের একটা পরিচয় যে, তার ভুল নেই। স্রষ্টার সব-সৃষ্টিই, বা সৃষ্টির সবটাই কিছু নিখুঁত হয় না, তা নিয়ে খুঁত-খুঁত করার কোন মানে হয় না।

সিগনেট প্রেস (তাঁদের টুকরো কথায়) 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'-বইটিকে 'সুখপাঠ্য লাঠালাঠি' বলে উল্লেখ করেছেন। সুখপাঠ্য কতখানি তা জানিনে, তবে এটাকে লাঠালাঠি বলতে আমি নারাজ। এ-বইকে কেউ যদি সিরিয়াসলি নেন তবে সেটা তাঁর সিরিয়াস্ মনের—নিজগুণেরই পরিচয়। তেমন মারাত্মক গুরুত্ব আমার কোনো লেখার আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার নিজের মতে 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' হচ্ছে, মস্কো নিয়ে পণ্ডিতি, আর পণ্ডিচেরি নিয়ে মস্করা।

সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশিল্পী নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় এবার "বলশেভিকের" বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন—'আত্মশক্তি'র পৃষ্ঠায় তিনি ধরে নিয়েছেন—বলশেভিকবাদ existing order-এর বিরুদ্ধে। এবং তাই তিনি নিজেকে ওর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন।

গোড়াতেই বলে রাখি, বোলশেভিকের পক্ষ-সমর্থনের জন্য আমি কলম ধরিনি। কেননা বলশেভিজম অনেক বড়ো বড়ো আক্রমণ সত্ত্বেও টিকে আছে, আশা করি নলিনীবাবুর ধাক্কাও সে সামলে উঠবে। আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি গীতা-উপনিষদ ইত্যাদি আমাদের ঘরোয়া সাবেক জিনিষদের রক্ষা করতে। কারণ নলিনীবাবু যেভাবে গীতা-উপনিষদের মতো অতি পুরোনো মাপকাঠি দিয়ে বলশেভিকির অতি আধুনিক ও অত্যন্ত বিরাট বিশ্বরূপ মাপতে লেগেছেন, তাতে আমার আশঙ্কা হয়, মরচে পড়া কাঠিগুলি না মচকে যায়! মনে হয়েছে তাঁর মানদণ্ডের প্রাণদণ্ড দিতেই যেন তিনি মরীয়া।

আমার বিশ্বাস গীতা-উপনিষদের তত্ত্ব নিয়ে বলশেভিকের তত্ত্বের বিচার হতে পারে না, যেমন বলশেভিকের মতবাদ দিয়ে গীতা-উপনিষদের তত্ত্ব-নির্ধারণ অসম্ভব। দুটো একেবারে আলাদা জিনিস—স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। বলশেভিকের বিরুদ্ধে নলিনীবাবুর 'প্রধান অভিযোগ এই যে, উহা নাস্তিকা-বুদ্ধি, গীতার কথায়, তামস-জ্ঞান-প্রসূত।[1]

কেননা, মানুষ-যে দেবতা, মানুষ-যে ব্রহ্ম, মানুষ-যে ভগবান স্বয়ং—এই সকল কথা তাহার কাছে কেবল যে অবাস্তব এমন নয়, ইহাদিগকে সে মনে করে মানুষ-মারা বিষ-মন্ত্র।[2] তাহলে বোঝা যাচ্ছে, নলিনীবাবুর মতে, মানুষ-যে দেবতা, মানুষ-যে ভগবান স্বয়ং—এই সকল 'অতিবাস্তব সত্য' কথায় দৃঢ় বিশ্বাসই হচ্ছে একমাত্র দিব্যজ্ঞান ; এবং বলশেভিকরা যদি মনে করে মানুষ কেবলমাত্র মানুষ, তার বেশি কিছু নয়, এমন-কি দেবতা, ব্রহ্ম ও ভগবান—তিনটার একটাও সে নয়—তাহলে সেটা তাদের নাস্তিকা-বুদ্ধির রীতিমতো বিজ্ঞাপন! পৃথিবীতে nonsense-এর proportion খুব বেশি—তার মধ্যে হ্রাস করে sense proportion রাখাটা-যে ঘোরতর তামসজ্ঞানের পরিচয়—এ-কথায় নলিনীবাবুর সঙ্গে আমি একেবারে একমত। তবে এগুলো ঠিক 'মানুষ-মারা বিষমন্ত্র' কি-না—এ-বিষয়ে ঈষৎ সন্দেহ আমার থেকেই যাচ্ছে, কেননা চোখের ওপর দেখছি এই বিষ-মন্ত্রে, অনেকগুলি গুণী ব্যক্তি, মারা না পড়ুন, দস্তুরমতো কাবু হয়ে রয়েছেন! কৈবল্য উঁচুদরের প্রাপ্তি, পরাকাষ্ঠার চূড়ান্ত,—বস্তুতঃই তা শূন্যভেদী। সেই কেবলতা লাভ করতে গিয়ে ক্যাবলামো পেয়ে বসেছে তাঁদের।

গীতা-উপনিষদের বাক্য আমরা নির্বিবাদে ও নির্বিচারে মেনে নিই, কেননা ওসব প্রাচীন বলেই সত্য এবং সম্ভবতঃ সত্য বলেই প্রাচীন। কিন্তু এও তো মিথ্যে নয় যে, আর সব-কিছুর মতো সত্যেরও জন্ম, যৌবন ও বার্ধক্যের কাল আসে—সেও যথানিয়মে নবীন সত্যকে স্থান ছেড়ে দিয়ে শেষে প্রাচীন পুঁথির মিউজিয়মে—সনাতন কবর-খানায়—দেহরক্ষা করে। সত্যসত্যই যদি কোনোকালে মানুষ ভগবানরূপে দলে-দলে বিচরণ করে থাকে, এখন আর তাদের সশরীরে দেখতে পাওয়া যায় না ; কাজেই নলিনীবাবুর

কথিত সত্য এখন আর জীবন্ত হয়ে নেই, পুঁথির পাতায় নির্বিকল্প আশ্রয় গ্রহণ করেচে। সুতরাং দুঃখ যতই সূক্ষ্ম হোক, যা নেই—তা নিয়ে, যা আছে তার সঙ্গে লড়াই করাটা অসাধারণ আস্তিকা-বুদ্ধির পরিচয় হতে পারে, কিন্তু এই ধরনের রেষারেষির শেষাশেষি প্রায়ই খুব সুবিধার দাঁড়ায় না! পরশুরাম বড়ো লড়ায়ে ছিলেন, ব্রহ্মাস্ত্র ছিলো তাঁর; কিন্তু গত পরশুরামকে নিয়ে আজ আর কোনো আরাম নেই।

আমি বলতে চাই, শ্রীকৃষ্ণের গীতার চেয়ে কার্ল মার্কসের গীতা বড়ো, কেননা এই গীতা আজকের মানুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠেচে—পুরানো গীতার কোনো বচন দিয়েই এই নূতন গীতার সৃষ্টিশক্তির পরিমাপ করা যায় না। সব্যসাচীর জ্ঞাতি-বিরোধের কুরুক্ষেত্রের চেয়ে লেনিনের শ্রেণী-সংগ্রামের বিশ্বক্ষেত্র ঢের বড়ো—আদর্শের দিক দিয়ে। জগতের দুঃখে বুদ্ধদেব কেঁদে আকুল হয়ে কঠোর বাস্তবের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন, কিন্তু লেনিনকে আমি বুদ্ধের চেয়েও বড়ো বলবো এই জন্যে যে, তিনি তাঁর কঠোরতর সাধনায়, সবলতর বাহুর জোরে এই কঠিন বাস্তবকে ভেঙে গুঁড়িয়ে, গুঁড়ির থেকে নূতন করে গড়তে পেরেচেন। এই ভাঙা-গড়ার অনিবার্য ফলে যদি নলিনীবাবুর 'ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই দ্বিজাতি বা অভিজাত বর্ণত্রয়ের বিলোপ' ঘটে থাকে, তবে তার একান্ত প্রয়োজন ছিল বলেই ঘটেচে। তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই।(১)

নলিনীবাবু তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেচেন—

'অন্তরের ভাবে ও ধর্মে তাহারা (বলশেভিকরা) শূদ্রই।...নূতন শূদ্রকে সৃষ্টি করিয়া বলশেভিক তাহার নূতন সমাজের পত্তন করিতে চাহিতেছে। কিন্তু এই চেষ্টা হইতেছে যাহাকে বলে, পিরামিডকে তাহার চূড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দুশ্চেষ্টা। ফলত নূতন সমাজের সৃষ্টি সম্ভব একমাত্র নূতন ব্রাহ্মণের সৃষ্টি দিয়া—'

এখানে 'ফলত 'নিয়ে মূলত একটু গোলযোগ। ইতিহাসের সাক্ষ্যেই প্রমাণ যে, নূতন সমাজের সৃষ্টি হতে পারে একমাত্র শূদ্রের দ্বারাই। আর তাদের নূতন সৃষ্টির দরকার নেই, দরকার শুধু তাদের নূতন দৃষ্টির। পৃথিবীর আদি সমাজ, আদি সভ্যতা কৃষকের লাঙ্গলের

১। নলিনীবাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমিও ফুটনোটে (যদিও অপরের) একটু বাক্য সংযোগ করলুম :

He [Lenin] is a saint, a seer, a practical idealist who saw the vision of a better, saner and healthier humanity and brought out a world-revolution which has already swept away many a throne and kingdom, shattered to picees many a time-honoured and cherished institutions, established a new order and made a complete readjustment of things economic, social and political.

Despised by same, defied by others—a terror to oppressors and exploiters, and a saviour to the oppressed and exploited—this enigmatical personality is still a force, even after five years of his death, before which the old world with all its time-worn philosophy and parapharnalia of pomp and power is daily losing its footing.

ফলেই গড়ে উঠেছিল ; আজ পর্যন্ত সভ্যতার যা খাঁটি সোনা তা উদ্ধার করচে শ্রমিকরাই, তাতে পালিশ লাগাচ্চে নলিনীবাবুর 'অভিজাত বর্ণত্রয়' এবং গিল্টিও চালাচ্চে তারাই। কিন্তু নলিনীবাবুদের দলগত মতিগতি এমনই জলবৎ তরল যে, এই গিল্টি কনসেপ্টা কখনোই তাঁদের মনে কোনো আঁচড় কাটে না।

রাশিয়ার কথা ছেড়েই দিই,—রাসলীলায় ভারী কড়াকড়ি—কিন্তু আমেরিকার নূতন সমাজ কাদের সৃষ্টি? ইউরোপ থেকে যেসব শূদ্রের দল আমেরিকায় চাষবাসের পত্তন করতে গিয়েছিল, তাদের। আদিযুগের আর্যাবর্তেরও সেই একই ইতিহাস। সমাজসৃষ্টির গোড়ায় থাকে শূদ্রের শক্তি—পরে সেই সমাজের শোষণ, শাসন এবং নিছক শোভাবর্ধনের জন্য যথাক্রমে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের উদয় হতে থাকে। সমাজের মতো বিরাট সৃষ্টি একমাত্র শূদ্রের দ্বারাই সম্ভব। ব্রাহ্মণের দ্বারা হতে পারে দু'-একটা সঙ্ঘ, আশ্রম বা আড্ডা—বড়ো জোর এক-আধটা নৈমিষারণ্য বা পণ্ডিচেরি-মার্কা আধুনিক ব্যাসকাশী।

যারা বিজ্ঞানের নজরে কিছু দেখে না, ইতিহাসের নজির তাদের চোখে পড়ে না। তাই নলিনীবাবু 'নূতন শূদ্র দ্বারা নূতন-সমাজ পত্তনের চেষ্টা'-কে বলেছেন—

'পিরামিডকে তাহার চূড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দুশ্চেষ্টা। ফলত নূতন সমাজের সৃষ্টি সম্ভব একমাত্র ব্রাহ্মণের সৃষ্টি দিয়া—,'

অথচ, নলিনীবাবু আরেক জায়গায় স্বীকার করেচেন—

'বলশেভিকরা তাহাদের রাষ্ট্রে তাহাদের সমাজের যে বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা নূতন প্রণয়ন করিতেছে.. সে সমস্তই, হয়ত সামান্য অদলবদলের ফলে, আদর্শ সমাজের রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থা হইয়া উঠিতে পারে।'

কিন্তু হলে কী হবে, সে সবই-যে শূদ্রের সৃষ্টি! 'ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণদের' সঙ্গে পরামর্শ করে এবং 'অভিজাত বর্ণত্রয়ের' সাহায্য নিয়ে যদি করতো তাহলে নলিনীবাবুর আপত্তি ছিল না, কিন্তু কাউকে না বলে-কয়ে নিজেরাই সব করে ফেলা—এ যে নিতান্তই হঠকারিতা! পণ্ডিচেরিতে ব্রাহ্মণেরা (নয়া পেটেন্ট) নূতন সমাজের সৃষ্টি করবেন বলে বহুদিন থেকে হাত ধুয়ে বসে আছেন ; তাঁরা কী করচেন না করচেন তা না দেখেই, তাঁদের উপদেশের অপেক্ষামাত্র না রেখে—এমন কি, তাঁদের নোটিশ পর্যন্ত না দিয়ে তাঁদের জগদুদ্ধারের একচেটে অধিকারে হাত দিতে যাওয়া অন্যায়ের চূড়ান্ত হয়েছে! তারা একটা দুরপনেয় দুরপরাধ করে ফেলেচে সন্দেহ নেই; ভরসা এই, নলিনীবাবু নিজগুণে তাদের ক্ষমা করবেন।....তারা অবোধ, জানে না তারা কী করেচে!

অত্যন্ত অসহিষ্ণু তারা ; কাল-রূপ অনন্ত ব্রহ্মের সঙ্গে চিরন্তন যোগ রক্ষা করবার মতো অফুরন্ত আলস্যের তাদের অমার্জনীয় অভাব—ধৈর্য, সংযম, তিতিক্ষা তাদের একবিন্দু নেই ; তারা ভাবচে দুনিয়ার লোকের উপকার করার মহা দায় যেন তাদের ঘাড়েই অপেক্ষা করে আছে—সেটা হুট করে ফেললেই হলো! কিন্তু বাস্তবিকই তো তা আর না! মানুষের দুঃখকষ্টে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তাড়াতাড়ি একটা-কিছু করতে গেলেই কি-আর সেটা টেকে?—তাতে অন্য সব সৃষ্টিকর্তা বা সৃষ্টিকামীদের শুধু চিত্ত-চাঞ্চল্যই জাগে, তাঁদের তপোলব্ধ নিরবচ্ছিন্ন নির্বিকার শান্তিরই খালি বিঘ্ন ঘটানো হয়, তার বেশি কিছু নয়।

নলিনীবাবু তো স্পষ্টই বলে দিচ্চেন—

'অন্তরাত্মার হিসাব আগে না করিলে, বাস্তবের স্থূলরূপের আদি উৎপত্তি যে সূক্ষ্ম চিন্ময় লোক, সেখানে বীজ বপন না করিয়া আসিতে পারিলে, সকল শ্রম পণ্ড হইতে

বাধা। জগতে যে-দুঃখ দেখিয়া বুদ্ধদেব পথের ভিখারী হইয়া গিয়াছিলেন—সেই দুঃখ দূর করিয়া, দুঃখের সমাজকে সুখের সমাজে পরিণত করা কেবল জড়বুদ্ধির কাজ নয়, প্রয়োজন অন্যরকম সাধনার। ...বলশেভিকরা তাহাদের দেশের জন্য বা জগতের জন্য যে স্থায়ী সম্পদ কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিবে, তাহা মনে হয় না—সে কর্মের কৌশল তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে নাই।"

নলিনীবাবুর ভাবখানা অনেকটা এইরকম আধুনিক শূদ্রদের স্পর্ধা দ্যাখো, তারা এসব তত্ত্বকথা মানতেই চায় না! হোক-না-কেন এই 'শূদ্রবর্ণা পৃথিবীতে' তাদের সংখ্যাই সাড়ে-পনেরো আনা, তবু তো তারা সেই "কৃষক আর মজুর"। অভিজাত অর্ধ-আনাকে হেঁটে ফেলে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করা কি তাদের উচিত হয়েছে? এতদিন এই "অভিজাতদের" সুশাসনে চিৎ হয়ে কেমন সুখে কালাতিপাত তারা করেছিল—তার বিনিময়ে কিনা এই! ভদ্র ভাষায় বলতে গেলে নেহাৎ তোরা ছোটলোক!

তারপরে 'চিন্ময় লোকে বীজ বপন' করা দূরে থাক,—এতকাল ধরে 'চিন্ময় লোকে বীজ বপনের' ফলে যে সব সনাতন শস্যে ধরিত্রী ভারাক্রান্ত, আগে কিনা তাদেরই কর্তনে লেগেছে! সেটাই যেন তাদের প্রথম কর্তব্য! অথচ সনাতন আমাদের ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচিন্তার সঙ্গে অর্থচিন্তার কী অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন—একধারে যেমন উপনিষদ, গীতা, অন্যধারে তেমনি মনুসংহিতা; একদিকে যেমন বড়ো বড়ো তত্ত্ব, অপরদিকে তেমনি ব্যক্তিনির্বিশেষে অন্নপ্রাশন থেকে শুরু করে বেচারার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক ট্যাক্সো আদায়, এমন কি, বহুকাল আগে খতম হয়ে গেলেও তার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে মড়া মাথার ওপর বংশানুক্রম জিজিয়া; দুষ্কর্মের এই ভূ-ভারে জন্মাবার ও মরবার পাপের শাস্তিমতো প্রায়শ্চিত্ত—সেই যে আমাদের ছিল ভালো! বলশেভিক শূদ্ররা নিজের দেশের ব্রাহ্মণদের তো লোপ করেইছে, আমাদের ব্রাহ্মণদের এইসব চিরকেলে ব্যবসা, বিনা পুঁজির ফলাও কারবার—এসবও লোপাট করবে নাকি? তাহলেই তো গেছি!

তারপর ক্ষত্রিয়। কেমন তারা দেশে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তি বাধিয়ে রাখত—তাদের নব নব কুরুক্ষেত্র পৃথিবীতে শূদ্রাধিক্যের কত বড়ো অমোঘ ঔষধ ছিল, আর তাদেরই কিনা বিলোপ করা! কেউ হয়তো বলবেন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী যখন রইলই, তখন অস্ত্রচিকিৎসাটা উঠে গেলেও কিছু যায় আসবে না। কিন্তু অমন দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয়রা যখন গেল, একদম দাঁড়াতে পেল না তখন, শূদ্রদের অনাচারে, এইসব অভিজাত আধিব্যাধিরাও যে টিকে থাকতে পারবে, সে-ভরসা বড়ো নেই।

বেচারা বৈশ্যদের যা দুর্গতি করেছে, মনে করলেও কান্না পায়। অর্থ অনর্থের মূল—শূদ্রদের সেই অর্থ থেকে রক্ষা করবার জন্যে মারাত্মক অর্থভার কষ্ট করে নিজেরা এতদিন বহন করেছে; অবশ্য ভারমুক্ত হয়ে তারা বেঁচে গেল,—কিন্তু এইভাবে বাঁচানো? সম্পূর্ণ তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বে—এর চেয়ে না বাঁচানোই-যে ভালো ছিল! শূদ্ররা যখন ধরিত্রীকে দোহন করে কেউ তখন একটি কথাও বলে না, কিন্তু বৈশ্যরা তাদের ধরে দোহন (exploit) করতে গেলেই কথা ওঠে! বৈশ্যরা শোষণ করবে, ক্ষত্রিয়রা শাসন করবে, আর ব্রাহ্মণেরা রকমফের করে দুটোই করবে—এই অপূর্ব 'সহযোগ ও সমবায়ের মধ্যে' যে অভিজাত সমাজের 'প্রাণ' ছিল, সেখানে 'দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ' আমদানি করে শূদ্রজাতরা কী সর্বনাশই না করলো!

মস্কোর কথা থাকুক, পণ্ডিচেরির দিকেই তাকাই এখন! সেখানকার 'নূতন ব্রাহ্মণেরা'

'চিন্ময়লোকে বীজবপনে' যেমন অত্যধিক সময় নিচ্ছেন তাতে অজন্মার ভয় একেবারেই করিনে! রাশিয়ায় ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে পারুন আর নাই পারুন, অন্ততঃ এই দেবভূমি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের ত্র্যহস্পর্শ যদি কায়েম রাখতে পারেন, তাহলেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি! অন্ততঃ আমরা তো রক্ষে পাই! বেটার লেট দ্যান নেভার!

অপ্রিয় সত্য ও প্রিয় অসত্য

সুভাষচন্দ্র বসু যখন বলেছিলেন, পণ্ডিচেরির চিন্তাধারার দ্বারা ভারতের কর্মশক্তি অভিভূত হবার আশঙ্কা আছে, তখন কথাটা তিনি মুখরোচক করে বলেন নি, এইজন্যে তার ভিতরে অপ্রিয়তা অনেকখানি আছে। সুভাষবাবুর বক্তব্যের প্রতিকথা বাদ দিয়ে প্রতিবাদ করতে পারি, কিন্তু তার ভিতরে যে-সত্য তাকে কিছুতেই বাদ দিতে পারিনে। সুভাষবাবু সাহসভরে যে-কথাটা বলে ফেলেছেন সেটা ভারতবর্ষে তাঁর একলারই ধারণা, এমন নাও হতে পারে; এরূপ মতামত হয়তো আরো দু'-চারজন দু'-পাঁচজনের কাছে প্রকাশ করে থাকবেন; কিন্তু সুভাষচন্দ্র যেখানে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলি বলেছেন সেখান থেকে তা সবার কানে পৌঁছেছে; সে-রকম ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নীরব থাকলেই তাঁর অপরাধ হোতো।

সুভাষবাবুর আশঙ্কা যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ 'আত্মশক্তির' পৃষ্ঠায় নলিনীবাবুর গবেষণা 'তরুণের স্বদেশ সাধনা'। নেশন গড়া সম্বন্ধে তরুণের মনে বহুৎ আইডিয়া থাকতে পারে, কিন্তু নলিনীবাবু প্রবন্ধাকারে যা ব্যক্ত করেছেন, তা যদি সত্যিই এদেশের তরুণদের আইডিয়া হোতো, তাহলে আমি অন্ততঃ এই পঞ্চাশ অর্ধেই বানপ্রস্থে যেতুম! আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, এই আইডিয়া একমাত্র নলিনীবাবুর। তরুণের মাথার উপর চারদিক থেকে নানারকম চাপ পড়চে একথা জানি, কিন্তু তার ফলে মস্তিষ্ক ফেটে যে তার অপমৃত্যু ঘটেচে, এ দুঃসংবাদ এ পর্যন্ত আমি পাই নি।

নলিনীবাবু তাঁর প্রবন্ধে অনেক রুচিকর কথা আমাদের শুনিয়েছেন, তার মধ্যে সত্য কতখানি তা যাচাই করার প্রয়োজন আছে। কেননা কবিতায় যখন প্রিয়কথা শুনি, তখন তার প্রিয়ত্বই যথেষ্ট মনে করি, সত্য সেখানে বাহুল্য; কিন্তু নিছক গদ্যে নলিনীবাবু যে-বস্তুর অবতারণা করেছেন, তাকেও সেইভাবে গ্রহণ করলে তাঁর প্রতি যে-অবিচার করা হবে, তাঁর কঠোর সমালোচনাও তার কাছে কিছু নয়। কাব্যলোকে ধোঁয়া উপভোগ করা চলে, কিন্তু গৃহলোকে ধোঁয়া, ছলনা করে কাঁদবার মস্ত সহায় হলেও, বাঁচবার পক্ষে মোটেই নয়।

কার্ল মার্কস ইতিহাসের ইকনমিক ব্যাখ্যা করেছিলেন; নলিনীবাবু এবার ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন—

"জাপান যে রুশকে হটাইয়া দিয়াছিল, তাহা কতখানি ইউরোপীয় সাজসজ্জার জোরে, কতখানিই-বা জাপানের প্রাচীন দীক্ষা, সনাতন ধর্মের কল্যাণে?... জাপান যে এত সহজে, এমন সম্পূর্ণরূপে রুশের মতো বিপুল বিভীষণ শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে পারিয়াছিল, তাহার মূল কারণ স্থূল অস্ত্রশস্ত্রের যথাযোগ্যতার মধ্যে ততখানি নাই, (১)

১। তাঁর এই মতবাদ কিরূপ মারাত্মক (অন্ততঃপক্ষে হতে পারত) তা পাঠক বিবেচনা করুন। ভাগ্যিস, আমরা নিরস্ত্র আছি তাই বাঁচোয়া! আসলে মাথাই নেই তার আবার কানা আর খোঁড়া! কিন্তু থাকলে—?

সে-কারণ আরও গভীরে,— বাহিরের ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে জাপান-যে নামাইয়া আনিতে পারিয়াছিল তাহার প্রাচীন অন্তরাত্মার ধর্মের কিছু প্রভাব, এই জন্যে।'

ভালো কথা, মেনে নিলুম, জাপানের জয়ের কারণ তার আধুনিকতা নয়, তার 'প্রাচীন দীক্ষা ও সনাতন ধর্ম ; কিন্তু আমাদের আর-যাই-থাক-নাই-থাক, ওই দুটি বস্তুর অভাব তো কোনোদিনই ছিল না, তবে আমরাই বা কেন ইংরেজের মতো 'বিভীষণ শক্তির' সংঘর্ষে এমন কাবু হয়ে পড়লুম (২) ; জাপানের মতো তাদের 'ছত্রভঙ্গ' করে দিতে পারলুম না ?—আমাদের বরাতেই বা 'ভাগবত সত্তার' এহেন উল্টো বিচার হলো কেন ?

ধর্ম ও দীক্ষা—এই দুটো বস্তুর যা কিছু প্রকাশ হবার তা-যে প্রাচীনকালেই হয়ে গেছে—একথা আর যেই মানুক, পৃথিবীর তরুণরা যদি মানে তাহলে তার চেয়ে করুণ আর-কিছু হতে পারে না। আধুনিক যুগের ধর্ম ও দীক্ষা যদি প্রাচীন যুগের সঙ্গে না মেলে, সর্বপ্রকারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়, তাতে এই গ্রহের ভূতপূর্ব অধিবাসীদের অসম্মান হয়ত হবে, কিন্তু পৃথিবীতে আমাদের আসবার সম্মান আর সার্থকতা সেইখানেই। অতীতের চেয়ে বর্তমান বড়ো, বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ—একথা তরুণেই বলে। একথা যদি না বলতো তাহলে যে-বিপুল ট্র্যাজেডি ঘটতো, তার ম্লান আলোকে পৃথিবীর মুখ ভারী ম্রিয়মাণ দেখাতো।

নলিনীবাবুর দ্বিতীয় বাণী—

'ইউরোপের আসুরিক শক্তিকে যদি জয় করিতে হয়, তবে তাহা সম্ভব দুই পথে। এক ইউরোপের অপেক্ষাও বৃহত্তর অসুর হইয়া—আর না হয়, সত্যকার দেবশক্তি অর্জন করিয়া। প্রথম পথ আরও দুর্গম—সংঘর্ষের সন্তাপের অজ্ঞানের অকল্যাণের—বলশেভিকরা জগৎকে এই পথে লইয়া যাইতে চলিয়াছে। তাছাড়া এশিয়ার পক্ষে এই পথ পরধর্মের পথ।'

বলশেভিকদের উপর, দেখচি, নলিনীবাবুর রাগ কিছুতেই পড়চে না, বাগ মানছে না কিছুতেই। একবার অসুর বানিয়ে ছেড়েচেন ; এমন কি, সেখানেই ক্ষান্ত হতে চাননি, একথাও বলেচেন যে, তারা জগৎকে 'সংঘর্ষের সন্তাপের অজ্ঞানের অকল্যাণের পথে' নিয়ে যাচ্চে। অভিজাত অর্ধআনা এতদিন শূদ্র সাড়ে পনের আনার মাথায় হাত বুলিয়ে যেরূপ নিশ্চিন্ত আরামে কালাতিপাত করে এসেচে, তাতে আজ তাদের সেই বর্ণাশ্রমের নিরঙ্কুশ গণ্ডী থেকে সশ্রম মুক্তি নিতে গেলে সংঘর্ষ ও সন্তাপ কিছু ঘটবেই ; —কিন্তু ঝড় যেমন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম নয়, তেমনি এই সন্তাপও দুদিনের। বৈষম্যের প্রথম বিক্ষোভ কেটে যাবার পর যখন পরিপূর্ণ সাম্য বিরাজ করবে তখনকার লোকে সমাজের সেই অবস্থাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নেবে (যেমন রাশিয়ায় নিয়েচে) : 'আমার পূর্বপুরুষ ঋষি অস্পৃশ্য ছিলেন বা দরজা-ভাঙার মহারাজা ছিলেন!' এমন কোত কারু মনে জাগবে না। তারপর, বলশেভিকরা জগৎকে অজ্ঞান ও অকল্যাণের পথে নিয়ে যাচ্চে—এ-কথাই বা নলিনীবাবু বলচেন কেন ? জগতের জ্ঞান ও কল্যাণ বলতে আমরা এতদিন বুঝতুম জগতের বিশেষ দু'-পাঁচ জন ব্যক্তির জ্ঞান ও কল্যাণ—আজ নির্বিশেষ সকলের জ্ঞান ও কল্যাণের পথ মুক্ত হচ্চে বলেই কি নলিনীবাবু ওই শব্দদুটির আভিধানিক মানে পাল্টে দিতে চান ?

২। আমাদের 'প্রাচীন দীক্ষা ও সনাতন ধর্মের' কুম্ভকর্ণ-শক্তির ফলেই নয় তো ?

সাম্যবাদকে যাঁরা রাশিয়ার আমদানি ভারতের পক্ষে পরধর্ম বলেন, তাঁরা গোড়াতেই একটা ভুল করেন। বর্ণাশ্রম লোপ করে বুদ্ধদেবের সাম্য স্থাপনের চেষ্টা তাঁরা প্রথমেই বিস্মৃত হন। অতীতের কথা ছেড়েই দিই, বর্তমানে মুসলমানরাও যে এই ভারতেরই অধিবাসী এবং তাদের মধ্যে সাম্যবাদ কোনো না কোন রূপে অত্যন্ত সহজভাবেই বিদ্যমান —একথাও (৩) তাঁরা ভুলে যান। তারপর হিন্দুদের সনাতন যৌথ পরিবার—তার ভেতরে আমরা কী দেখি ?—কমিউনিজমের মূলসূত্র ; সাধ্যমতো উপার্জন পরিবারে দেবে এবং প্রয়োজনমতো তা থেকে নেবে। গৃহ থেকে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী থেকে গ্রামের মধ্যে এই কমিউনিজমেরই প্রাচীন রূপের একটা ক্রমবিবর্তিত বিকাশ ঘটেছিল—আজ যদি তাকেই আধুনিক জীবনের ও সমস্যার উপযোগী করে বৃহত্তর সমাজে (অর্থাৎ সমগ্র দেশের মধ্যে) বিবেচনা করা যায় তাহলেই মহাভারত অশুদ্ধ হবে ? বরং ইভোলিউশনের নিয়ম অনুসারে সেইটাই কি তার স্বাভাবিক পরিণতি নয় ? বুদ্ধদেবের আমলে এই ভারতবর্ষেই যে সাম্যবাদের প্রথম সূচনা হয়েছিল, আজ যদি সেখানেই তার সফলতা ঘটে, সেটাই কি তার 'স্বধর্ম' হবে না ?

না হয় তর্কের খাতিরে ধরেই নিলুম, সমাজতন্ত্রের রূপ সম্পূর্ণ বলশেভিকি সৃষ্টি ; তবু ভারত যদি নিজস্ব প্রেরণায়, নিজের প্রয়োজনের তাগিদে ঐ-রূপকেই গ্রহণ করে তাতে ভারতের বৈশিষ্ট্যই বা যাবে কেন (৪) এবং তাকে অনুকরণ মনে করে লজ্জিতই বা আমরা কেন হব ? দুটো লোক যদি বিভিন্ন পথে গিয়ে অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছোয় তাতে পরস্পরের কাছে খাটো হবার তো কারণ নেই। প্রাচীন যুগের জাতিরা পরস্পর-নিরপেক্ষ থাকা সত্ত্বেও যেমন অনেক মধ্যে সেকেলেপনার একটা ঐক্য দেখতে পাই, এ যুগের জাতিদের আধুনিকতার মধ্যে তেমনি একটা একাকৃতি থাকবে, এইটাই তো স্বাভাবিক।

নলিনীবাবুর মতে কিন্তু ভারতের পথ একেবারেই পৃথক। দুনিয়ার আর সবাই যদি পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে বাঁচতে চায়, আমরা চাইব দেবতা হতে কিম্বা অমানুষ থাকতে, অথবা এই রকম একটা ভাগাভাগি বন্দোবস্ত যে, গুটিকতক হবে দেবতা আর বাকি সব তাদের বাহন কিম্বা উপদেবতা ! (৫) এবং নলিনীবাবু সেই পথই আমাদের বাতলেছেন ! তিনি বলছেন—

দ্বিতীয় পথ (অর্থাৎ দেবশক্তি-অর্জনের পথ) এশিয়ার—

ভারতের নিজস্ব পথ, স্বধর্মের পথ, পরম স্বস্তি, পরম সিদ্ধি তাহাতে। ভারতের আদর্শ কর্মী, বিভূতি যাঁহারা, যাঁহারাই অসুর-রাক্ষসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা দেখি সকলে চিরকাল প্রথমে দেবশক্তির নিকট হইতে দিব্য অস্ত্রলাভ করিয়া তবে রণক্ষেত্রে

৩। যদিও সেই একান্নবর্তী পরিবার এখন ৫২-বর্তী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪। যদিও আমি মনে করি বৈশিষ্ট্যের চেয়ে মানুষ বড়ো—বৈশিষ্ট্যের পৌত্তলিক পায়ে মানুষের কল্যাণের বলিদান, আর যে-যুগেই চলে থাকুক এ-যুগে অচল।

৫। কেন না আমার বিশ্বাস, দেবতা হওয়ার আর্টকে করতলামলকবৎ করা দু'-চারজন বাহাদুরের পক্ষেই সম্ভব ; বাকি সবাই হঠাৎ দেবতা হবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করেও দেবত্বের নাগাল পেতে পারবেন না, অথচ এই হঠযোগ সাধনের ফলে যে অবস্থায় উত্তীর্ণ হবেন তাকে মানুষী অবস্থা বলে তাঁদের এবং মানুষদের অপমান করাও ন্যায় হবে না, এই বিবেচনা করে তাঁদের more than man but less than God-এই উপযুক্ত আখ্যা দেওয়াই বোধহয় সমীচীন।

নামিয়াছেন। আসুরিক শক্তি দিয়া অসুরকে জয় করা কখন সম্ভব হয় আবার কখন নাও হইতে পারে,... কিন্তু দেবশক্তির দ্বারা অসুরের যে-জয়, তাহা অব্যর্থ, তাহা সম্পূর্ণ, চূড়ান্ত,—এবং আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ ভারত দেব-অংশসম্ভূত।'

'দেবশক্তি অর্জন' বলতে নলিনীবাবু-যে কী বোঝেন এবং কী বোঝাতে চান তা তিনিই জানেন! কতজন লোকের পক্ষে দেবশক্তি অর্জন করা সম্ভব তিনি মনে করেন? পৃথিবীতে সম্প্রতি ক'জন দেবতা হয়েচেন এবং ক'জন হবো হবো করচেন? তাঁদের ক'জনাকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার বাকি দুইশ' কোটি লোকের কী গতি? তারা কি দেবতাদের বাণী শুনে আর পদসেবা করেই কৃতার্থ হবে? তাদের যখন দেবত্ব লাভের ভরসা নেই তখন কি মানুষের প্রাপ্য থেকেও তাদের বঞ্চিত থাকতে হবে? তাদের জন্যে তাঁর কী ব্যবস্থা?

নলিনীবাবুর স্কুলের সঙ্গে লেনিনের স্কুলের তফাৎ এইখানে। নলিনীবাবুরা চোখের সামনে দেখেন তাঁরই সগোত্র দু'-দশজনকে; আর বলশেভিকরা দেখে এই পৃথিবীর সব মানুষকে। কাজেই একটা পথ যখন অন্দরের দিকে যায়, আরেকটা তেমনি বিশ্বের দিকে বেরিয়ে পড়ে। বিশ্বপথের যারা যাত্রী, অন্দরের লোকদের তারা লক্ষ্যও করে না, আন্দরিকদের আন্তরিক দুঃখের কারণই এইখানে। এই জন্যই আন্দরিকদের আন্দোলন—বাইরের পথটা কিছু না, অন্দরের পথই সত্য; কিন্তু ভরসা করে সেই পথে সবাইকে নিমন্ত্রণ করতেও পারেন না; কেন না বিশ্বসুদ্ধ মানুষ চলতে পারে সে-পথ তত বড়ো নয়। বিশ্বসুদ্ধ লোক যে-পথের যাত্রী হতে পারে না সে-পথ ব্যবহারের অযোগ্য,—যে মুক্তি একা আমার, তার মতো করুণ প্রাপ্তি আর দুনিয়ায় নেই।

নলিনীবাবুর একটা আবিষ্কার কিন্তু খুব অদ্ভুত। তিনি বলেচেন—'ভারতের আদর্শকর্মী, বিভূতি যাঁহারা, যাঁহারাই অসুর-রাক্ষসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন তাঁহারা দেখি সকলে চিরকাল প্রথমে দেবশক্তির নিকট হইতে দিব্য অস্ত্রলাভ করিয়া তবে রণক্ষেত্রে নামিয়াছেন।' রণক্ষেত্রে নেমেচেন তো বটে, কিন্তু একবারও যে জিতেচেন পুরাণ-ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই। অসুরের কাছে বারম্বার পরাজয়ই দেবতাদের দুর্ভাগ্য-লিপি! বোধহয় এই কারণেই, পণ্ডিচেরি দিব্য অস্ত্র লাভ করেও মস্কোর অসুরদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে নামতে এত ইতস্তত করেচেন! তৃতীয় লোকে দেবতারা সত্য হতে পারেন, কিন্তু মর্তলোকে তথাকথিত অসুরেরা ততোধিক সত্য—তুড়ির সাহায্যে তাদের উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এবং যদিও নলিনীবাবু বড়ো গলা করে ঘোষণা করচেন—'দেবশক্তির দ্বারা অসুরের যে জয় তাহা অব্যর্থ, তাহা সম্পূর্ণ, চূড়ান্ত—এবং আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ ভারত দেব-অংশ সম্ভূত'—তবুও আমরা তেমন ভরসা পচ্ছিনে। কারণ আমরা যদি দেবতাদের এতই সগোত্র, এতই আদরের, তবে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—একবার পাঠানের, একবার মোগলের, একবার খৃস্টানের পায়ে আমাদের মাথাই বা এমন করে মুণ্ডিত হচ্ছে কেন?' যখন দেখছি সেই পৌরাণিক যুগ থেকে এ পর্যন্ত এ পৃথিবীতে অসুরেরই একাধিপত্য আর বোলবালাও তাদেরই; এবং বেচারা দেবতাদের প্রায় বংশ-লোপ, অকৃত্রিম দৈব ভাষায়-'তস্য নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়'—তখন কী করে আর বিশ্বাস রাখি যে, দেবত্বটাই সত্য আর অসুরত্ব কিছু না! বসুন্ধরাকে ভোগ-দখল করতে হলে যখন আসুরিক হওয়া ছাড়া উপায় নেই, তখন তেমন মহাপাপ করার চেয়ে 'দেব-বংশসম্ভূত' হতভাগ্য আমাদের

উচিত দুর্লভ দেবত্ব বাঁচিয়ে শুভ দিনক্ষণ দেখে ধরাধাম ছেড়ে বরং অমর্ত লোকের দিকেই যাত্রা করা! সেটা আমাদের পক্ষেও ভালো এবং পৃথিবীর পক্ষেও!

আধুনিক বলশেভিকদের পৌরাণিক খাল দেওয়ার সার্থকতা আমি বুঝিনে। বেশি পরিমাণে মানুষ হওয়ার জন্যেই কি তারা অসুর? লেস দ্যান হিউম্যান হওয়াটাই কি দেবত্বের লক্ষণ? বলশেভিকরা মানুষের দেহ ও মনের প্রয়োজনটা প্রথমে স্বীকার করে; এইজন্যই কি নলিনীবাবু তাদের অসুর বানাতে চান? আর, যেহেতু আমরা দেহকে তুচ্ছ করে আত্মা আত্মা রবে আকাশ ফাটাই সেই কারণেই আমরা দেবতা? দেহ যদি এতই অবাঞ্ছনীয় হয়, তাহলে এমন দেহত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে আত্মস্থ হওয়াই আমাদের উচিত—তাতে দেহ ও আত্মা দুটোই মুক্তি পাবে এবং উভয়ের পক্ষের সেটা খাসা!

আসলে, আত্মা হচ্ছে দেহ-মনের সৃষ্টি। এই জন্যে বলশেভিকরা দেহ-মনকে যদি আত্মার চেয়ে বড়ো করে থাকে, নিতান্ত ভুল তারা করে নি। অন্তর্গত গ্ল্যাণ্ডের সিক্রিশান দ্বারা যেমন দেহের ভেতরে যৌবনের সঞ্চার ঘটে, তেমনি দেহ-মন পরিপূর্ণ ও চরিতার্থ হলে তার অভ্যন্তরে যে অবরস বিনিঃসৃত হয়, তাকেই আমরা বলি আত্মা—সেই সহজ নিঃসরণের আনন্দবোধই আমাদের আত্মবোধ। আত্মার চেয়ে আত্মপ্রকাশ বড়ো, যেমন সূর্যের চেয়ে সূর্যের আলো। দেহ-মন সম্পূর্ণ ও সার্থক হলে আত্মার প্রকাশ সেখানে আপনিই হয়, কারু সাধাসাধির অপেক্ষা রাখে না; অতএব যেটা গোড়ার কাজ বলশেভিকরা সেটাই যদি গোড়ায় করে থাকে, সেজন্য তারা অনাত্ম নয়, অনাত্মীয় তো নয়ই—এবং আত্ম-বিরোধী তাদের কিছুতেই আমি বলতে পারিনে।

অবশেষে নলিনীবাবুর শেষ কথাটি শুনে আমার কথা শেষ করি। তিনি এই প্রিয় সংবাদটি আমাদের শুনিয়েছেন—

"আজ বিশ্বমাতা ভারতশক্তিরূপে প্রকট হইয়া উঠিয়াছেন সমস্ত জগতে নূতন একটা জীবন, ঊর্ধ্বতর একটা চেতনা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, পৃথিবীতে অভিনব সমাজ স্থাপন করিতে।"

বিশ্বমাতার প্রিয়পুত্র আমরা, জগৎ-সমুদ্ধারের যা-কিছু কাজ তা আমাদের দ্বারাই তিনি সম্পন্ন করবেন,—আমরা সবচেয়ে বড়ো, সব থেকে পেয়ারের—এইসব কথা ভাবতে ভারি আরাম; সেই আরামের মধুচক্রে ঘা দিতে স্বভাবতই সঙ্কোচ হয়, কেন না মধু-র ভাগ্য সেখানে নেই, হুলের তাড়না খুবই। এই দুর্ভাগা দেশে প্রিয় অসত্যই নিরাপদ, অপ্রিয় সত্য বলা এখানে বাহবা পাবার পথ নয়; তবু একথা বলতেই হবে যে, এই বৃথা গর্ব, এই অলস আত্মপ্রসাদ, এই মারাত্মক মোহ থেকে মুক্ত হওয়ার সময় হয়েছে। নিজেকে সত্যি করে জানতে গিয়ে যদি নিজের অহংকারে ঘা লাগে, বেদনা বেঁধে, সেই আত্মবিক্রির আজ একান্ত প্রয়োজন।

নলিনীবাবুকে আমি এই ক'টি প্রশ্ন করি, বিশ্বমাতার এবম্বিধ বাসনার কথা তো বহুদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে, তবু তাঁর প্রকট হতে এত দেরি কেন? সেজেগুজে আসতেই সময় নাকি, লাগছে বিশ্বপতির সঙ্গে দাম্পত্য কলহের ফলেই এই লঘুক্রিয়া? তারপরে, এত দেশ থাকতে ভারতবর্ষের ওপরেই বা তাঁর এমন পক্ষপাতিত্ব কেন? আর সব দেশ কি ভেসে এসেছে? এবং রাশিয়ায় ইতিমধ্যেই যে অভিনব সমাজ স্থাপন হয়েছে, তাতে যে নলিনীবাবুর বিশ্বমাতার হাত নেই, তাই বা তিনি জানলেন কী করে? সেখানে

কি বিশ্বমাতা প্রকটিত হতে পারেন না? বিশ্বমাতা একমাত্র ভারতেই পর্দানশীন কি-না দয়া করে এ-সংবাদটাও তিনি আমাদের দেবেন!—ভারতের অন্তঃপুর ছাড়া বিশ্বপথে তাঁর গতিবিধি নেই, এটা নিশ্চিতরূপে জানতে পারলে আমরা নিশ্চিন্তরূপে ঘুমোতে পারি।

সর্বশেষে আমি এই বলতে চাই যে, আজকের তরুণকে সর্বতোভাবে আধুনিক হতে হবে; তার মধ্যে যতটুকুতে প্রাচীনতা থাকবে ততটুকুতেই হবে মৃত্যুর অধিকার। বার্ধক্য ভালো, কিন্তু যৌবনের চেয়ে ভাল নয়: কেন না তা সৃষ্টিশক্তিকে বন্ধ্যা আর দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করে। নদীর পক্ষে নিত্যকার জলধারাই সত্য, প্রত্যহের সূর্যকর থেকে তার যোগান আসে; তার দুই কূলে যে সনাতন বালু মোহ বিস্তার করচে, আত্মহারা হয়ে তার মধ্যে আশ্রয় নিলেই তার মৃত্যু—এই প্রাচীন বালুকে প্রতি মুহূর্তে অস্বীকার ও অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়াতেই তার গতিমান জীবন। তার চলন্দশা চালু। বালুকার প্রাচীনতা সে মানতে পারে; তার শাশ্বত স্থবিরত্বকেও দূর থেকে নমস্কার করা যায়, কিন্তু তার খাতিরে নিজের জীবনের—নিজস্ব গতিবিধির—পরাভব কিছুতেই না।

আজকের তরুণের কাজ, বিশ্বমাতার জন্যে অপেক্ষা করা নয়, তাঁর দায়িত্বভার নিজের কাঁধে নেওয়া; অভিনব সমাজ স্থাপন করাই আজকের তরুণের সাধনা। এর জন্য যদি সংঘর্ষ বাধে, সন্তাপ জাগে, তার আঘাত তার আঁচ থেকে পিছিয়ে থাকা তাদের চলবে না। এর থেকে আত্মরক্ষার লোভে যারা কর্মস্থল ছেড়ে মর্মস্থলে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক চিন্ময়লোকে বীজ-বপন-কার্যই নিরাপদ মনে করবেন তাঁদের ভগবতবুদ্ধির প্রশংসা করে মৃন্ময়লোকে যে-দায় তাঁর নিবারণ হতে উঠেছে তার যোজনেই তাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে—তা হচ্ছে আজকের জগৎ থেকে অতীতের বীজ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করা; কেন না, এই বিনাশের দ্বারাই অতীত বর্তমানের ক্ষেত্রে ফলবান হবে। ('মহতী বিনষ্টি'—একথা কি উপনিষদ এই মহাকাণ্ডকে লক্ষ্য করেই বলেছিলেন?) এর চেয়ে মহত্তর বিনাশ আর হতে পারে না। বীজের বিলুপ্তি বনস্পতির অঙ্কুরতার পক্ষে যেমন জরুরি, অতীতের বিলুপ্তি বর্তমানের সার্থকতার পক্ষে ঠিক তেমনি: প্রাচীন সমাজের নিশ্চিহ্ন বিলোপ না ঘটলে নতুন সমাজের পত্তন সম্ভব নয়।

খো রোখা

এবার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র রায় ও শচীন সেন (১) দুর্ধর্ষ বলশেভিকদের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত নলিনী গুপ্ত মহাশয় এতদিন একা একরোখা লড়ে এসে অবশেষে শ্রান্ত হয়ে নিরস্ত হয়েচেন— এবার রুখেচেন এঁরা দু'জন! এবার আর রক্ষে নেই, কেন না নলিনীবাবুর মতো এঁরাও বলশেভিকদের প্রতি এঁদের অন্তরের অমার্জনা যেভাবে অমার্জিত ভাষায় প্রকাশ করতে লেগেচেন, তাতে তাঁরা যদি একটুও ভদ্রলোক হন, পৃথিবী থেকে মানে মানে বিদায় নেবেনই। তবে তাঁরা কী—? সেই এক প্রশ্ন! কিন্তু সে প্রশ্ন থাক।

মহেন্দ্রবাবুর রায় এই যে,—

১। 'আত্মশক্তি' চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়ের 'বলশেভিক গণমানব' এবং ১৩৩৬ সালের বোশেখের 'বিচিত্রায়' শ্রীযুক্ত শচীন সেনের 'সোস্যালিজম'—দ্রষ্টব্য।

'বলশেভিক সমাজ মানুষের জীবনকে বন্য পশু-জীবনেরই একটা সঙ্ঘবদ্ধ রূপ দান করিতে চাহিতেছে।'

বন্য-পশুদের মহেন্দ্রবাবু অনায়াসেই অপমান করিতে পারেন, কেন না তার জন্য সভ্য পশুদের আদালতে বা আন্তর্জাতিক এজলাসে তারা মানহানির অভিযোগ আনতে যাবে না। কিন্তু তাদের তরফ থেকে আপত্তি এই ওঠে যে 'আহার, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি'র ব্যাপারে মানুষের সঙ্গে তাদের নিবিড় ঐক্য থাকলেও বিচ্ছেদ এইখানে যে, এখনো তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে পরস্পরকে সভ্য প্রথায় উচ্ছেদ করতে শেখে নি। অতএব, মানুষের দরবারে তাদের দর বাড়ানো না গেলেও, মহেন্দ্রবাবু কি এই আপত্তিকর মন্তব্যের জন্যে পশুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন? অন্তত এটুকু আমি তাঁর সততার কাছে আশা করতে পারি?

মহেন্দ্রবাবু বলেছেন,—

'বলশেভিক গণমানব সকল মানুষকে তাহাদের ব্যক্তিত্ববিকাশের স্তর হইতে নামাইয়া আনিতে চায়।'

অবশ্য এটা তাঁর মনে হয়। কিন্তু মনে হওয়ার চেয়ে সত্য যখন আর নেই এবং তার ওপরে যে-কোনো তত্ত্বই নির্বিবাদে যখন খাড়া করা চলে তখন আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া পথ নেই। 'বলশেভিক গণমানবের' বিরুদ্ধে মানুষকে পশুতে পরিণত করবার অভিযোগ এইজন্যে যে, লেখকের মতে তারা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের বাধা সৃষ্টি করেছে। 'ভগবান নাই, আত্মা নাই, মৃত্যুর পরে সত্তার কোনো পরিণতি নাই, অতীন্দ্রিয় কোনো রহস্যলোকের আকর্ষণ নাই—।' বলশেভিকদের এতগুলি 'নাই';—মহেন্দ্রবাবু বলতে চেয়েছেন এই বিপুল নাস্তিক্যের ভারেই পাশবিক সোভিয়েট রাজ্যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ মারা যেতে বসেছে।

হায় হায়, এতদিন ধরে 'ভগবান, আত্মা, মৃত্যুর পরে সত্তা এবং অতীন্দ্রিয় রহস্যলোক' এরা সবাই সমবেতভাবে উপস্থিত থেকে পৃথিবীর ইতিহাসে যে-কটি ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হলো আঙুলে তাদের গোণা যায়—এখন এ-কটাও যদি উপে যায়, জগতের তবে উপায়?

আমি বলবো, এ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ জন্মেছে, যারা ব্যক্তিত্ব বিকাশ করে যেতে পারে নি, সে ক্ষতিও যদি ধরিত্রীর সয়ে থাকে, তখন, মুষ্টিমেয় বাকী ক'জনের যদি সেই গতিই হয় সে তো বোঝার 'পরে শকের আঁটি। অবশ্যি ভগবান, আত্মা—এরা ব্যক্তি নয় এবং ব্যক্ত নয়, কিন্তু না হোক মহেন্দ্রবাবুর মতে, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে এনারাই পরম সহায়। তাই-ই তো হবে, কেন না স্বর্গ সৃষ্টি করতে যে বস্তুর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হচ্ছে উপসর্গ।

কিন্তু, সত্যই কি কমিউনিজম ব্যক্তিত্বের পক্ষে বাধা? ব্যক্তিত্ব-বিকাশের গোড়ার কথা ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য, তা নইলে সে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে না। মানুষ যখন দরিদ্র, আর্থিক জীবনেই হোক, আর আত্মিক জীবনেই হোক, তখন তার কোনো ছন্দ নেই, তখন সে ছন্নছাড়া। অন্নচিন্তা এবং অর্থচিন্তা মানুষকে এমন চমৎকৃত করে রাখে যে, বাইরের তাল সামলাতে গিয়ে অন্তরের তালা খোলার সময় সে পায় না। আত্মিক দারিদ্র

দূর করবার আপাতত দায়িত্ব কমিউনিজমের নয়, আর্থিক দারিদ্র দূর করাই তার প্রথমত কাজ। অর্থ-লোকে সে আনতে চায় স্বাচ্ছন্দ্য, অন্তর্লোক স্বচ্ছন্দ হবে তার ফলেই। আপনার থেকেই হবে। বাঁধ ভেঙে দিলে নদীর জল বাধা হয়ে স্বতঃই যেমন ছড়িয়ে পড়ে। তখন কেবল দু'-একজন নয়, নিখিল ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পাবে সেই সার্বজনীন সামর্থ্যকতার পথেই সকলের সার্থকতা দেখা দেবে।

কমিউনিজম মানুষের যে-মুক্তি এনেছে তা হচ্ছে সশ্রম মুক্তি। সবাকার অন্ন সে যোগাবে, কিন্তু তার জন্য সবাইকেই খাটতে হবে। এখন পৃথিবীতে এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন যাঁরা শ্রম করতে নিতান্তই নারাজ—এইটেই তাঁদের 'ব্যক্তিত্ব' বোধ হয়। এঁরা তথাকথিত ইন্‌টেলেকচুয়াল্‌স ; কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এঁদের ঐকতান এই যে, ব্যক্তিত্ব এতই ঠুনকো জিনিষ যে, খাটালে মারা যায়। শ্রমে তার স্ফূর্তি নেই, আলস্যেই স্ফূর্তি ; তাকে খাটানো নয়, তার জন্যে খাট আনো!

কেউ তাঁরা বলবেন যে, দৈহিক শ্রমে বাধা নেই, কিন্তু বাধ্যতামূলক হলেই হয় ব্যক্তির অপমান। দৈনিক ক্ষুধার দ্বারা বাধ্য হয়ে আমরা ডান হাতের পরিশ্রম করি এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার ; তেমনি সামাজিক ক্ষুধার দ্বারা বাধ্য হয়ে যদি আমরা দুই হাতে খাটি, সেইটাই কি হবে অপমান? ক্ষুধা উচ্চবস্তু না হতে পারে কিন্তু তুচ্ছবস্তুও নয়—ক্ষুধার দাবীই ক্ষুধার অধিকারকে টেনে আনে।

দিন ছ'ঘণ্টা স্টেটের জন্য খেটে দিয়েই আমি খালাস, বাকি আঠারো ঘণ্টা আমার ব্যক্তিত্ব অভিব্যক্তির পক্ষে যথেষ্টই। সেই ব্যক্তিগত সাধনার ক্ষেত্রে স্টেট আমাকে ডিক্‌টেট করতে আসে না; কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা বলবেন, না আসুক, দেহ খাটালে আমাদের আত্মা খাটো হয়—এই হচ্ছে আসল কথা। ওঁরা শাস্ত্রপুঁথি খুলে উদ্ধৃতি আওড়াবেন; আমরা ভাবি, এমনিই বুঝি। কিন্তু হায়, দৈনিক ছ'ঘণ্টা করে আমরা ঘুমোই এবং সেটা দৈহিক নিদ্রা—কিন্তু তাতে আমাদের ব্যক্তিত্বের বা চিত্তের বিকাশ রুদ্ধ হয় না। কেবল দৈহিক শ্রম করলেই আত্মার মাথা কাটা যায়!

এবার 'বিচিত্রার' পাতায় আসা যাক : এখানে সোস্যালিজমের যে খিচুড়ি পরিবেশন করা হয়েছে তাও কম বিচিত্র নয়! শ্রীযুত শচীন সেন যে such insane হতে পারেন, এই প্রবন্ধটি পড়ার আগে তা বিশ্বাস করা শক্ত ছিল। এমন পাকা রকমের কাঁচা লেখা সচরাচর চোখে পড়ে না। এত উল্টো-পাল্টা কথা এর মধ্যে যে, জবাব দেব কি, তা জীর্ণ করাই কঠিন। বকুনি দেবার সুবিধা হবে বলে লেখক মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের বুকনি ঝেড়েছেন, কিন্তু তিনি একথা ভুলে গেছেন যে, সম্প্রতি পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ যে-কটি মাথা, তাঁরা সবাই সোস্যালিজমকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই দলে নন এই দুষ্কল্পনা করে শচীনবাবু রবীন্দ্রনাথের অপমান করেছেন এবং সম্ভবত নিজেরও সম্মান বাড়ান নি।

শচীনবাবুর প্রবন্ধ থেকে পঙ্কোদ্ধার করা শক্ত ব্যাপার, সে-চেষ্টা আমি করবো না। বিস্তর বাগবিস্তারের ভেতর থেকে তাঁর যে-তিনটি বক্তব্য আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি কেবল তারই জবাব দেব। শচীনবাবুর কাছে সবচেয়ে বড়ো 'সমস্যা' এই যে,—

'সব ধর্মগ্রন্থ সোস্যালিজম প্রচার করে না' এবং 'সব বড়লোক সোস্যালিস্ট নয়।'

অতএব এই জন্যই এ বস্তু অগ্রাহ্য, এই কথা তিনি বলতে চেয়েছেন!

ধর্মগ্রন্থ কেন সাম্যবাদ প্রচার করে না—তার কারণ এই যে, সমাজের উচ্চস্তরের স্বার্থরক্ষার জন্যই ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টি; কেবল নিজে এ কাজে নিযুক্ত নয়, ভগবান, আত্মা, পরলোক, কর্মফল ইত্যাদি মামুলি তত্ত্বকেও বড়ো লোকদের স্বার্থসাধনের এই কাজে সে লাগিয়েছে। কয়েকজনের সুবিধার জন্য অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছায় নিজের প্রাপ্যগণ্ডা থেকে বঞ্চিত থাকবার প্রেরণা পাবে, যে-শাস্ত্র এমন প্রোপাগাণ্ডা করতে পারে, তারই নাম ধর্মগ্রন্থ। বস্তুত বলতে গেলে, ধর্মগ্রন্থও একপ্রকার ক্যাপিটাল, একে খাটিয়ে খাওয়া চলে, ভাঙিয়েও কিছুদিন বেশ যায়,—কিন্তু মেরে খাওয়া চলে না। আর মহাপুরুষরা যে সোস্যালিস্ট নন, তার কারণ বোধহয় এই যে, এ পথ তত করতালিমুখর নয়। কেবল দিতে জানলেই সোস্যালিস্ট হয় না, নিতে জানাও চাই। মানুষের দুঃখে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেই মহাপুরুষ হওয়া যায়, কিন্তু সোস্যালিস্ট হতে হলে তার চেয়ে শক্ত ধাত দরকার। দরিদ্রকে যে নারায়ণ বলে সেই মহাপুরুষ, কিন্তু তার এই নারায়ণত্ব থেকে যে তাকে চিরবঞ্চিত করে, সে-ই হচ্ছে সোস্যালিস্ট।

শচীনবাবুর দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য হচ্ছে আর্থনীতিক। তিনি অনেক আগড়ম-বাগড়ম বলেছেন, তার প্রতিকথা বাদ দিয়ে প্রতিপাদ্য এই কথা পাওয়া গেল—'কাঞ্চন বণ্টনের চেয়ে কাঞ্চন বাড়ানো ঢের শ্রেয়।' শচীনবাবুর মন অর্থনীতির পুরানো সূত্রে আবদ্ধ, আধুনিককালে এক্ষেত্রে যে-নূতন সূত্রপাত হয়েছে তাকে আমল দিতে তিনি রাজি নন। আধুনিক তথ্য এই যে, বণ্টন করেই প্রকৃতপক্ষে বাড়ানো যায়—তাতে হয় কাঞ্চনের প্রসার, তা ছাড়া অন্যভাবে বাড়াতে গেলে যা হয় তাকে বলে পুঁজি, তারই নাম প্রপার্টি; জনকতকের প্রপার্টির সঙ্গে বাকি সকলের প্রভার্টি বেড়েই চলে—এর দু'টোই হচ্ছে ক্রাইম। এই ক্রাইম দূর করতে চায় সোস্যালিস্ট, কেবল দরিদ্রকে raise করেই নয়, ধনীদের erase করে।

ধর্মনীতি গেল, অর্থনীতি গেল, এখন রইল শচীনবাবুর তিন নম্বর আপত্তি। তা হচ্ছে, কমিউনিস্টদের কর্মনীতি নিয়ে। তারা ধীরে সুস্থে কিছু করতে চায় না, তারা র‍্যাডিক্যাল, ইভোলিউশনের চাকার দূর-বিপাক দূর করে ক্ষিপ্রপাক দিলে যা হয় সেই রিভোলিউশনের তারা পক্ষপাতী। আসলে যারা নতুন পথ কাটে তারাই র‍্যাডিক্যাল,—তাদের হচ্ছে নির্বিচার। পথের বাধা তাদের কেটে সাফ করতে হয়, ছোটো-খাটো কাঁটাগাছ যেমন কাটা পড়ে, বড়ো বড়ো মহীরুহেরও সেই এক গতি। কেউ হয়ত বলবেন, এসব বনস্পতি বহুকালের, এরা সনাতন, অনেককে ছায়া দিয়েছে ঠাঁই দিয়েছে; কিন্তু তার মায়া করলে চলে না। কেন না, মানুষ যে অচল হলো তার পথ চাই আগে।

একদল যখন পথ কাটে আর একদল দেয় বাধা, তখনি বাধে লড়াই। তারই নাম ক্লাসওয়ার—এ থেকে নিষ্কৃতি নেই। যতদিন পথ শেষ না হয় ততদিন লড়াই শেষ হয় না। কিন্তু পথের বিপক্ষে যারা, তাদের হটতে হবেই—চিরদিনই হটতে হয়েছে; তারপর সেই পথ প্রশস্ত হলে যারা সেই পথে চলবে তারা শ্রেণীযুদ্ধ করে চলবে না, চলবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে। এর প্রশস্তিই আজকের লেনিনের মুখে যুদ্ধের শ্লোগান, সে হাঁকছে——Turn to the right and attack. কিন্তু কালকের লেনিনের মুখে শুধুই প্রেমের গান! তাকে লেনিন বলে চেনাই যায় না!

শচীনবাবুর প্রবন্ধের আশ্চর্যালোকে একটি চমৎকার বাক্য পেলাম, তিনি বলেছেন,—

"'মানবজাতির ওপর শ্রদ্ধা আছে বলেই আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, এই বিরাট মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে মানবজাতির ওপর।"

তিনি দু'-চারজন সুপারম্যানের ওপর সব মানুষের ভবিষ্যতের বোঝা চাপাতে চান। বোঝা গেল, মানবজাতি বলতে তিনি দু'-চারজন ভাগ্যবান মানুষকে বোঝেন ; মানবজাতির ওপর তাঁর এই অসাধারণ শ্রদ্ধার জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ!

মানবজাতির প্রতি শ্রদ্ধা আমারো আছে, কিন্তু আমি মনে করি, মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করেছে মানব-জাতিরই ওপর। সুপারম্যান হচ্ছে সমস্ত মানুষের সাক্ষাৎ লাঞ্ছনা, তার অবনতির মূর্ত প্রতীক। তত্ত্বকথার ছলেই হোক, আর অস্ত্রশস্ত্রের বলেই হোক, সমস্ত মানুষকে নিলডাউন করে রেখে নিজের উচ্চতা-প্রদর্শনের প্রয়োগনৈপুণ্য যাদের তারাই সুপারম্যান। কিন্তু মানুষের এই স্পেসিস-এর লোপ আসন্ন হয়ে এসেছে, শীঘ্রই এরা মিসিং-লিংক-এ পরিণত হবে। সমস্ত মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ালে কারু মাথা কারুকে ছাড়িয়ে ওঠে না। সোস্যালিজম চায় সমস্ত মানুষকে সম্পূর্ণ করতে...সুপারম্যানের একজিবিশন খুলতে নয়।

সব শেষে মহেন্দ্রবাবুর একটি কথা নিয়ে আলোচনা করবো। তিনি বলেছেন, 'বলশেভিক গণমানবের জীবনে কোনো পরমনীতি নাই।'

অপরকে শোষণ করে কী ভাবে নিজেকে পোষণ করা যায় তারই উপায় বাতলে দেয় অর্থনীতি এবং এই দুষ্কর্মের চক্ষুলজ্জা থেকে যা বাঁচায় তারই নাম ধর্মনীতি। কাজেই মহেন্দ্রবাবুর সগোত্রদের পেটেন্ট-করা 'পরমনীতি', 'পরম উদ্দেশ্য' এবং 'সনাতন পরিণতি'র প্রতি এতদিনের প্রতারিত ও 'পরিণত' গণমানবের যদি কিছুমাত্র আস্থা ও উৎসাহ না থেকে থাকে তাতে আমি দোষ দিতে পারিনে। যে 'পরমনীতি' এতদিন তাদের দাবিয়ে এসেছে, আজ মাথা তুলে তাকেই দাবানো যদি তাদের প্রথম নীতি হয় আমি আশ্চর্য হবো না। কেন না নীতির চেয়ে মানুষ বড়ো। মানুষই নীতি গড়ে, নীতির মানুষ গড়বার সাধ্য নেই ; এবং নীতি ভাঙতে পারে বলেই মানুষ মানুষ।

তবু কমিউনিস্টদের জীবনে পরম না হোক চরমনীতি একটা আছে, তা হচ্ছে All for one and one for all ; প্রত্যেককে পূর্ণ করে প্রত্যেকের সম্পূর্ণতা। এই নীতি তারা কোনো পুঁথির পাতায় লিপিবদ্ধ করেই রাখে নি, তাদের জীবনে একে রচনা করেছে। পুঁথি পড়ে বা পুঁথিপড়া বিদ্যায় কমিউনিজমকে বোঝা শক্ত, বই পড়ে তার অতীতের ইতিহাস পেতে পারি, কিন্তু তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা জানতে পারিনে। কেন না এ হচ্ছে জীবনের প্রকাশ—বনস্পতির মতোই অফুরন্ত-প্রাণ ; এর মধ্যে সনাতন কিছু নেই, কিম্বা থাকলেও তা বড়ো হয়ে—তাই একমাত্র হয়ে নেই। এ প্রত্যহের প্রতি মুহূর্তের ; এ বেড়ে চলেছে ; বিচিত্র ফলে এর বীজ, বিবিধ ক্ষেত্রে এর অঙ্কুরতা, বিচিত্র অঙ্কুরে এর পাদপত্র—বিচিত্র পাদপে সাফল্য।

মানুষের সভ্যতার এতদিনের ইতিহাসে আমরা দেখি দু'দল মানুষ। একদল অখণ্ড স্বার্থপরতায় ঘোষণা করে বলেছে—পৃথিবীর সবাই আমার জন্য। স্টেট—সে তো আমি! আমি চরিতার্থ হবো—সেই তো এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো কথা। আরেক দল এদের প্রায়শ্চিত্ত করেছে বনবাসে অথবা ক্রুশকাঠে ; তারা বলেছে, আমি এসেছি পৃথিবীর সকলের জন্যে ; সকলের কাছে আমি নিজেকে দিয়ে গেলাম।—এদের দু'দলই সভ্যতার অসম্পূর্ণতার পরিচয় দেয়।

কেবল দেশে-মহাদেশে নয়, ছোটো ছোটো গ্রামে ছোটো-খাটো গোষ্ঠীর মধ্যেও এই দু'দল লোক আজ পর্যন্ত বর্তমান—একদলের নিষ্ঠুর লোভ আরেক দলের নির্বিচার ত্যাগ। বুদ্ধ ও যীশু চলে গেছেন, এক-আধজন নয়, লক্ষ লক্ষ বুদ্ধ ও যীশু আত্মদান করেছেন—তার ইতিহাস রচিত হয় নি; কিন্তু মানুষের সভ্যতা অসম্পূর্ণ রয়েছে আজো।

এই সভ্যতাকে সম্পূর্ণ করতে এসেছে কমিউনিজম, এর চিরন্তন দ্বন্দ্ব এ মিটিয়েছে। একরোখা সভ্যতাকে এ দোরোখা করেছে, এর মধ্যে এনেছে সামঞ্জস্য ও শ্রী। কম্যুনিস্ট বলে না যে, আমি সবার জন্যে, কিম্বা আমার জন্যে সবাই; তার বার্তা হচ্ছে, আমি যেমন সবার জন্যে তেমনি আমার জন্যে সবাই।

এই কমিউনিজমের মূলনীতি। মানুষকে এ মুক্তি দিয়েছে নিরর্থ সঞ্চয় থেকে ও নিষ্ফল আত্মদান থেকে; স্বার্থত্যাগের বাণী এর নয়, এ বলেছে স্বার্থ-যোগ করতে, একের স্বার্থের সঙ্গে সকলের স্বার্থের। অবশ্য কতকগুলো মানুষের বুদ্ধ বা যীশুর মতো মহাপুরুষ হবার পথে এ কাঁটা দিয়েছে। স্বার্থকে মহত্ত্ব দান করেছে এ। আমি দিচ্ছি অথচ আমিই ফিরে পাচ্ছি—এ যেন সমস্ত মানুষের প্রতি সমস্ত মানুষের চুম্বনদান—প্রদানেই সাথেই আদান—দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে পাওয়া এখানে—নিজের চুমুকেই ফিরিয়ে পাওয়া যেন—প্রত্যেক চুমুকে।

ব্যক্তিত্ব ব্যক্ততা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র রায় দ্বিতীয় পর্বে (১) এসেছেন, কিন্তু সেটা তাঁর শান্তিপর্ব নয়। বলশেভিক গণমানবদের 'ব্যাভারে' তিনি যেরূপ অশান্তি ভোগ করছেন, তাতে তাদের পার্শ্বে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এই কারণে যারা যোগ দিয়েছেন, তাঁদের ওপরে চটে-মটে এই রায় তিনি দিয়েছেন, যে, "সহজ মনোবৃত্তির বশে সাময়িক ভাবের বন্যায় গা ভাসিয়েছেন তাঁরা।'

মহেন্দ্রবাবুর যদি যোগ দেবার ক্ষমতা না থাকে তবে বলবো সেটা তাঁর গুণ; কিন্তু সহজ মনোবৃত্তির তাঁর যে ধারণা তা ঠিক নয়। সভ্যতার ইতিহাসে যখনি কোনো নতুন পথের আবিষ্কার হয়েছে তখন অল্প কয়েকজনই সে পথে পা বাড়িয়েছে, তারাই শুধু বলেছে এই পথেই রয়েছে বহু দূর-গতি; কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল পা গুটিয়েই বসেনি, পিছন ফিরে বসেছে। মহেন্দ্রবাবুদের মতো তাদেরো কোলাহল এই ছিল যে, এর পরিণামে দূর-গতি নয় দুর্গতি। এবং তাই হচ্ছে সহজ ও স্বাভাবিক মনোবৃত্তি।

বহুদিনের ও বহুজনের অন্তর্গূঢ় তাপে ও সন্তাপে অচল হিমাদ্রির বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে, সাম্যবাদের যে ক্ষীণ ধারাটি খুব সম্প্রতি এই দেশের বুকে নেমে এসেছে তাকে বন্যা বলা চলে না কিছুতেই; এবং তার নিঃশব্দ আবেদনে সাড়া দিয়েছে যতজনা, তাকে সশব্দ আলোড়নে তারা করেছে তার ঢের বেশি।

কিন্তু তবু একদিন এ বন্যার আকার ধারণ করবেই। কেন? তার কারণ মহেন্দ্রবাবু যদি ভেবে না পেয়ে থাকেন, যিনি ভেবে পেয়েছেন তাঁর কথাতেই বলি: (২)

"মানুষের একলা হবার প্রবৃত্তিই হচ্ছে তার রিপু, সভ্যভাবে মিলিত হবার সাধনাই

১। বলশেভিক গণমানব, ২য় পর্ব—নবশক্তি, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।

২। "সংহতি" কাগজে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কমিউনিজম সম্বন্ধে প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

কল্যাণ। এই দুই-এর বিরোধ নিয়ে কুরুক্ষেত্র লড়াই মানুষের ইতিহাসে চলে আসচে। এখনো মানুষ শান্তিপর্বে এসে পৌঁছয় নি।

"সংহতির মূল প্রবর্তনার ভিন্নতা অনুসারে তার প্রকাশের ভিন্নতা ঘটে, এই মূল প্রবর্তনা যদি রাষ্ট্রিকতা (Poiitics) হয়, পররাষ্ট্রের প্রতিযোগিতায় স্বরাষ্ট্রকে শক্তিমান ও সম্পদশালী করে তোলবার চেষ্টা হয়, তবে তার দ্বারা যে সংহতি ঘটে, সে হয় অহমিকার সংহতি, তার বাহ্যরূপে একটা মিলনের চেহারা দেখা যায় কিন্তু তার মূল তত্ত্ব মিলন-তত্ত্ব নয়, প্রধানত সে হচ্ছে দ্বন্দ্ব। সেই বিরাট অহমিকার মেদস্ফীত আত্মম্ভরিতাকে অস্ত্রেশস্ত্রে রত্নালঙ্কারে ভূষিত দেখে লুব্ধ মানুষ তার পূজায় প্রবৃত্ত হয়। এই পূজার প্রধান আয়োজন নরবলি।

"সেই বলির মানুষ যে কেবলমাত্র পররাষ্ট্রের মানুষ তা নয়। আপন দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষকে যন্ত্রের মধ্যে ফেলে খর্ব না করলে, এই রাষ্ট্রিকতার পুষ্টি হয় না। তার শক্তিমূর্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে কেটে ছেঁটে জুড়ে তেড়ে সৈনিক-রূপে নিজের জয়রথ তৈরি করে, যে পর্যন্ত না এই রথে করেই তার শ্মশানযাত্রা ঘটে। তার ধনমূর্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে পঙ্গু করে তাদের পিণ্ড পাকিয়ে নিজের জয়স্তম্ভকে অভ্রভেদী করে তুলতে থাকে, যে পর্যন্ত না এই স্তম্ভ বিদীর্ণ করে নৃসিংহ বেরিয়ে আসে।

"মানুষের ইতিহাসে এর আগে অনেক দুঃখ দুর্ঘটনা ঘটেচে। শক্তির লোভ চিরদিনই নররক্ত পিপাসার পরিচয় দেয়। তার স্বর্ণলঙ্কায় চিরদিনই দেবতাদের হাতে হাতকড়ি পড়েচে। তার দশ মুণ্ড বিশ হাত দশ দিকে ধর্মকে উপেক্ষা করবার জন্য উদ্যত। তাই চিরদিনই তার স্বর্ণলঙ্কায় কোনো-না-কোনো সময়ে আগুনও লেগেচে।

"কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের সহায়তায় এই রিপু যে রকম বলিষ্ঠ উপকরণে বিরাট আকারে আপনার শক্তি বেড়েছে, এমন কোনোদিন করেনি। এর তাড়কা রাক্ষসীর দল জগৎসুদ্ধ লোককে তাড়না করে অতিষ্ঠ করে তুলল! অবশেষে আজ এই সংহতির চেলাদের মধ্যে কেউ কেউ কেঁদে বলচে "শান্তি চাই, শান্তি চাই।" কেন না এবারকার লঙ্কাকাণ্ড ত্রেতাযুগকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।

"কিন্তু রিপুও পুষব শান্তিও পাব—বিধাতার সঙ্গে এমনতরো চাতুরী ত চলে না। চোরাই মালে ঘর বোঝাই করে বিচারকের কাছে মাপ চাইব, এমন দরবার ত মঞ্জুর হবে না।—আগুনের পর আগুন লাগবে, যুদ্ধের পর যুদ্ধ বাধবে।

"ইতিমধ্যে মানুষের ইতিহাসে অন্ধকার গুহার মধ্যে একটি উপেক্ষিত শক্তি গোপনে আপনার বেগ সঞ্চয় করছিল। পরোপজীবী হয়ে যে ব্যবস্থা আপনাকে পোষণ করে, একদিন তার উপজীবিকাই তার পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান যুগের সভ্যতার মতো এমন দাসতন্ত্র সভ্যতা আর নেই। এই সভ্যতা উপকরণ বাহুল্যগ্রস্ত। এই উপকরণের অধিকাংশই তার পক্ষে বাহুল্য। অথচ একে তৈরী করতে, এর ভার বহন করতে, একে রক্ষা করতে বহু দাসের দরকার। তাদের না হলে এ সভ্যতার একদিনও চলে না। তার মানে হচ্ছে, এইখানেই এর সকলের চেয়ে দুর্বলতা। তার বিপুল ঐশ্বর্যের দ্বারাতেই এতদিন তার এই দুর্বলতা ঢাকা পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে এইটে প্রকাশ হয়ে পড়চে।

"যারা অত্যাবশ্যক, তাদের আবশ্যকতাই তাদের ঐশ্বর্য। যতদিন একথা তারা না জানে ততদিন নিজের মূল্য বোঝে না বলেই তারা এত সস্তায় বিকিয়ে যায়। বর্বরের দেশে, শোনা যায়, গজদন্ত পুঁতির মালার দরে বিকিয়ে গেছে। যখন তারা বাজারদরের

খবর পেয়েছে তখনই দামও চড়ে গেছে, তেমনি একদিন ইউরোপের রাষ্ট্রীক প্রতাপ দাসের কাঁধে চড়ে জগৎ জয় করে বেড়িয়েছে। দাসের দল ভেবেছিল যারা তাদের চালাচ্ছিল তারাই চালাক। অতএব কাঁধ পেতে দিতেই হবে। ইদানীং তারা এই সহজ কথাটা আবিষ্কার করেছে যে, তারা না চালালে উপরওয়ালারা অচল। তারা অত্যাবশ্যক, অতএব বর্তমানের ঐশ্বর্য তাদেরই হাতে। এই আবিষ্কারের জোরে বর্তমান সভ্যতার বাহনের দল মাঝে মাঝে কাঁধঝাড়া দিতে আরম্ভ করেছে—আর উপরে যারা বসে আছে, তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে। শক্তির যে উপলব্ধি উপরে চড়ে বসেছিল, সেই উপলব্ধিটা নীচে বাহনের মধ্যে প্রকাশ করেছে।

"এই বাহনদের সংহতিই-যে মানুষের সকল সংহতির চেয়ে বড় তা আমি মনে করিনে। কেন না এখানেও দ্বন্দ্বের প্রভাব। শক্তি উপরে বসেও নখদন্ত চালনা করে, নীচে নেমেও সে বৈষ্ণব হয়ে ওঠে না। আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়াবাসীদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের যে অন্যায় বিরোধ দেখা যায়, তার মধ্যে কেবল যে ধনীদের হাত আছে তা নয়, ধনের বাহনদের হাতও আছে।

"কিন্তু ইউরোপে কর্মজীবীদের যে দল বেঁধে উঠছে তার মধ্যে একটি বড় কথা আছে। সে হচ্ছে এই যে, এই দল নেশনের বেড়াকে একদিন সম্পূর্ণ অতিক্রম করবে, এমন আশা দেখা যাচ্ছে। কারণ ধনের রথযাত্রায় যে দড়িটা ধরে টান দিতে হচ্ছে সে দড়িটা সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে চলে গেছে, যারা টানছে তারা সকল দেশেরই মানুষ; এই দড়িটার ঐক্যেই তারা এক। তাই এই ঐক্যটাকে অবলম্বন করেই তারা সম্পূর্ণ আঁট বাঁধতে পারবে।

"যদি এই আঁট খুব সম্পূর্ণ হয় তাহলে পৃথিবীতে একদিন একটা অতি প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হবে। এই দুঃসহ শক্তির প্রলোভনই সোভিয়েত সম্প্রদায়কে বিচলিত করেছিল। তারা তাড়াতাড়িতে এইটেকে জাগ্রত করতে লোলুপ হয়ে উঠেছিল। এবং সকল লোলুপতারই যে লক্ষণ, নিষ্ঠুরতা ও জবরদস্তি—তা সেখানেও দেখা দিয়েছিল।"

"যাই হোক, শক্তির লীলা সমাজের উপরের স্তরে আপনার ভাঙাগড়ার কাজ অনেকদিন ধরে করে এসেছে। এই শক্তি এবার নীচের স্তরে আপনার কাজ করবে বলে উদ্যোগ করেছে। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এই স্তরে যখন তার আধিপত্য দেখা দেবে, তখনই যে মানুষের সকল পাপ মোচন হবে, আর শক্তি তার শৃঙ্খল রচনার চিরকেলে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে রাতারাতি মানুষের মুক্তি-সাধনায় প্রবৃত্ত হবে—একথা আমি বিশ্বাস করিনে। তবে এই কথা সত্য যে, সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দের প্রবল সংঘাতের দ্বারাতেই শক্তি সৃষ্টিকার্যের প্রয়োজন সাধন করে—ভূমিকম্প দৈত্যদের হাতুড়ি পিটুনির চোটেই আজকের দিনের এই পৃথিবী তৈরী হয়ে উঠেছে। সমাজের নীচের তলায় যে উপকরণ-ভাণ্ডারে এতদিন শক্তির কারখানাঘর বসেনি, আজ সেখানে যদি বসে, তাহলে মানুষ তাতে করে নিছক সুখ পাবে না, তাকে অনেক নতুন নতুন ব্যথা সইতে হবে। সৃষ্টিকার্যে এই ব্যথার দরকার আছে। অতএব তার জন্য প্রস্তুত থাকাই ভালো।"

"পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের ইতিহাসের যে চেষ্টা আজ দেখতে পাচ্ছি, ভারত তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকলে বঞ্চিত হবে। নতুন শক্তির যে বিশ্বব্যাপী মন্দির তৈরি হচ্ছে তার একটা সিংহদ্বার রচনার ভার ভারতকেও নিতে হবে বইকি!"

মহেন্দ্রবাবু যে কেবল ব্যক্তিতন্ত্র চান তাই নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও তিনি চান—এইজন্যই

তিনি সাম্যবাদের বিরোধী। আসলে কিন্তু স্বাতন্ত্র্যই সবচেয়ে বড়ো জিনিস নয়। একা থাকার মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, কিন্তু সার্থকতা তাতে নেই ; সার্থকতা আছে সকলের সঙ্গে সমান লয়ে মিলতে পারাতে, বহুর সঙ্গে হুবহু এক হয়ে যাওয়াতে। মেলবার আর মেলাবার এই কলাকৌশল যার জানা—এই মিলনের রস যে পেয়েছে সে-ই এ তত্ত্ব জানে। চরিতার্থতা লাভ করতে হলে অপরের সঙ্গে মিলে তা লাভ করতে হবে, একার বাহাদুরিতে তা মেলে না ; সকলে সম্পূর্ণ হলে তবেই আমি সম্পূর্ণ হতে পারি। কেউ যদি ধনের মানের আভিজাত্যের তুঙ্গ শৃঙ্গে একক থাকতে চায়, তার শিং ভেঙে তাকে জোর করে মিলনের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনাটা তার প্রতি মোটেই অবরমন্তি নয়, বরং সেইটেই হবে অপর রকমের সৌজন্যের পরিচয়।

মহেন্দ্রবাবুর মতে, 'ব্যক্তিত্বকে একাকারতার' মধ্যে বিনিঃশেষ করাই হচ্ছে, সাম্যবাদের মূল প্রেরণা। তিনি বলছেন— 'বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে আপনাকে বিকশিত করবার এই যে চেষ্টা এ হচ্ছে, বিশ্বশক্তির অন্তরতম কামনা। এই ব্যক্তিত্বকে বিনাশ করবার চেষ্টা, ব্যক্তিধর্মকে অখণ্ড একাকারতম মধ্যে বিলীন করবার চেষ্টা হচ্ছে বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধে চেষ্টা।'

প্রকাণ্ডতম আস্তিক হয়েও, মহেন্দ্রবাবুর বিশ্বাস হলো যে বিশ্বে বাস করেও সাম্যবাদীরা, বিশ্বশক্তির অন্তরতম কামনাকে কেবল যে অগ্রাহ্য করছে তাই নয়, তার বিরুদ্ধ চেষ্টা করে তাকে বিধ্বস্ত করেও তাদের বাড় বাড়ছে। কিন্তু প্রচণ্ডতম নাস্তিকেরও একথা বিশ্বাস করতে ঈষৎ সঙ্কোচ হবে। আমি তো মনে করি, মহেন্দ্রবাবুর তথাকথিত বিশ্বশক্তির অন্তরতম কামনাকে পূর্ণ করার প্রেরণাই হচ্ছে সাম্যবাদের। বহু প্রচ্ছন্ন ও আচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বকে বিচিত্র প্রকাশে সার্থক করে তোলার জন্যই এর অভ্যুদয়। বিশ্বশক্তির মনোবৃত্তির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, বা বিশ্বপ্রকৃতির মনস্তত্ত্বের খোঁজ খবর রাখি এমন কাহিনী বলার স্পর্ধা আমার নেই, তবু বিশ্বজনীন গতিবিধি দেখেই এই ধরনের বিজাতীয় একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনীভূত হয়েছে।

মহেন্দ্রবাবু যান্ত্রিকতার নিন্দা করেছেন, বলেছেন—বিজ্ঞানের কৃপায় যান্ত্রিকতার আবির্ভাব হয়েছে, আর এই যান্ত্রিকতাই ব্যক্তির মর্যাদাকে নষ্ট করবার চেষ্টা করছে। তাঁর একথা মিথ্যা নয়, কিন্তু এটা হয়েছে, তাঁর ব্যক্তিতন্ত্র আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে, যার পক্ষে তাঁর এতটা ওকালতি! সাম্যবাদের যুগে, এই যান্ত্রিকতাই মানুষকে ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দেবে, তার ব্যক্তিত্ব-সাধনের প্রধান সহায় হবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও যান্ত্রিকতার সাহায্যে এ যুগের মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিন-চার ঘণ্টার বেশি খাটার প্রয়োজন হবে না, বাকি বিশ ঘণ্টা সে আপন চরিতার্থতার কথা ভাববে, ব্যক্তিত্বের সাধনা করবে। রুটির গরজে কয়েক ঘণ্টাই রোজ—বাকী সময়টা তার নওরোজ। যন্ত্রের ভিতরে কিছু শয়তান নেই, তা আছে যন্ত্রীর মনে। মারতে হলে হাতই চালাই, কিন্তু আলিঙ্গনে বাঁধতে হলেও সেই হাতই চালাতে হয়।

মহেন্দ্রবাবুর ধারণা, পৃথিবীতে যারা ব্যক্ত, কেবল তারাই ব্যক্তি, আর যারা নয় তারা ব্যক্তি নয়, তারা Mass—গণমানব। অতএব গণমানবের কর্তব্য নয় এই মুষ্টিমেয় দুর্লভ ব্যক্তির মূল্যবান ব্যক্তিত্ব ফলানোতে বাধা দেওয়া। কিন্তু এই যে অসংখ্য মানবসমষ্টি—তাদেরো আত্মবিকাশের প্রয়োজন আছে বা তারাও প্রত্যেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি হতে পারে, এটা মহেন্দ্রবাবু কখনও মনে করেন না। মহেন্দ্রবাবুর মতে তথাকথিত ক্ষণজন্মা ব্যক্তিরা চিরজন্ম এদের, এই মুখাপেক্ষী গণমানবের, 'ভাগ্য নির্ণয়' করে দেবেন ;

ব্যক্তিহিসেবে নিজের 'পথ-নির্বাচন' করবার শক্তি হতভাগা এদের কোনোদিন হবে না, কেন না তা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু ভুলে যাচ্ছেন কয়েকজন মানুষ আর সবাইকে চালাবে এইটাই স্বাভাবিক, এ হচ্ছে সভ্যতার অপরিণত অবস্থার লক্ষণ; সমাজের পারফেক্ট অবস্থায় এ ব্যাপারে কিছুতেই সম্ভব নয়। চিরদিন যা চলে এসেছে তাই যে চিরদিনই চলবে, এমন কিছু কথা নেই।

তার পরের কথা, ব্যক্তিত্ব বস্তুটা আসলে কী?

অনন্তের সঙ্গে রহস্যময় সংযোগ ঘটলে মানুষ আপনার অন্তর্লোক থেকে আপনি উন্মোচিত হতে থাকে, তাই হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব। অনন্তের পরিচয়ে মানুষ আপনার পরিচয় পায়, আপনাকে জানে; নিজেকে প্রকাশ করবার আশ্চর্য কৌশলও সেখান থেকেই সে আয়ত্ত করে। মানুষকে যদি তার দারিদ্র থেকে, তার অজ্ঞানতা থেকে, তার তুচ্ছতা ও তার প্রত্যহের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিতে পারি তাহলে তাদের প্রত্যেকে অতি সহজেই আপনাকে প্রকাশ করবার স্বাচ্ছন্দ্য প্রেরণা পাবে। অনন্তের সঙ্গে সংযোগ সবচেয়ে সহজ হয়ে ওঠে যদি সেই মিলনের বাধাগুলো সব আগে দূর হয়,—তখন অনন্তের সহিত সাম্যযোগে প্রত্যেক মানুষই বিরাট, বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ; এবং প্রত্যেকের সমান। অনন্ত কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের একমালি সম্পত্তি নয়, তার অক্ষয় ভাণ্ডারে প্রত্যেক মানুষেরই সমান অধিকার; সাম্যবাদ মানুষকে আত্মার সেই ঐশ্বর্যলোকে নিয়ে যেতে চায়। এখন রবীন্দ্রনাথের মতো এক-আধ জন মানুষের সৃজনশক্তির যে অপূর্ব লীলা দেখে আমরা মুহ্যমান, সেই পরমা সৃজনীশক্তি (creative force) তখন সমস্ত মানুষের মধ্যে মুক্ত হবে। তার ফলে মানুষের সভ্যতা সেদিন যে কী রূপ, কী গতি ও কী বিপুল সার্থকতা লাভ করবে, আজ তার কল্পনা করবারও কারো ক্ষমতা নেই। অতঃপর এই কথা মহেন্দ্রবাবু দয়া করে মনে রাখবেন যে, প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তি হতে পারে, যদি তারা ব্যক্ত হতে পারে। এবং এই ব্যক্ত হওয়ার পথেই সাম্যবাদ মানুষকে নিয়ে চলেছে।

সাধারণ মানুষ ও সুপারম্যান

—"সুপারম্যান হচ্ছে সমস্ত মানুষের সাক্ষাৎ লাঞ্ছনা, তার অবনতির মূর্ত প্রতীক। তত্ত্বকথার ছলেই হোক, আর অস্ত্রশস্ত্রের বলেই হোক সমস্ত মানুষকে নিলডাউন করে রেখে নিজের উচ্চতা প্রদর্শনের প্রয়োগনৈপুণ্য যাদের, তারাই হচ্ছে সুপাম্যান। কিন্তু মানুষের এই স্পেসিস-এর লোপ আসন্ন হয়ে এসেছে, শীঘ্রই এরা মিসিং-লিংক-এ পরিণত হবে। সমস্ত মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ালে কারু মাথা কাউকে ছাড়িয়ে ওঠে না। সোস্যালিজম চায় সমস্ত মানুষকে সম্পূর্ণ করতে—সুপারম্যানের একজিবিশন খুলতে নয়।"

এই কথাগুলি আমার। পূর্বলিখিত 'সো-রোখা' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের গত ১৩৩৩ অগ্রাণের 'প্রবাসী'তে 'কাবুলিওয়ালা' নামক এক প্রবন্ধে আমার এই কথাগুলির প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করেছেন।

সুরেশবাবু তাঁর প্রবন্ধের গোড়াতেই "বড়বাজারের কাবুলিওয়ালা আর বোলপুরের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা মস্ত পার্থক্য" আবিষ্কার করেছেন;—তা এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে "আত্মানং বিদ্ধি'র বাণী সত্য, অপর পক্ষে কাবুলিওয়ালার কাছে ওর কোনো

মানেই হয় না।" সুরেশবাবুর "দিব্যানুভূতি" বিস্ময়কর, কিন্তু তিনি যত মস্ত মনে করেছেন পার্থক্যটা তত বড়ো নয়—আসলে পার্থক্যটা হচ্ছে এক সম্পূর্ণ ও এক অসম্পূর্ণ মানুষের মধ্যে। কাবুলিওয়ালার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নেই বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কাবুলিওয়ালা অবশ্যই আছে—কেন না সম্পূর্ণ হতে হলে অপূর্ণতার সব ধাপগুলিই পেরিয়ে আসতে হয়, একলাফে তা এড়িয়ে আসার যো নেই। একজন সম্পূর্ণ মানুষের, চেতনাতেই হোক আর অচেতনাতেই হোক, কাবুলিওয়ালা যেমন আছে তেমনি আদিম বর্বরেরও আসন রয়েছে। সুতরাং কাবুলিওয়ালাকে তিনি যে উপহাস করেছেন তার অনেকখানিই গিয়ে লেগেছে তাঁর তথাকথিত অসাধারণ মানুষদের গায়ে।

বিচার করে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাবুলিওয়ালার তফাৎ কোন্‌খানে? রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কি কাবুলিওয়ালা নেই? তিনি কি জমিদারি চালান না? প্রজাশোষণ করেন না? ব্যবসাবুদ্ধিতে তিনি কি কোনো কাবুলিওয়ালার চাইতে কম? তফাৎ শুধু এই, বেচারা কাবুলিওয়ালা শুধুই কাবুলিওয়ালা: অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ কাবুলিওয়ালা প্লাস 'আত্মানং বিদ্ধি' প্লাস আরো অনেক কিছু। রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ হবার সুযোগ পেয়েছেন, প্রেরণা পেয়েছেন ও সম্পূর্ণ হয়েছেন; কাবুলিওয়ালা তা পায়নি, তা হতে পারেনি কিন্তু কাবুলিওয়ালার মধ্যেও যে সম্পূর্ণ মানুষের সম্ভাবনা নিহিত আছে একথা কে অস্বীকার করবে? দু'শো বছর আগে বাংলার জমিদারেরা ডাকাতি করতো, তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সম্ভাবনা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কাবুলিওয়ালাই-বা এমন কী অপরাধ করলো যে, তার বেলা বিশ্ববিধানের অন্যথা ঘটবে? তবে সুরেশবাবু যদি মনে করে থাকেন যে, দু'-চার জন সুপারম্যানের চাকচিক্য দেখোবার জন্যে, বিশেষ করে সুপার-আস্তিকদের উপমার খোরাক জোগাবার খাতিরে কাবুলিওয়ালাদের চিরদিন 'কাবুলিওয়ালা' হয়েই থাকতে হবে, তবে সে কথা আলাদা!(১)

সবাই সুপারম্যান হবে—একথা সুরেশবাবু বলেন না, কেন না তাহলে সুপারম্যান কথাটির অনর্থ দাঁড়ায়! কিন্তু সকলেই সম্পূর্ণ হতে পারে, একথা আমি বলি। একজনের ধনী হ্‌তে হলে অনেককে দরিদ্র হতে হয় এবং নিজের বিভব বজায় রাখতে দরিদ্রের দরিদ্র করে রাখাই ধনীর একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি সুরম্যানকে অনেক খর্ব মানুষের অপেক্ষা রাখতে হয়, তা নইলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটে না। তাদের খর্ব রেখেই তাঁর গর্ব, তাঁর জৌলুষ, তাঁর জেল্লা—যেমন ইতালির বর্তমান সুপারম্যান। জায়েন্টের দেশে গিয়ে গালিভারের সুবিধা হয় নি, বামনের দেশে এসেই সে জেনেছিল এবং জানতে পেরেছিল যে সে সুপারম্যান।

কিন্তু মানুষ যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তার এ রীতি নয়। নিজে সম্পূর্ণ হতে হলে অপরকে অসম্পূর্ণ করতে হয় না, কেননা, অপরকে অসম্পূর্ণ রেখে নিজে পরিপূর্ণ হওয়া যায়

১। সুরেশবাবু তাঁর প্রবন্ধে বার বার রবীন্দ্রনাথকে টেনেছেন, এই হেতু প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে-আলোচনা বাধ্য হয়ে আমাকে করতে হলো, তার জন্য আমি খুশি নই। প্রবন্ধ-লেখকরা নিরুপায়, কেবল মধুপরিবেশনের জন্য তাদের নয়। সত্যের উন্মোচনের জন্য তারা দায়ী, এই কারণে যা সত্য বলে মনে করে অপ্রিয় হলেও তা প্রকাশ না করে তাদের উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার যে-একান্ত শ্রদ্ধা তা তিনি তথাকথিত সুপারম্যান বলে নয়, সম্পূর্ণ মানুষ বলে।' আমি তাঁকে এ যুগের সম্পূর্ণতম মানুষ বলে মনে করি। যিনি সম্পূর্ণ তিনি তাঁর সোনায় আর খাদে সমস্তকে নিয়ে সম্পূর্ণ; সম্পূর্ণভাবে তাঁকে সত্য করে দেখা, তাঁকে খাটো করে দেখা নয়।

না। একজন সম্পূর্ণ হলে তার সংস্পর্শে এসে অপর সকলে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবেই—যেমন এক প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপে আলো জ্বলে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সম্পূর্ণ—যেমন তাঁর কাব্যে, সেখানে তিনি অসংখ্যকে পূর্ণতার প্রেরণা দিয়েছেন, দিচ্ছেন; সেখানে তাঁর দান অফুরন্ত—তা যেমন অগোচর তেমনি অচিন্তনীয়; কিন্তু যেখানে তিনি সুপার যেমন-সোলপুরে সেখানে সবাইকে অবোলা রেখেই তাঁর বোল-বালাও! আশপাশের সকলে খর্বিত হয়ে আছে বলেই তিনি সুপার;—সেখানে তাঁর 'আত্মানাং বিদ্ধি' আর সকলের আত্মাকে এমনভাবে বিদ্ধ করেছে যে, তাঁর বনস্পতিত্বের আওতায় তাদের বৃদ্ধি কেবল অসম্ভব নয়, অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েচে। সুপারম্যানের আত্মা যে-ক্ষেত্রে সর্বনাশ আনে, কাবুলিওয়ালা তত উঁচুতে নাগাল পায় না, পাত্তাও পায় না। কাবুলিওয়ালা বড়জোর থলি ধরে টানে, কিন্তু সুপারম্যান টানে কান,—তার ফলে কেবল কানই যে বড়ো হয়ে ওঠে তাই নয়, মাথাও মারা পড়ে।

সুপারম্যান হ্রাওস বর হুম? আমি যদি বলি—হর নান বাট হিমসেলফ, তাহলে সুরেশবাবু মসী নিয়ে তাড়া করে আসবেন এবং অনেক বুলি অনেক বচন আওড়াবেন; সত্য যেন বাসের মাগনা আরোহী, অত্যন্ত কলরব শুনলে একান্ত সঙ্কোচে স্থান ছেড়ে দেন। শুনতে পাই সুপারম্যানেরা লোকগুরু, তাঁরা বিশ্বমানবকে উদ্ধার করতে আসেন; যদি তাই এসে থাকেন, তাহলে তাঁদের কাছাকাছি যাঁরা থাকেন সেই শিষ্য-সামন্তকে তো তাঁরা অতি সহজেই এবং অনেক আগেই উদ্ধার করতে পারেন। উদ্ধার অবশ্যি শিষ্যরা হন; কিন্তু গুরু যে-নৌকায় পার হন সে-নৌকা তাঁদের জোটে না, সুপারত্ব তাঁরা পান না, ডুবে পার উত্তীর্ণ হয় তাঁদের। কিন্তু তবু তাঁদের আহ্লাদের সীমা নেই, কচায়নের অন্ত হয় না; অপরিসীম এই পার উত্তরণে—গুরুর তাঁরা শিষ্য। কিন্তু হায়, গুরুর তাঁরা ততটা প্রিয়জন নন যতটা প্রয়োজনীয়। [শস্যকে আত্মসাৎ করে গরুর যেমন আত্মানাং বিদ্ধি এবং আত্মার শ্রীবৃদ্ধি, শিষ্যের সঙ্গে গুরুরও সেই সুচতুর কায়েমী সম্পর্ক। অভিধানে গো শব্দ নানার্থ, তার এক অর্থ হচ্ছে—সুপারম্যান।]

প্রশ্ন এই, গুরুজাতীয় অতি-মানুষেরা সাধারণ মানুষের কী প্রয়োজনে আসেন, কোন্ দায় থেকে বাঁচান? যে মানুষ পায়, সে নিজের কাছেই পায়, গুরুর কৃপায় নয়। যে নিজের কাছ থেকে পাবার কৌশল জানেনি সমস্ত পৃথিবী তার প্রতি কৃপণ। বুদ্ধ এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ক'জনকে দিয়ে যেতে পেরেছেন? মুসোলিনী চলে যাবেন, কিন্তু ইতালির সমস্ত ব্ল্যাকশার্টদের মধ্যে তাঁর মুষল ধরার মুরোদ থাকবে কার? ভাগ্যিস গুরুবংশে গুরুত্বর কিছু জন্মায় না, হয় তা লোপ পায়, নয় তো কল্কি হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু দৈবক্রমে গুরুরা যদি ধরাপৃষ্ঠে ধারাবাহিক বংশরক্ষা করতে পারতেন—পেতেন সে সুযোগ—তাহলে সেই বংশদণ্ডের মারে আর্ত-মানুষ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তো।

সুরেশবাবু পাতা ও ফুলের একটা উপমা দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ফুলকে ফুটিয়ে তোলা যেমন পাতার নিজের গরজ তেমনি সাধারণ লোকের কাজ হচ্ছে অসাধারণদের মাথায় তুলে নাচা। কেননা সুপারম্যানকে,

"তারা সার্থ করতে পারে একমাত্র নিজের মৃত্যুকে অঙ্গীকার করে।"

কেননা—

"বিশ্বমানবের যে সাধনা, সে-সাধনার সিদ্ধির অভিজ্ঞান কাবুলের সহস্র সহস্র কাবুলিওয়ালা নয়—সে সিদ্ধির অভিজ্ঞান হচ্ছে দু'-একটি রবীন্দ্রনাথ। ফুলগাছের ফুল

যেমন একটা পরম সত্য, অসংখ্য সাধারণের মাঝে মুষ্টিমেয় অসাধারণ তেমনি বিশ্বমানবের একটা পরম সত্য।"

—কিন্তু পরম মিথ্যা যা, উপমার চুমা দিলেই তা কিছু সত্য হয়ে উঠে না—বৃক্ষ জাতি আর মনুষ্য জাতির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, তা এই যে, বৃক্ষেরা এখনো মানুষ হয়ে ওঠেনি এই কারণে তাদের মাঝে যা সত্য মানুষের মাঝে তা সত্য নাও হতে পারে। এই হেতু, পাতার সার্থকতা যদি-বা ফুলেই, অসাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষের সার্থকতাও নেই, সান্ত্বনাও নেই! তাছাড়া মানুষের মধ্যে কারাই-বা ফুল কারাই-বা পাতা, আর তা বাছাই হবে কি করে এবং করবেই বা কে—এবং সেই বিচারের মধ্যে সত্য থাকবে কতটুকু? কেননা আজ যাকে মানুষের মধ্যে পাতা বিবেচনা করি কাল দেখি সে-ই ফুল হয়ে ফুটেচে।

তাছাড়া আরেক কথা। মানুষের মধ্যে যাঁরা সম্পূর্ণ হয়েছেন তাঁরা নিজের সাধনার বলেই হয়েছেন, অন্যের সাধনার ফলে হননি! নিজেকে সম্পূর্ণ করাতেই ব্যক্তির আত্মসিদ্ধি—মানুষ শুধু আপনাকেই সম্পূর্ণ করতে পারে। অপরকে খানিকটা ব্যর্থ করতে সে পারে হয়ত, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ করা তার আয়ত্তের বাইরে। সে বড়োজোর সম্পূর্ণ হবার প্রেরণা দিতে পারে কেবল, সম্পূর্ণ করতে পারে না। বিশ্বসুদ্ধ মানুষ সাধনা করে মোলো আর তার ফলে "সিদ্ধির অভিজ্ঞান-স্বরূপ দু'-একটি রবীন্দ্রনাথ" জন্মালেন, এতে রবীন্দ্রনাথের আত্মসাধনার যেমন সম্মান দিই না, বিশ্বমানবের সাধনারও (যদি বিশ্বমানবের সমষ্টিগত সাধনা বলে কিছু থাকে) তেমনি অপমান করি।

সুরেশবাবু বলেন,—

"মানুষের শক্তি-অভিযানের কোন্ পৈঠা পর্যন্ত উঠেছে, এই মুষ্টিমেয় অসাধারণ কয়জন তারই নিদর্শন।"

—বেশ ভালো কথা; আমি শুধু এই জিজ্ঞেসা করি, এই মুষ্টিমেয় অসাধারণের 'কষ্টস্বীকার' করে আসার ফলে সর্বসাধারণও কি আনন্দের উচ্চতর পৈঠায় উত্তীর্ণ হয় এবং এমনি করে এক সুপারম্যানের শ্রীচরণ থেকে পরবর্তী সুপারম্যানের শ্রীচরণে কিকৃত হতে হতে ক্রমশ সুপারম্যানত্বের গোলে গিয়ে পৌঁছায়?

সুরেশবাবু বলতে চান, হ্যাঁ। কেননা মানুষ "চির-অসম্পূর্ণ" সে কখনই সম্পূর্ণ হবে না, কেবল সুপার হতে সুপারতর হয়ে চলবে। "মানুষ অতি-মানুষ হতে চায়" এবং অতি-মানুষ সম্ভবত অত্যন্ত মানুষ হতে চান; সুরেশবাবুর মতে "এই হচ্ছে বিশ্বমানবের প্রগতির জীবন।" লেনিন সুপারম্যান, সুতরাং তাঁর আসার ফলে রাশিয়ার "বারো কোটি মানুষ" হয়তো "বারো কোটি লেনিনে পরিণত হবে" এবং তখনই সুরেশবাবু ধরে নিতে পারবেন যে "সুপার-লেনিনের আবির্ভাবের সময় হয়েছে।"

কিন্তু তাই কি হয়? মানুষের "প্রগতির জীবন" কি এমনিধারা নামতার পথেই? বুদ্ধের আসার ফলে কোটি কোটি লোক বৌদ্ধ হয়েছিল কিন্তু তাদের কেউ কি দ্বিতীয় বুদ্ধ হতে পেরেচে? সুপার-বুদ্ধ দূরে থাক, তাঁর তিরোধানের পরে এতদিনে আরেকজন বুদ্ধও কি গজালো আর?

বরং তার উল্টোটাই দেখলাম। বুদ্ধের তিরোভাবের পর বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের, শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে নেড়ানেড়ির দল। এই কি "বিশ্বমানবের প্রগতির জীবন, তার ক্রমশ উৎকর্ষের পথ, তার উচ্চ থেকে উচ্চতর সার্থকতার সাধনা?"

কিন্তু এমনই হয়। সুপারম্যানের সম্মুখে যারা নিলডাউন হয়ে থাকে, সুপারম্যান সরে পড়লেই তারা হামাগুড়ির লাভ করে। মেরুদণ্ডের যে স্বকীয় জোরে মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ক্রমাগত সাষ্টাঙ্গে সুপারম্যানের শ্রীচরণের ধুলো নিতে নিতে সেই জোরই-যে তাদের লোপ পেয়েছে! অসাধারণ মানুষ দেখলেই যাদের ঘাড় নীচু হয়ে আসে, তারা নিজেকে দেখতে পায় না এবং নিজেকে খাটো করে দেখে বলেই অপরকে অসাধারণ দেখে। আসলে অবনত মানুষদের মধ্যেই সুপারম্যান জন্মানো সম্ভব এবং তাঁর আবির্ভাবের ফলে তাদের কোনোই শ্রীবৃদ্ধি হয় না। তেমনিধারা তারা অবনতই থাকে। অপার মহিমার অন্তর্ধানের পরে যদি তাদের আরো বেশি অবনতি নিতান্তই না ঘটে, তবু তারা 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' থেকে যায়। এই কারণেই সুপারম্যান মানুষের অবনতির মূর্ত প্রতীক,—তার অবনতির প্রতিকার নয়।

কিন্তু সুরেশবাবুর ফরমাসমতোই যদি হোতো, যদি অসাধারণ মানুষের আবির্ভাবের ফলে সকলে অসাধারণত্বের "পৈঠায় পৈঠায়" উত্তীর্ণ হতে থাকতো, যদি বারো কোটি বুদ্ধ, বারো কোটি লেনিনে ভূ-ভারত আচ্ছন্ন হয়ে যেতো, তাহলে "তার চেয়ে আনন্দের ব্যাপার" নাকি আর কিছু ছিল না। কিন্তু আমি মনে করি, তাও যদি হোতো তার চেয়ে অবিমিশ্র ব্যর্থতার ব্যাপার আর কিছু ছিল না। কেননা অসাধারণ হয়ে, বিশেষ করে এক বিশেষ টাইপের ধারা ধারণ করে মানুষের কোনো সার্থকতা নেই। পৃথিবীতে একটি লেনিনেরই প্রয়োজন ছিল, বারো কোটি দূরে থাক দু'টি লেনিনই সেখানে বাহুল্য; মানুষ তো "পাতা আর ফুল" নয়, তাই তড়াগে হাজার হাজার অরবিন্দ ফুটতে পারে; কিন্তু মানুষের মধ্যে একটি অরবিন্দই যথেষ্ট। নিজেকে প্রকাশ করেই মানুষ কৃতার্থ হয়, অপর কাউকে কপি করে নয়। যতো বড়ো মহাত্মাই হোন তাঁর চরিত্রে দাগা বুলিয়ে খালি দাগা পেতে পারি; মহত্ত্ব পাইনে—মাহাত্ম্যও পাইনে।

অসাধারণ মানুষই-কিছু সম্পূর্ণ মানুষ নয়, একটা চোর একটা খুনেও তো অসাধারণ। সুপারম্যান হওয়াই মানুষের সাধনা নয়, মানুষের সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া। এই সাধনা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্ত ও অব্যক্ত চেতনায় অনুক্ষণ চলছে। এক টাইপের সম্পূর্ণতা সকলে লাভ করবে, তা কখনোই নয়। প্রত্যেকের সম্পূর্ণতার মধ্যেই বিশিষ্ট রূপ ও স্বতন্ত্র ছন্দ দেখা দেবে মানুষ পরিপূর্ণরূপে সম্পূর্ণ হবে, একথা সত্য, প্রতি পরবর্তী যুগেই আমরা পূর্ণতর মানুষ অধিকতর দেখতে পাবো—এবং তা অসাধারণদের মধ্যে নয়। অতি-সাধারণের মধ্যে। সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ হবে—এ যদি আজকের স্বপ্নও হয়, তাহলে কালকে এই-ই হবে অতি বাস্তবিক তথ্য।

পৃথিবীতে এখনো যে যুগ চলেছে তা এক্সপেরিমেন্টের যুগ। কিন্তু চিরদিন শুধু এক্সপেরিমেন্টই চলতে থাকবে, তার সম্পূর্ণতা আর ঘটবে না, এ কখনোই সত্য হতে পারে না; কেননা তাহলে এক্সপেরিমেন্টের প্রয়োজনকেই অস্বীকার করতে হয়। প্রকৃতি আদিযুগে জীবজন্তু নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, তার ফলে বালুচিথেরিয়াম, বাইসন, হিপোপোটামাস প্রভৃতি অতি-জানোয়ারেরা দেখা দিয়েছিল; এখন মানুষকে নিয়ে প্রকৃতির পরীক্ষা চলেছে তারই ফলে এখানে-সেখানে অতি-মানুষের আমদানি দেখা যাচ্ছে। এদেরও গতি ঐ বালুচিথেরিয়ামের পথেই। আসলে সুপারম্যানেরা হচ্ছে আজকের অসম্পূর্ণ অসুস্থ মানবতার রুগ্ণ লক্ষণ; তার রোগের বিচিত্র উপসর্গ;—মানুষ-যে সুস্থ হতে চাচ্ছে, এই উৎকট উদ্ভট চিহ্নগুলি তারই পরিচয়। মানুষ যখন সম্পূর্ণ হবে তখন তার মধ্যে

কোনো প্রকারেরই আতিশয্য থাকবে না; কেননা অভ্রভেদী কোনকিছু হয়ে ওঠা নয়। তখন তার মধ্যে শোভা পাবে একটা সহজ সঙ্গতি, স্বচ্ছন্দ সুষমা; শতদলের মতো সর্বতোমুখ পরিপূর্ণতা।

অত্যুচ্চ পাহাড়গুলো পৃথিবীকে সম্পূর্ণ করেনি—ওগুলো তার গর্বের নয়। তার সমতলতাই তার গৌরবের—কারণ তাই তাকে সম্পূর্ণ করেছে, সার্থক করেছে; সফল করেছে। পৃথিবীর সমতল হবার, একান্ত-চেষ্টারই পরিচয় ওই অসম পাহাড়গুলো—তার আদিযুগের জ্বলন্ত সাধনার বিষম নিদর্শন। কিন্তু পাহাড়েই যদি পৃথিবীর সৃষ্টি-নৈপুণ্য শেষ হোতো, তাহলে তার সেই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের লজ্জা পাহাড়কেও ছাপিয়ে যেতো।

রবীন্দ্রনাথই বলেন:

"আদ্যযুগের কীর্তিবলে পাহাড় হলো উচ্চ,
লক্ষযুগের স্বপ্নে এলো প্রথম ফুলের গুচ্ছ।"

পাহাড় বড়ো হতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, শেষও নয়। ফুলই সম্পূর্ণ। মানুষের মধ্যে শতদল ফুটতে যদি লক্ষযুগ দেরী থাকে তবে লক্ষযুগই দেরি আছে, কিন্তু তাই বলে একথা কিছুতে মানতে পারব না যে—আজকের পাহাড়ে-মানুষেরাই মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত এবং পাহাড়ের 'সারমন' মেনে চলা ছাড়া মানুষের সার্থকতার আর পথ নেই। কেননা মানুষ যখন সম্পূর্ণ হবে তখন আপনার অন্তর্লোক থেকে আপনি বিকশিত হয়েই হবে—পাহাড় ডিঙিয়ে বা পাহাড়কে টেক্কা মেরে নয়।

সুপারম্যানিয়া

পূর্ব প্রবন্ধের উত্তরচ্ছলে 'নবশক্তি'তে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় শ্রদ্ধাসহকারে আমার শ্রাদ্ধ করেছেন—অত্যন্ত সন্তর্পণে আমার প্রবন্ধের আসল কথাটি এড়িয়ে গিয়ে। আমার এই তর্পণে আমি তৃপ্ত। আমার বক্তব্য বাদ দিয়ে আমি-ব্যক্তিটি তাঁর প্রতিবাদের বিষয় হয়েছি, এমন কি তাঁর প্রবন্ধের শিরোনামাতেও আমারই অবস্থান! আমাকে তিনি ভুল বুঝেছেন—এ আমার গৌরব, আমার বক্তব্যকে তিনি ভুল বোঝাতে চেয়েছেন এ আমার আরো বেশি গৌরব।

পাটিগণিতের ধারায় সত্যকে যাচাই করবার আয়াস ও প্রয়াস সুরেশবাবুর রচনায় দেখা গেল। তিনি মুনিব্যক্তি, সুতরাং মতিভ্রম তাঁর হবে, এ আর বেশি কি! মুনিত্বকে অতিক্রম করার সাধ্য তাঁর নেই, জানি, তবু তাঁকে বলি—পাটীগণিতের মধ্যে সত্য থাকতে পারে, কিন্তু সত্য পাটিগণিতের ধার মাড়ায় না, সে-পাটই তার নয়! অঙ্কের মতো ছককাটা বাঁধা নকসায় পরিপাটি হয়ে দেখা দেবার তার কোনো গরজ নেই। সত্যেরই সেই সাহস আছে, পরস্পর-বিরোধীরূপে সে-ই দেখা দিতে পারে।

আমার মধ্যে mediocrity complex আছে এই কথাই সুরেশবাবু সযত্নে প্রমাণ করতে চেয়েছেন! এইজন্যই আছে, যেহেতু আমার উদ্ধারের জন্য কোনো সুপারম্যানের কাছে ঊর্ধ্বনেত্রে যুক্তকর হতে আমি প্রস্তুত নই। আমার জন্য তো নয়ই—মানুষের জন্যও না। পেতে হলে যেখানে থেকে পেতে হয়, এমন কি সুপারম্যানকেও, আমার অপরাধ, আমি সেখানেই হাত পেতেছি; অনন্তের অন্তর ও অন্তরের অনন্ত যেখানে এসে মিলেছে, সেইখানে। যেখানে কোনো সুপারম্যানেরই একচ্ছত্র নয়, সব মানুষেরই

সমান অধিকার, যেখানে যেতে হলে নিজেই যেতে হয়, সুপারম্যানের হাত ধরলে চলে না। এ যদি আমার mediocrity complex হয়, তাহলে সুরেশবাবুর যে-অবস্থা তাকে বলবো mediocrity simple.কেন না চিরদিনই mediocre লোকেরাই তরে যাবার ভরসায় সুপারম্যানের দোরে ধর্না দিয়ে থাকে। কিন্তু কাঁধে চেপে যে চলে, সে-যে চলে, একথা বলি কি করে—হলোই বা সেটা সুপারম্যানের বা শ্রীঅবতারের শ্রীকাঁধ!

সুরেশবাবু আমার প্রবন্ধ পড়ে আবিষ্কার করেছেন যে আমি নাকি "প্রাণপণে কাবুলিওয়ালত্ব অর্থাৎ সাধারণ-মানুষত্বকে ছাড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করচি!" তিনি প্রচণ্ড ভুল করেছেন, সেরকম দুর্লঙ্ঘন-স্পৃহা আদপেই নেই আমার! আমার ধাতুতেই তা নেই। আর, ন্যাজ যদি ভেতরে না থাকে, কারু সাধ্য কি তাকে টেনে বার করে? নিজের যোগবলেও নয়, অপরের বলযোগেও না, এমন কি, তা সুপারম্যানেরও আকর্ষণ-শক্তির বাইরে!

মানুষের জন্য আমি দাঁড়িয়েছি, একথা বললে স্পর্ধার মতো শোনাবে, তা আমি বলিনে; কিন্তু মানুষের মধ্যে আমি দাঁড়িয়েছি, এই কথাই আমি বলতে চাই। কাবুলিওয়ালা কেন, ক্যানিবলকেও ছেড়ে উঠতে আমি রাজি নই—তাদের নিয়ে উঠতেই আমি চাই। পাশাপাশি বাস করেও একদল মানুষ আরেক দলকে যে ছেড়ে উঠেচে, এটাই মানুষের লজ্জা—যারা ছেড়ে উঠেচে এবং যাদের ছেড়ে উঠেচে, উভয়েরই! এইখানেই পশুর কাছে মানুষের পরাজয়।

কিন্তু ছেড়ে উঠলেই কি ছাড়িয়ে ওঠা যায়? সুপারম্যানেরও ভেতরে সেই কাবুলিকে দেখি, ক্যানিবলকেও দেখি।

সেকালের মহাপুরুষেরা সঙ্ঘ, মঠ, প্রভৃতি গড়তেন, একালের মহাত্মারা গড়েন আশ্রম, আড্ডা, অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি। নানা আকারে ও প্রকারে বিচিত্র তাঁদের এই আশ্রম-রচনার মূলে কী? নানান তত্ত্বকথার আড়ালে—নামান্তরে আর রূপান্তরে—সেই মৌলিক ক্ষুধা। গ্রেট্ ক্যানিবল-ইনস্টিঙ্কট। শিকারের সন্ধানে বাইরে না গিয়ে আশ্রম-মৃগয়া করার সুপারম্যানুভার! ক্যানিবল মানুষকে উদরসাৎ করে, সুপারম্যান করেন আত্মসাৎ। আমি যখন বলেছিলাম যে, superman stands for none but himself, তখন তাঁর self থেকে spiritual উদরকে আমি বাদ দিই নি। কিন্তু সুরেশবাবু আমাকে একটি "মজার কথা" শুনিয়েছেন, সেটি এই যে, "মহাপুরুষদের standing for themselves is the best and effective way of standing for others.

অর্থাৎ, বক যখন পুকুরপাড়ে দাঁড়ায় তখন সে নিষ্কাম চিত্তে নিজের জন্য দাঁড়ায় বললে ভুল বলা হবে, সে মাছের জন্যও দাঁড়ায় বটে! গরুকে দেখলে শস্য গদ্গদ হয় কিনা জানিনে, কিন্তু গুরুকে দেখে শিষ্য আত্মহারা! কালের কুটিল গতি—সেকালের মহারথীরা অশ্বমেধ করতেন, একালের অর্ধরথীদের গর্দভমেধেই আনন্দ!

সুরেশবাবু বলেচেন যে, "আমার সুপারম্যানের আইডিয়ার সঙ্গে নিট্‌শে কিম্বা বার্নার্ড-শ" কিম্বা শ্রীঅরবিন্দ—এঁদের কারো সুপারম্যানের আইডিয়াই মেলে না।"

এবং সেই সঙ্গে যেটা বলেন নি সেটা হচ্ছে যে তাঁর সুপারম্যানের আইডিয়ার সঙ্গেও মেলে না! কিন্তু তিনি ভুলে যাচ্ছেন, সুপারম্যানের আইডিয়াই আসলে আমার নয়, সে-আইডিয়া তাঁর। এবং তাঁর সুপারম্যানের আইডিয়ারই আমি প্রতিবাদ করেচি—নিট্‌শে, বার্নার্ড-শ' বা শ্রীঅরবিন্দের আইডিয়ার কথাই এখানে ওঠে না। আমি সুরেশবাবুকে স্বতন্ত্র

Idealist বলে মনে করেছিলুম, তিনি যে নিট্‌শে, বার্ণার্ড-শ' বা শ্রীঅরবিন্দের Idea-List-মাত্র একথা কে জানতো?

এখন সুরেশবাবুর সুপারম্যানের আইডিয়াটা কী?...না, "অসংখ্য সাধারণের মাঝে মুষ্টিমেয় অসাধারণ"....(...প্রবাসী, অগ্রহায়ণ) ইংরেজিতে যার অর্থ হবে Outstanding Personalities. আমি বলতে চেয়েছি যে, এই Outstanding Personalities-রা যতই astounding হোন না, ব্যক্তি হিসেবে অসম্পূর্ণ; অভিব্যক্তির দিক থেকেও উৎকৃষ্ট নন, এমন কি সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে, এখনও বলতে পারিনে। ভবিষ্যতের সুপারম্যানেরা কী হবে তা এখনকার কল্পনামাত্র, তার ছায়ার সঙ্গে আমার লড়াই নয়। অতীতের বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য যদি সুপারম্যান হয়ে থাকেন, তো হয়েছেন, তা নিয়েও আমার কোনো মাথাব্যথা নেই; কেবল, আজকের জগতে প্রয়োগনিপুণ যেসব মানুষ সর্বসাধারণকে খর্বিত রেখে গর্বিত, সবাইকে খাটো করে নিজেদের বড়ো করতে চাচ্ছেন, আমার লড়াই তাঁদের সঙ্গেই। এবং তাঁদের যাঁরা কলমের জোরে জাহির করতে যাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গেও বটে।...সে যুগে মহম্মদ হজরত ও নেপোলিয়ানকে তলোয়ারের জোরে দাঁড়াতে হয়েছিল; এ যুগের সুপারম্যানের অনুচরেরা কলমকেই হাতিয়ারের কাজে লাগিয়েছেন! কিন্তু লেখনী হচ্ছে এমন তলোয়ার আর দু'ধারে ধার, চালাতে না জানলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারতে গিয়ে সুপারম্যানকেই মেরে বসে কিম্বা নিজেকেই জখম করে। অক্ষম হাতের অস্ত্রের বিপদই এই! তবে কিনা, নিজের নাক কেটেও অপরকে নাকাল করা যায়...সেটাও একরকমের উদ্ভাসিকতা। তাতেও একটা আনন্দ আছে।

সুরেশবাবু নেপোলিয়নকে সুপারম্যান মনে করেন। অথচ তাঁরই হিসাবমতে, নেপোলিয়ন যদি হয়, মুসোলিনীই বা না হবে কেন? এবং হাজাইসাকোই বা কী অপরাধ করলো? সুরেশবাবু নিজেই-বা কেন বাদ যাবেন? তিনিও তো "মুষ্টিমেয় অসাধারণের" মধ্যেই? যদিচ এ আশঙ্কা আমার থাকবেই যে, আত্মশ্রমযুগ প্লাস হিজ মাস্টারস ভয়েস প্লাস নাথিং এল্‌স্‌ আত্মশ্রমযুগয়ার পক্ষে যার-পর-নাই হলেও, হয়তো সুপারম্যান হবার বেলায় যথেষ্ট নয়। কিন্তু নাই হলো, সুপারম্যানিয়ার যোগ ধরতে তাই ঢের।

সুরেশবাবুর অসাধারণত্বের আরেকটি পরিচয় আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেটি হচ্ছে এই, আমার যে সব মত তিনি মানতে বাধ্য হয়েছেন সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন আমিই নাকি তাঁর সঙ্গে 'একমত' হয়েছি! যেমন, প্রবাসীর "কাবুলিওয়ালায়" তাঁর মত ছিল যে—

"রাশিয়ার বারো কোটি লোক যেদিন বারো কোটি লেনিন হবে সেদিনই সুপার-লেনিনের আবির্ভাবের সময় হবে।"

সে সময়ে রাশিয়ার বারো কোটি লোকের লেনিনত্বে—লেনিন হওয়ার সার্থকতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল।

আমি তাঁর সঙ্গে 'একমত' হয়ে জানালুম যে ইতিহাসে এর নজির নেই। বুদ্ধের জন্মের পর হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, কোটি কোটি বুদ্ধ দূরে থাক, দ্বিতীয় একটা বুদ্ধই এতদিনে গজালো না, সুপার-বুদ্ধ তো পরের কথা! বুদ্ধের বারো কোটিতম সংস্করণ নাই হোক, কারু পক্ষে যদি এতদিনে আট আনা সংস্করণের বুদ্ধ হওয়ায় সম্ভব হোতো, সুরেশবাবু আজ আহ্লাদে আটখানা হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতেন! কিন্তু সেই আটখানা বুদ্ধের খোল আনাই যে ব্যর্থ হয়েছে তার অপরিসীম ট্র্যাজিডি সুরেশবাবুর অতিবুদ্ধিকে আঘাত করতো না।

আমি প্রশ্ন করেছিলুম—"বুদ্ধ আসার ফলে কোটি কোটি লোক বৌদ্ধ হয়েছিল কিন্তু তাদের কেউ কি দ্বিতীয় বুদ্ধ হতে পেরেছে?"

এর জবাব না দিয়ে সুরেশবাবু পাল্টা প্রশ্ন করেছেন—

"বুদ্ধ আসার ফলে তাঁর সাধনা, তাঁর উপলব্ধ জ্ঞানের ফলে বিশ্বমনের—মানব সভ্যতার কি কোনো লাভই হয় নি?

এ প্রশ্নই এখানে অবান্তর। মানব সভ্যতার লাভালাভের কথা নয়, এখানে কথা হচ্ছে মানুষের সুপারম্যান হওয়ার। সুরেশবাবুর ধারণা অনুসারে বুদ্ধের আসার একমাত্র সার্থকতা হচ্ছে সকলকে, অন্তত‌পক্ষে জনকয়েককেও বুদ্ধত্বে উপনীত করা, যার ফলে সেই সকল বা সেই কয়েকজন বুদ্ধের ভেতর থেকে সুপারবুদ্ধ উত্তীর্ণ হতে পারেন। কিন্তু দেখা গেল, বুদ্ধ তাঁকে শোচনীয়ভাবে-হতাশ করেছেন, এমন কি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন—একথা বললেও বেশি বলা হবে না!

এক জায়গায় সুরেশবাবু কিছুতেই আমার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। সেটা পাটীগণিতের ব্যাপারে: সেখানে তাঁর "স্কুল-মাস্টারী"-বিদ্যে তাঁর অমানুষিক বুদ্ধিকেও টেক্কা দিয়েছে! তাঁর প্রশ্ন হচ্ছে—পঞ্চাশ টাকা ও হাজার টাকা সমান কিসে? টাকার মূল্য যে আপেক্ষিক, এটাও কি সুরেশবাবুকে বোঝাতে হবে? দশ টাকার পুঁতির মালা দিয়ে আফ্রিকার পল্লীতে যদি হাজার টাকার গজমোতি মেলে, তখন কি বলবো না যে দশ টাকার মূল্য সেখানে হাজার টাকার সমান? একপাউণ্ড দিলে সেদিনও বিশ হাজার মার্ক মিলতো! বর্তমান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে হাজার টাকার দিয়ে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমরা পাই, ভাবী কোনো শ্রমতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কানাকড়ি না দিয়েও সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আমরা সমানাধিকারী হতে পারি।

টাকার মূল্য আপেক্ষিক বটে, কিন্তু মানুষের মূল্য আপেক্ষিক নয়। অন্য কারো বা কিছুর সম্পর্কে তার মূল্য নির্ভর করে না, করে তার নিজের ওপর। পাটীগণিতের ফরমূলা দিয়ে মানুষের সত্যের প্রমাণ হয় না, পরিমাণও হয় না। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের সমান—অঙ্ক-যোগে নয়, অনন্তের যোগাযোগে। এই অনন্ত সুপারম্যানের এক্তিয়ারে নেই যে তিনি উইল করে দিলেই আর সবাই পাবে। এ আছে প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এবং একে পেতে হবে পরের সুকৃতিতে নয়, নিজের স্বী-কৃতিতে। নিজের কৃতিত্বে।

আমি বলেছি সম্পূর্ণ মানুষে ও অসম্পূর্ণ মানুষে তফাৎ বেশি নয়। সেই কথাই আমি আবার বলছি। সম্পূর্ণ মানুষ সাধারণ মানুষেরই একজন। সম্পূর্ণ মানুষ ও অসম্পূর্ণ মানুষের মধ্যে সেই সম্বন্ধ—গাছের সঙ্গে বীজের যে-সম্বন্ধ, তার মধ্যে পার্থক্যও যতখানি, ঐক্যও ততখানি। বীজ তার সম্ভাবনা নিয়ে সম্ভাবিত গাছের সমান। গাছের মধ্যে যে অনন্ত সফল হয়েছেন, বীজের মধ্যে তিনিই প্রচ্ছন্ন। বীজ সাফল্যের জন্যে প্রতীক্ষমাণ। যে মুহূর্তে বীজ অনন্তের যোগে আপনাকে প্রকাশ করতে সুরু করবে, সেই মুহূর্ত থেকেই সে গাছের সগোত্র।

কিন্তু পাটীগণিতের সুরেশবাবু এই বীজগণিতে ঘাড় নাড়বেন, কেননা তাঁর vision যেমন অসাধারণ তেমনি ভীষণ। যে অঙ্কুর বাড়ছে সে এত অগোচরে বাড়ছে যে, তার সেই বাড়, বর্ধিত গাছের পাশে তাঁর স্থূলদৃষ্টিতে পড়বেই না, কেননা তাঁর হচ্ছে সেই চোখ, যে চোখে তিনি মানুষের মধ্যেও ভেড়া দেখেন! মানুষের মধ্যে ভেড়াও হয়তো আছে, তার সাথে মানুষও আছে; কিন্তু কামাখ্যায় গিয়ে সুপারউওম্যানের পাল্লায় পড়ে

যে simple মানুষ ভেড়া হয়, সে অসাধারণ হয়ে দাঁড়ায় দুনিকেই। সাধারণ মানুষ বলে তাঁর অপমান করা যায় না, অথচ তাঁকে সাধারণ ভেড়া বললে নেহাৎ ভেড়াদের মানহানি ঘটে।

তাহলেও সুরেশবাবু গণিতজ্ঞ লোক। কাবুলিওয়ালা প্লাস অনন্ত ইজ ইকুয়াল টু রবীন্দ্রনাথ প্লাস অনন্ত, অন্তদৃষ্টির দ্বারা না হোক, অঙ্কদৃষ্টির সাহায্যে তিনি বুঝতে পারবেন। কেননা, "স্কুলমাস্টারেরা" গণিতটাই ভালো বোঝে—গণনা দ্বারা গণ্য করতে পারাটা লঘু-চেতনার পক্ষে প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা কিনা!

তবু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাবুলিওয়ালার তফাৎ আছে—আর সে তফাৎ সামান্যই। তা হচ্ছে এই, রবীন্দ্রনাথের সহিত অনন্তের যোগ সহজ ও সত্য হয়েছে, কাবুলিওয়ালার সহিত তা হয় নি। তার যে অনন্ত ঐশ্বর্য আছে, একথা কাবুলিওয়ালা জানেই না। কিন্তু যে মুহূর্তেই সে জানবে, সেই মুহূর্তেই সে তার অধিকারী হবে। সুতরাং যে তফাৎটুকু দাঁড়াচ্ছে সে তফাৎটুকু হচ্ছে মুহূর্তের—পরশমণির সামনে দাঁড়িয়ে সোনার সঙ্গে লোহার যে তফাৎ।

কিন্তু এই জানার একটা বাধা আছে। তা এই, ক্ষুধাতুর ক্ষুণ্ণমুখ মানুষকে কিছুতেই অনন্তের দিকে উন্মুখ করানো যায় না। এইজন্যই, মানুষের আত্মিক প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা তার আর্থিক স্থিতি। রবীন্দ্রনাথ যে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছেন, তার মূলে শুধুই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নেই একথা সত্য, কিন্তু একথাও তেমনি সত্য যে, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে পারতেন না। মনে করা যাক, রবীন্দ্রনাথকে ছোটোবেলায় কেউ চুরি করে নিয়ে চা-বাগানে বিক্রি করতো, তাহলে আজ চা-পাতার চয়নিকা করেই তাঁর কাল কাটাতে হোতো। এই রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেতুম না।

রবীন্দ্রনাথ না এলে আমাদের সমাজ কতটা অসম্পূর্ণ থাকতো তা আমরা কল্পনা করতে পারি এবং কল্পনা করে ভীত হই। কিন্তু সমাজের বিরাট অসম্পূর্ণতার তুলনায় এ ভয় সামান্যই। কেননা রবীন্দ্রনাথের মতই সম্পূর্ণতার অধিকারী এমন শতকোটি মানুষ আজ অপ্রকাশিত রয়েছে, যারা না প্রকাশ পেলে মানুষের সমাজ কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না। হবার নয়।

বুদ্ধ থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত প্রত্যেক মহাত্মাই মানুষকে আত্মার মুক্তি দিতে এসে ব্যর্থকাম হয়েছেন, কিন্তু লেনিন এইজন্যই কৃতার্থ যে, তিনি জেনেছিলেন ও জিনিষ কারুর হাতে তুলে দেওয়া যায় না, যেহেতু ও সবার হাতেই রয়েছে। তিনি করে গেছেন সবার ভাতের ব্যবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, না খেয়ে শুকিয়ে মলেও ভেবো না, কেননা ওতে দেহই শুকোবে ; তোমার আত্মার শুষ্কতা নেই! কিন্তু লেনিনই প্রথম এসে বললেন, দেহই বা শুকোবে কেন ? তারই আপ্যায় হওয়ার দরকার—হওয়ার সার্থকতা যে-দেহী যে-বিদেহী তার নয়।

এইজন্যই, আত্মবাদী হয়েও সাম্যবাদী হতে আমার বাধে না। এইজন্যই, আত্মার ব্যাপারে, আত্মীয়তার ব্যাপারে ও আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে চরম individualist হয়েও Proletariat-এর Dictatorship পর্যন্ত মেনে নিতে আমি প্রস্তুত। কারণ আমি জানি সমানাধিকারবাদই মানুষকে মুক্ত করবে দেহের ক্ষুধা থেকে, আত্মার ক্ষুধার দিকে—সমস্ত মানুষের আত্মপ্রকাশ তখনই সহজ ও সম্ভব হবে। কেননা ক্ষুধার দাবীর কাছে যদি অনন্তের ভাঁড়ারঘর না উন্মুক্ত হয়, সুপারম্যানের তাঁকে তার চাবি নেই।

সুপারম্যানের ধ্যান ভাঙতে গিয়ে সুরেশবাবু সাম্যবাদের অশিবের গীত গেয়েছেন। তাঁর লেখায় বাহাদুরিটা চমৎকার! কোনো vital point-এ তাঁকে চ্যালেঞ্জ করলে সেখান থেকে তিনি সরে পড়েন, অবশেষে একটা সাধারণ বা clause-এর গলিপথ দিয়ে ঘুরে এসে পাল্টা আক্রমণ লাগান—গরল-উদ্গারের তাঁর এই সাহিত্যিক গরিলা-যুদ্ধটি বেশ। কোনো উপলক্ষে আমি বলেছিলুম : "সত্যিকারের অভিনেতা বাংলার স্টেজে একটি নেই, তা আছে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে ; তেমনি সত্যিকারের যাঁরা পলিটিশিয়ান তাঁরা হচ্ছেন আজকের সাহিত্যিক। এক্সপ্লয়টেশন, ইন্ট্রিগ, ডিপ্লোম্যাসি—কিছুতেই তাঁরা কম যান না : বিশমার্কের উপরে তাঁরা, তাঁরা বাইশমার্ক।" এখন দেখছি যুদ্ধবিদ্যাতেও তাঁরা কম পারদর্শী নন। কোথায় ছেড়ে কোথায় শত্রুকে বিদ্ধ করতে হবে, সুরেশবাবু তাতে সিদ্ধহস্ত। Marx-এর সঙ্গে বিরোধ থাকলেও Marksman হতে তাঁর বাধে নি।

কিন্তু যতই Valour তিনি দেখান না, সাহিত্যিক 'ভি-ভ্যালেরা' তিনি নন। তাই ফাঁস থেকে মাথা বাঁচাতে গিয়ে ফাঁদে পা দিয়ে বসেন! 'প্রবাসী'র প্রবন্ধে তাঁর mood ও তাঁর voice থেকে বোঝা শক্ত ছিল না যে তিনি Superman কথাটিকে যে ভিত্তিতে ব্যবহার করেছেন তা Comparative অর্থাৎ Superman থাকলে অনিবার্যরূপে lesserman-ও থাকবে।

আমি বলেছিলুম—না। সমস্ত মানুষই সম্পূর্ণ হবে। "সম্পূর্ণ মানুষ" বলতে এখানে ধরা যাক যে তারা superior type-এর মানুষ ; কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো স্তর-বিভাগ থাকবে না—আর্থিক জগতেও না, আত্মিক জগতেও না।

সুরেশবাবু বলেন—সে কি কথা! যে গান গায় আর যে কয়লা সরবরাহ করে, তারা কি এক স্তরের হতে পারে? এ অসাম্য থাকবেই।

তার জবাব অবশ্যি এই—যে গান গায়, পালা করে সে যদি কয়লা যোগায়—যোগান দিতে বাধ্য হয়—তাহলে যে কয়লা যোগাতো সেও গান গাবার ফুরসৎ পাবে।

সুরেশবাবু বলেন—তা হতেই পারে না। Lesserman-দের থাকতেই হবে, "কেননা পাতার সার্থকতা যেমন ফুলে, তেমনি সাধারণ মানুষের সার্থকতা অসাধারণ মানুষে।"

আমি বলি—মানলুম পাতার সার্থকতা ফুলে, কিন্তু সেইখানেই শেষ কথা নয়। ফুলের সার্থকতা আবার ফলে, ফলের সার্থকতা বীজে, বীজের সার্থকতা গাছে এবং গাছের সার্থকতা আবার পাতায়! কিন্তু মানুষের বেলা?

এর উত্তরে সুরেশবাবু কিছু বলেন না ; তবে যে-কথা বলতে চান তা হয়ত এই যে, সাধারণ মানুষের সার্থকতায় সুপারম্যানের স্বার্থ কোথায়? অতএব বুঝতে হবে সুপারম্যানের সার্থকতাতেই হতভাগ্যদের স্বার্থ। কেননা "সুপারম্যানকে তারা ব্যর্থ করতে পারে একমাত্র নিজের মৃত্যু অঙ্গীকার করে।" (কাবুলিওয়ালা, প্রবাসী)। অতএব কোনোরকমে বেঁচে থাকতে হলে কায়-মন-প্রাণ দিয়ে অসাধারণ মানুষদের সার্থকতার ইন্ধন তাদের যোগাতে হবেই।

আমি এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলেছিলাম। অসাধারণ মানুষে সাধারণের সার্থকতা থাক বা না থাক, অসাধারণ মানুষের সার্থকতা হচ্ছে অবনত ও অসম্পূর্ণ মানুষে। কেননা সুপারম্যান কথাটা আপেক্ষিক—এজন্যই সুপারম্যানকে lesser-man-এর অপেক্ষা রাখতেই হয়। যেমন ফুলকে পাতার।

সুরেশবাবু বলেন—"ফুল গাছের ফুল যেমন একটা পরমসত্তা, অসংখ্য সাধারণের মাঝে মুষ্টিমেয় অসাধারণ তেমনি বিশ্বমানবের একটা পরমসত্তা।

অর্থাৎ তাঁর মতে, সুপারম্যানশিপের পরীক্ষায় পাশ করবে অতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন, আর সাধারণ লোক চিরদিন অত্যন্ত সাধারণভাবেই ফেল করতে থাকবে। তাদের পরীক্ষার খাতায় পাতায় পাতায় যে ফুলিশনেস—সেটা থাক—থাকা ভালো—চিরদিনের জন্যেই। কেননা সেটা তাঁর কথিত মহৎ সত্যকেই সপ্রমাণ করে। আর সেই প্রমাণের জন্যই তার থাকার দরকার। পাতাবাহারীর মধ্যেই তো ফুলের বাহার!

কিন্তু এ কী? "নবশক্তি"র প্রবন্ধে দেখি, তাঁর সে-ধারণা যেন বদলেচে। তিনি বলেচেন—"শিবরামবাবু বলেন (সমস্ত) মানুষ "সম্পূর্ণ মানুষ" হবে; আমি বলি (সমস্ত) মানুষ অতিমানুষ (অর্থাৎ Superman) হবে।"*

তাই যদি হয় তাহলে ত সব অনর্থ ঘোচে—অবশ্য "সুপারম্যান" কথাটির অনর্থ বাদে! এই কথা গোড়ায় স্বীকার করলেই তো হোতো—এ অনর্থক কচায়ন তবে কেন? "বিশ্বমানবের একটা পরমসত্তা" যে তিন হপ্তার নোটিশে সুরেশবাবুর মাথা vacate করে চলে গেল, এতে পরম সত্যেরও নিষ্কৃতি, বিশ্বমানবও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, আমিও বাঁচলুম! তবু এই ক্ষোভ আমার "সুপারম্যানকে" মেরে সুরেশবাবুর না বাঁচাই যেন ভালো ছিল!

অবশেষে সুরেশবাবুর প্রতি আমার এই নিবেদন, তিনি ফুলের কথাই যেন ভাবেন, পাতার সার্থকতার জন্য দুশ্চিন্তা যেন তাঁর না হয়—কেননা তার চেয়ে গুরুতর calamity পাতার আর কিছু হতে পারে না। আমি তাঁকে এই কথা বলি—ফুলে নয়, পাতার সার্থকতা মেলে,—তা শ্রীকৃষ্ণ থেকে সুরু করে সেদিনের লয়েড জর্জ পর্যন্ত -না- কথায় -যা হয় কাজে বলে এসেছেন।—আর, সেই কথায় ভরসা করে চিরদিনই তারা সুপষ্ঠ চক্রে বা চক্রান্তে মরে এসেছে—সুরেশবাবু তাদের নতুন করে আর বেশি করে নাই মারলেন! মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা-র কী দরকার?

মানুষের সম্পূর্ণতা বলতে আমি কী বুঝি এবার সেই কথা। সেই কথাটা সম্পূর্ণ করে বলা এখানে সম্ভব নয়, তার ইঙ্গিতটুকু কেবল আমি দেবো। কী করে এই সম্পূর্ণতা মানুষ লাভ করবে তারও আলোচনা এখানে নয়।

মানুষের সম্পূর্ণতার গোড়ার কথা তার দেহ মন ও বুদ্ধির পূর্ণতা। আমরা এমন মানুষ দেখেচি (মানুষ বলতে নরনারী উভয়কেই ধরা হচ্ছে) যার দেহ অপূর্ব—কিন্তু মন ও মস্তিষ্ক অপরিণত; এবং এমন অসাধারণ বুদ্ধিমান দেখেছি যার মন বলে বালাই নেই; আবার এমনও মনীষী হৃদয়বান দেখা গেছে যাঁকে রূপবান বলা আদপেই চলে না। এঁরা কেউই সম্পূর্ণ মানুষ নন; কেননা মানুষ যদি দেহে সুন্দর, মনে সরস এবং বুদ্ধিতে বিচারক্ষম—এককথায় দেহ-মন-মস্তিষ্কে সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে সে কিছুতেই প্রকাশে ও অবকাশে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সার্থক করতে পারে না—নিজেকেও না অনন্তকেও না, নিজের কাছের অপর কাউকেও নয়।

---

*। "সমস্ত" কথাটা আমার যোগ করা, কেননা যখনই আমি "মানুষ" বলি, "সমস্ত মানুষের" কথাই বলি। সুরেশবাবু হয়তো মানুষ বলতে তাঁর মতই দু'-চারজনা আর তাদের ভাইবেরাদরকেই বোঝেন—কিন্তু তাহলেও, সেই বেড়া ভেঙে তাঁকে এখানে সমস্ত মানুষের যোগও-এর মধ্যে আনা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে কেন সম্পূর্ণ বলি, এখন সেই কথাটা স্পষ্ট হবে। তিনি সম্পূর্ণ—তাঁর দেহের রূপে, তাঁর মনের সরসতায়, তাঁর বুদ্ধির বিচারশীলতায়। তাঁর কবিতার জন্য তিনি সম্পূর্ণ নন—তাঁর কবিতার চেয়ে তাঁর জীবন বড়ো, তিনি কবিতা না লিখলেও পারতেন। তবু তিনি কবিতা লিখলেন কেন? তাঁর সম্পূর্ণতার স্বাদ সবাইকে দেবার জন্য। তাঁর মতই সম্পূর্ণ হবার প্রেরণা সব মানুষকেই দিতেই। এই জনাই তাঁর কবিতার সার্থকতা—এবং এই-সার্থকতাই পৃথিবীর সমস্ত শিল্পরচনার ও সৌন্দর্য-সৃষ্টির। যেদিন পৃথিবীর সব মানুষ সম্পূর্ণ হবে সেদিন কবিতা লেখার প্রয়োজন থাকবে না, এবং আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি সেদিন কেউ কবিতা লিখবেও না। যেহেতু তখন তারা জীবনের স্বপ্ন না দেখে জীবন-যাপন করবে। তাদের জীবনই হয়ে উঠবে কবিতা।

সম্পূর্ণতার আসল কথা হচ্ছে সঙ্গতি, সামঞ্জস্য—সুতরাং "কোনো-কিছুরই আতিশয্যের" সেখানে ঠাঁই নেই—একথা বোঝা তেমন কঠিন নয়। কারো যদি মাথাই না থাকে, তাকে আমরা সম্পূর্ণ বলবো না, তেমনি কারো যদি কেবল মাথাটাই থেকে থাকে, তাকেই বা সম্পূর্ণ বলি কী করে? অবশ্য তাকে "অসাধারণ" বা "অতি-মানুষ" বলতে আমার বাধা নেই। অতিশয় পেটমোটা বা অত্যন্ত মাথা-মোটা লোক দেখলে আমাদের হাসি পায়। আতিশয্য জিনিষটাই হাস্যকর—এবং প্রত্যেক হাস্যকর বস্তুর মতো এরও গভীরতায় ব্যর্থতার কারুণ্য।

আমি বলছি সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ হলেও তাদের প্রকাশে বৈচিত্র্য থাকবে। সুরেশবাবুর সমস্যা—তা হয় কী করে?

প্রথমে দেহের কথাই ধরি। আমি অনেক রূপ দেখেছি—যারা প্রত্যেকেই পরম সুন্দর—কিন্তু দুটো একরূপ দেখিনি। আগামী কাল প্রভাতে যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সুন্দর হয়ে ওঠে, তখনও দেখা যাবে তাদের সৌন্দর্যের মধ্যে সাম্যও যতখানি, বৈচিত্র্যও ততখানি। দেহের প্রকাশে যা সত্য, মনের ও বুদ্ধির প্রকাশের বেলাও তাই—একই সত্য স্বপ্রকাশ; কেননা দেহ ও মন এই দুই নিয়েই মানুষের আত্ম-প্রকাশ। দেহের অন্তরে যার মূল—দেহের বাইরে—পারস্পরিক জীবনে—তারই মূল্য—তারই প্রফুল্লতা; মানুষের আত্মপ্রকাশ বলতে বুঝি মানুষের অন্তরঙ্গ অনন্তেরই বহিঃপ্রকাশ। অনন্তের অনন্তত্বের প্রমাণ এইখানেই—মানুষের মানদণ্ডেই।

কবি-জয়ন্তী

রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মানুষ। তাঁকে Superman বলতে আমি রাজি নই। Superman বললে তাঁর অপমান করা হয়।

অনন্তের যোগে ও জীবনের ভোগে মানুষ সম্পূর্ণ।

কেবলমাত্র জীবন-সম্ভোগে চরিতার্থতা আছে কিন্তু সম্পূর্ণতা নেই; জীবনের সার্থকতা ও মানবিক পূর্ণতা এককথা নয়, যেহেতু মানুষ তার ব্যক্ত জীবনের চেয়ে বড়ো। সাহিত্যিকদের ভেতর থেকেই এর উদাহরণ দেওয়া যায়। শরৎচন্দ্র ও নজরুল ইসলাম—এঁরা চরিতার্থ (fulfilled), কিন্তু সম্পূর্ণ মানুষ বলতে যা বোঝায়, এঁরা তা নন। সাহিত্য-গণ্ডীর বাইরে, জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে অসংখ্য সার্থক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা অসম্পূর্ণ। তারো বাইরে আছে পৃথিবীর পনেরো আনা সাড়ে তিন পাই যারা অসম্পূর্ণও বটে, অচরিতার্থও বটে।

কেবলমাত্র অনন্তের যোগেও মানুষ সম্পূর্ণ হতে পারে না। জীবনের যোগ-বিচ্ছিন্ন অনেক যোগীঋষি হয়ত হিমালয়ের গুহাকক্ষে সমাধিস্থ আছেন, তাঁদের মানুষ বলতে আমি কুণ্ঠিত। উদাহরণের অন্বেষণে গিরিগহ্বরে অতদূরে যাবার প্রয়োজন নেই, কাছেই আছেন রামকৃষ্ণদেব। অনন্তের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু জগতের ও জীবনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ছিল না। এই হেতু তাঁকেও সম্পূর্ণ মানুষ বলা চলে না,—তাঁকে মানুষ বলতে গেলে তাঁর ভক্তরা যে মারতে আসেন তা ঠিকই করেন! এই কারণে শ্রীঅরবিন্দকেও Superman বলাই উচিত।

সম্পূর্ণ মানুষ তাঁকেই বলা যায়, অনন্তের অনুচ্ছন্দে যাঁর অন্তর ও বহির্জীবন সঙ্গত। আত্মার ও আত্মপ্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্যে যিনি রূপবান। শতদলের মতো জীবনের সবকটি দলের সমবিকাশের সুষমা তাঁর, কোনো কিছুর অত্যুগ্র আতিশয্য সেখানে নেই। খুব বড়ো কর্মী—কি খুব বড়ো জ্ঞানীকে মহাপুরুষ বলা যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ মানুষ বলতে পারিনে। দেহের আর সব অঙ্গকে ছাড়িয়ে মাথাটাই যদি বিরাট হয়ে ওঠে কিম্বা বাহুর পেশীই যদি অতি বেশি হয়ে দেখা দেয়, তাকে আর যাই বলা যাক, সুঠাম দেহ বলা যায় না। দেহ, মন ও বুদ্ধি, কর্ম ও চেতনায় যাঁর সঙ্গতি সহজ, প্রকাশ সুসম আর সুন্দর, তিনিই সম্পূর্ণ মানুষ। রবীন্দ্রনাথ তাই।

কিন্তু তা বলে রবীন্দ্রনাথ-ব্যক্তিটির মধ্যে art বা artificiality নেই এমন কথা আমি বলি না। তাঁর position-এর মূলে pose হয়ত অনেকখানি। তাঁর personality-র গোড়ায় purse-এর সাহায্য প্রচুর। তাঁর ব্যক্তিত্বের কিছুটা তাঁর হয়ে-ওঠা, কিছুটা করে-ওঠা, কিছুটা লোকে তাঁকে বানিয়ে তুলেছে। তাঁর মধ্যে ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা, ছোটখাটো ঈর্ষা-দ্বেষ, লোভ এবং বাসনা, ডিপ্লোম্যাসি বা ব্যবসাবুদ্ধি এসব যে নেই তা নয়; মানুষের জন্য বেদনা, দেশপ্রেম ইত্যাদি বড় বড় সদগুণের পাশাপাশি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তারা রয়েছে। এ সবই সত্য এবং এ-সমস্ত মিলিয়েই তিনি সম্পূর্ণ। প্রত্যেক সাধারণ মানুষের মতো এ-সবের উপরেই তিনি দাঁড়িয়ে, কিন্তু তবু তিনি সাধারণ নন এই জন্যে যে, দাঁড়িয়ে থেকেও এ-সবকে তিনি ছাড়িয়ে উঠেছেন—এমন কি, দেশপ্রেম এবং মানুষের জন্য বেদনাকেও।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আমরা সামাজিক মানুষটিকে সম্বর্ধনা করছি, সম্পূর্ণ মানুষটিকে নয়। কেন না, সম্পূর্ণ মানুষের মূল্য কি? যে মূল্যই তাঁকে আমরা দিই না কেন, অনন্তের যোগে তা তো শূন্যমান। ঘটা করে মানদণ্ডে সামাজিক মানুষের দাম বেঁধে দেয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ মানুষের কোনো দর নেই। কেবল যারা তাকে ভালোবাসে তাদের কাছেই তার আদর। এবং এই ভালোবাসা হচ্ছে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার,—জনসাধারণের জয়ধ্বনির মধ্যে লেশমাত্র নেই।

অসংখ্য অবিকশিত ফুলের সমাধির পাশে একটিমাত্র ফুলকে ফুটতে দেখলে আনন্দ হয় না। এই যে অসম্পূর্ণ মানুষের দল যারা রবীন্দ্রনাথেরই মতো পূর্ণতার দাবী নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল, অথচ যারা সামাজিক ও মানসিক বাধার পায়ে ব্যর্থ হয়েছে, বিড়ম্বিত হয়েছে; চারিধারে জীবনের এই যে বিপুল অপচয়, বিরাট অকৃতার্থতা,—এর পাশে একটি মানুষের সার্থকতার কোনো অর্থ হয় না,—তার জয়-নির্ঘোষে মানুষের পরাজয়-ঘোষণা। তাই রবীন্দ্রজয়ন্তীতে আমার আনন্দ নেই। আমার কাছে এ শোকাবহ ব্যাপার।

ক্ষুধার্ত কুকুরের কাছে রুটিই একমাত্র সত্য; বঞ্চিত মানুষ অনন্তকেও জানে না, জীবনকেও জানে না। মানুষকে স্বত্ব থেকে তার স্বত্বে দাঁড় করাতে হলে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা তাকে সামান্য ক্ষুধায় অনুক্ষণ উদ্ভ্রান্ত রেখেছে, তার অমৃতের আকাঙ্ক্ষায় ও জীবনের অঙ্গীকারে বাধা সৃষ্টি করছে; তাকেই দূর করতে হবে আগে। ক্ষুধার ধার দূর হলে, তারপরে তো সুধার স্বাদ।

মানুষ যে সম্পূর্ণ হতে পারে রবীন্দ্রনাথই তার প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষই সম্পূর্ণ হতে পারে অনন্তের যোগে ও জীবনের ভোগে। অনন্ত-ঐশ্বর্যে সবার সমান অধিকার, সেখানে কোনো পক্ষপাত নেই; কিন্তু কেবল অনন্ত-ঐশ্বর্যেই মানুষ কৃতার্থ নয়; জীবনের ঐশ্বর্যেও তার সমানাধিকার চাই, এমন কি, এইটাই সম্পূর্ণতার প্রথম ভাগ। পৃথিবীর মাটিতে শক্ত হয়ে যে দাঁড়িয়েছে সে-ই আকাশের দিকে তাকাতে পারে, চোরাবালিতে যে প্রতি মুহূর্তেই ডুবে যাচ্ছে তার কাছে আকাশই বা কী, সূর্যই বা কোথায়?

যেসব মানুষ আজ রবীন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি করছে তাদের দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের দিকে নেই; নিজেদের দিকেও নেই, সম্ভবত তাদের দৃষ্টিশক্তিই নেই। তা যদি থাকতো তাহলে জয়োৎসবের বদলে দেশে আজ রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব আসন্ন হোতো। একমাত্র সম্পূর্ণ মানুষের সম্বর্ধনার আয়োজন না হয়ে অসংখ্য অসম্পূর্ণ মানুষের পূর্ণতার পথ মুক্ত করার প্রয়োজন দাঁড়াতো।

ব্যক্তিপর্ব থেকে এবার কর্মকাণ্ডে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিশিষ্ট কর্মসাধনা—তাঁর বিশ্বভারতী।

বিশ্বভারতী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। দেশের ও বিদেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থায় এর এমন কোনো মৌলিক প্রভেদ নেই, যাতে করে এর অস্তিত্বের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ হতে পারে। এ-যুগের আর সব University-র কাজ যেমন higher order of mediocrity সৃষ্টি করে পেটেন্ট মানুষের সংখ্যা বাড়ানো—বিশ্বভারতীরও ঠিক তাই নয় কি?

কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য তো তা নয়। মানুষ দেহে, মনে, বুদ্ধিতে—অনন্তের ঐশ্বর্যে, জীবনের লীলায় আর বিলাসে নিজের প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ হবে—সেই সম্পূর্ণতার সাধনায় প্রেরণা ও সাহায্য দেওয়াই হচ্ছে শিক্ষার প্রয়োজন। প্রাচীন যুগে তপোবনের শিক্ষায় জীবনকে বাদ দিয়ে অনন্তের সঙ্গে এক হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিম্ কুর্যাম্'—এই ছিল তার মোক্ষ কথা। কিন্তু এ আদর্শ এ-যুগে অচল, কেন না এ-যুগের মানুষ কেবল অমৃতত্ব চায় না, সে চায় সম্পূর্ণ হতে; সে বলে—সম্পূর্ণই যদি না হলাম তো কী আর আমি হলাম!

সম্পূর্ণতা কী? অনন্তের সঙ্গে এক হওয়া। কিন্তু এই এক হওয়ার অর্থ এ-যুগে আলাদা, তা যেমন স্বতন্ত্র,—তেমনি পরতন্ত্র। কেবল নিজেকে আর নিজের বিধাতাকে নিয়ে নয়, বিধাতার সাথে সবাইকেই, সবকিছুকে নিয়ে। কামিনী-কাঞ্চন বাদ দিয়ে না। বিশ্বলোকের প্রতি বিমুখ হয়ে অন্তর্লোকের দিকে উন্মুখতার নাম অনন্তের যোগ-সাধনা নয় আর। কেন না অন্তরের অন্তস্তলে যেমন অনন্ত আছেন, তেমনি রয়েছেন বাইরের জলে-স্থলেও, যেমন অতীন্দ্রিয়ে তেমনি ইন্দ্রিয়-গোচর জগতেও—কোথাও তাঁর বৈচিত্র্যের রহস্যের অন্ত নেই। এই দুই অনন্তকে নিজের স্বতন্ত্র সম্মিলিত করে মানুষ যেমন সম্পূর্ণ,

দ্বিধাগ্রস্ত এই অনন্তও মানুষের অস্তিত্বের অঙ্গীভূত হয়ে আত্মসম্ভোগের অনুভূতিতে সেইরূপ চরিতার্থ।

এ-যুগে সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যার সাহায্যে অনন্তের সঙ্গে একাত্মীয়তা মানুষের পক্ষে সহজ হবে, আপনার অন্দরের চাবি তার হাতে আসবে; সেই সঙ্গে বাইরের মালখানারো—জীবনের ভালোমন্দের ভেতর দিয়ে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার রসদ থেকে জীবনকে সত্যরূপে স্বী-করণের ক্ষমতা তার হবে। কেবল অমৃতের অধিকারই তো আর নয়, আজকের জীবন-মন্থনে অমৃতের সঙ্গে যে হলাহল অবশ্যম্ভাবী তারও অধিকার তার,—সেই হলাহলকে sytle-এর মধ্যে সমীকরণের (neutralise করার) শক্তি যোগানোও আধুনিক শিক্ষার একটা বড় কথা। এই ধরনের কোনো শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্যে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা বা পরিচালন নয়।

জানার দুটো উপায় আছে,—অন্তর থেকে জানা আর বই পড়ে জানা। বই-এর ভেতর দিয়ে অপরের চিন্তার ফল বা উপলব্ধির কথা আমাদের গোচরে আসে, কিন্তু কেবল বই পড়ে গেলেই সেই ফল পাবার কথা নয়। যতক্ষণ না অপরের জ্ঞান স্বকীয় অনুভূতিতে সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়েছে ততক্ষণ তা আদৌ স্বীকৃত নয়, তখন তা নিতান্তই পুঁথিগত, ব্যর্থ এবং বিড়ম্বনা—কেন না সে-জ্ঞান শক্তিও দেয় না, সংস্কৃতি দেয় না। সংস্কৃতি-দান ও কৃষ্টির প্রসার ঘটানো শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু এ আদর্শগত যুগের—সম্ভবতঃ বিশ্বভারতী সেই পুরানো পথেই পরিচালিত হয়। এই কৃষ্টিলাভকেও সহজ করার কোনো নতুন কৌশলও রবীন্দ্রনাথ বের করতে পারেন নি।

তবে বিশ্বভারতীর দরকারও? মানুষকে ট্রেন করা একটা মিথ্যা কাজ, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই একথা জানেন। মানুষ কিছু ট্রেন নয় যে লাইন বেঁধে তাকে ইচ্ছেমতো চালানো যাবে—তাকে ট্রেন করা মানেই তার পয়মাল—তাকে মালগাড়ী করা। মানুষ হচ্ছে এমন বস্তু যা নিজে চললেই চলে, চালাতে গেলে সে অচল। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ এবং অনুরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যাপার আছে, তবে সে সব Lesser Brain-এর কেরামতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ যখন সঙ্ঘ গড়েন তখন মনে হয় এ সাঙ্ঘাতিক। এ দুর্বিপাক—তাঁদের পক্ষেও যেমন, তাঁদের আওতার মধ্যে যারা—তাদের পক্ষেও তেমন। কেননা মানুষ নিজের ভেতর থেকে হয়ে ওঠে, তাকে করে তোলা যায় না; করে তুলতে গেলেই সে আর যাই হোক মানুষ হয় না।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী তবে কিসের জন্য? প্রজ্বলিত তাঁর ব্যক্তিত্বের ইন্ধন যোগাবার জন্যেই—যাতে নিজের কাছে ও পরের কাছে নিয়ত তিনি দৃশ্যমান থাকেন। এই শিক্ষা-সংঘটনের উপলক্ষ্যে যেসব নরনারী সেখানে জড় হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁরা সমিধের মতই জরুরি। বিরাট বনস্পতির মতো রবীন্দ্রনাথ হয়তো একথা মনে করেন যে তাঁকে রস যোগানোই হচ্ছে নীচের মাটির একমাত্র কাজ এবং নীচের মাটিও মূঢ়তাবশে ভাবতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের বনস্পতিত্বেই তাদের সার্থকতা—কিন্তু তাতে মানুষের ও মানুষের মধ্যে যে সত্য সম্বন্ধ তার অস্বীকার। মানুষকে রসদরূপে ব্যবহার করা রসচর্চার একটা বড়ো অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু এই রস-নিষ্কাশনের ব্যাপারে মানুষকে নিতান্তই মাটি করা হয়।

বিশ্বভারতী মৌলিক শিক্ষাতত্ত্বের উদ্ভাবনাগার নয়, কোনো নতুন শিক্ষা-প্রণালীর

পীঠস্থানও না, —সঙ্ঘ-হিসেবেও এর যা সার্থকতা তা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বিরাট এক অপকর্ম।

রবীন্দ্রনাথের সত্যাকারের প্রকাশ তাঁর কর্মে নয়, তাঁর সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পূর্ণতার সাহিত্য।

তার অর্থ এ নয় যে, 'সম্পূর্ণ হও সম্পূর্ণ হও'—রবীন্দ্র-সাহিত্যের আগাগোড়া উচ্চৈঃস্বরে কেবল এই বাণী। তাঁর সাহিত্য-স্রোতস্বতী যখন পাঠকের মনের ওপর দিয়ে বয়ে যায়, তখনি সে নিজের মনে মনে হয়ে যায়। তখনি অলক্ষ্যে তাঁর নিজের অগোচরে, ভাব, চিন্তা ও প্রেরণার পলি পড়তে থাকে, পলে পলে যা হয়ে হয়ে—তার চিত্তলোকে তার অবচেতনায় আরেক উপাদান জমায়—নতুন ফসল ফলাবার জন্যই যে-জমি। তলে তলে তার জীবনের রূপান্তর ঘটে, যার ফলে তার কর্মধারায় ও লোকযাত্রায় অপরূপায়ণ ঘটতে থাকে ; সে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে।

অবশ্য, সাহিত্য-সম্পর্কেই সাধারণত একথা খাটে, কেন না যথার্থ সাহিত্যমাত্রই সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেয়। স্বচ্ছন্দ আত্মসৃষ্টি এবং আত্মসম্ভোগের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের পথে যে-সব রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য আছে তা দূর করতে পারে কেবল বিপ্লব—কিন্তু মানসিক বাধা দূর করতে সাহিত্যই একমাত্র ; শুধু বাধা দূর করাই নয়, পূর্ণতার পথনির্দেশও সে দেয়। সাহিত্যমাত্রেরই এই কাজ, তবু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পূর্ণতার সাহিত্য বিশেষ করে এই জন্য যে, অনন্ত নিজগুণে এই সাহিত্যে এসে ধরা দিয়েছেন ; এর ঐশ্বর্য, এর প্রাচুর্য, এর প্রকাশ-বৈচিত্র্য,—এর শক্তি আর সামুক্তি—এর রূপের ও রসের বিস্তার—সব নিয়ে বিচার করলে একথা না মেনে উপায় নেই।

কিন্তু এই যে আজ জয়ন্তী-উৎসবে এত অগণ্য গণ্যমান্য লোক জমায়েত হয়েছেন এঁরা কি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যকে যথার্থরূপে বুঝেছেন এবং গ্রহণ করেছেন ? আদপেই না। কেন না সেকথা সত্য হলে আজ চারিদিকে জীবনের জয়ন্তী দেখা দিতো। এঁদের ঐকতান জয়ধ্বনির নেপথ্য ভাবখানা এই : এই চমৎকার ব্যক্তিটি এতদিন বেঁচে আছেন, ইনি আবার নোবেল-প্রাইজও পেয়েছেন, নানাদেশে রাজোচিত সম্মান লাভ করেছেন (বলা বাহুল্য বিদেশেও রবীন্দ্রনাথ সেই সব মানুষের সম্মান পেয়েছেন যারা এঁদেরই মতো তাঁকে ও তাঁর সাহিত্যকে বোঝেও নি, গ্রহণও করেনি। খালি তাঁর খ্যাতির দিকে তাকিয়ে খাতির করেছে।) অতএব এসো, আমরা সকলে মিলে "রবীন্দ্রনাথ কি জয়" বলে চেঁচিয়ে এঁকে একটু খুশি করে দিই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বোঝা এবং ক্ষুদ্র হয়ে খর্ব হয়ে থাকা—এ দুটো একসঙ্গে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথকে যে বরণ করেছে, সে কোনো কারণেই জীবনকে ক্ষুদ্র করতে পারে না—কোনো বন্ধনকেই স্বীকার করতে পারে না—অপরকে বাঁধবার ও নিজেকে বাঁধা রাখার প্রাত্যহিক আত্মহত্যায় সে অক্ষম। আর সবাইকে ছেড়ে দিয়ে কেবল সাহিত্যিকদেরই ধরা যাক ; তাঁদের বিশেষ অহমিকা যে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা বোঝেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে, তাঁদের ভেতরে যাঁরা অসাধারণ, এমন কি সম্রাটতুল্য, তাঁদের মধ্যেও জীবনের ও মনের যে দৈন্য আমি দেখছি, তাতে আমি ভাবতে পারিনে রবীন্দ্রনাথকে পড়ার ফলে তাঁকে প্রকৃতরূপে অঙ্গীকার করতে তাঁরা পেরেছেন বা কোনদিন পারবেন।

এই অস্বাভাবিক যুগে রবীন্দ্র-সাহিত্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। একদিকে প্রাচুর্যের বাড়াবাড়ি,

অন্যদিকে অভাবের পীড়াপীড়ি ; একদিকে পাণ্ডিত্যের অভ্রভেদ, আরেক দিকে নিরক্ষরতার অজ্ঞানতার অতলান্ত ; মধ্যিখানে নৈবেদ্যের চূড়ার মণ্ডার মত মুখ্যরা, আর তার চারপাশে মুখ্যুরা—এই প্রচণ্ড আতিশয্যের মাঝে কল্পতরুও ফলপ্রসূ হতে পারে না, বৈষম্যের এই উঁচুনিচু থেকে কোনোদিন যদি সমস্ত মানুষকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতলে আনা সম্ভব হয়, সম্পূর্ণতার বীজ কেবল তখনই অঙ্কুরিত হতে পারে ; রবীন্দ্র-সাহিত্য সেই যুগের—সেই কালের।

সভ্য মানেই সাড়ম্বরিক

যে প্রকারেই হোক, এই পৃথিবীতে যাঁরা কর্তৃবাচ্য হয়ে উঠেছেন, তাঁদের জয়ধ্বজা ধরা—এককথায় সুরেশবাবু প্রবন্ধ।* তা, সুরেশবাবু যত খুশি ধ্বজা ধরুন আমার আপত্তি নেই, তবে কথা এই, এই কর্তা-ভজার দেশে তাঁর এই মনোভাবের সংক্রামক হয়ে পড়ার ভয় আছে। আসলে এই মনোভাব হচ্ছে, মনের অভাব—এত রকমেবর দারিদ্র্যের সঙ্গে যদি মনের দৈন্য এসে জোটে, ভক্তিভার আমাদের কাঁধে ভর করে, তাহলে সেই ভূতের বোঝা সত্যিই মারাত্মক হয়ে উঠবে। পাস্ট জিজেনারেশনের আশা আমরা ছেড়েই দিয়েছি, তাঁরা বিশ্বভারতী, বেলুড়মঠ বা অরবিন্দ-আশ্রমের পরিশিষ্ট হয়ে বাকী কদিন বেশ ফূর্তিতে কাটিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু এ-যুগের ছেলেমেয়েদের বিশিষ্ট হতে হবে, ব্যক্ত হতে হবে, সম্পূর্ণ হতে হবে। এবং তা হতে হলে তার গোড়ার কথাই হচ্ছে কর্তাকে না মানা। কর্তার অনুসরণে অবশ্য বাজারদর বাড়ানোর সুযোগ আছে, কিন্তু আত্মবিকাশের পথে কর্তৃবাচ্য নেই, সেখানে মহাজনের পথে নয়, সর্বজনের সহযাত্রায় নিজের পথে চলা—সে হচ্ছে সার্বজনীন ভাববাচ্য আর কর্মবাচ্য।

এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই Capital I হয়ে ওঠা চাই। এতদিন ধরে Capital HE-র ভরসা করেছি আমরা—তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্—কিন্তু দেখা গেল সে-ভবী কস্মিন কালেও ভুলবার নন। পরমাত্মার খুদে অংশীদার মহাত্মাদেরও বাজিয়ে দেখা গেল, সবাই ভুঁইফোঁড়! অতএব এখন খোদকর্তা বা কর্তা-খোদাকে ছেড়ে খোদের ওপর খোদকারি কর্তা হতে হবে। খেয়ে চেয়ে দেখতে হবে নিজেরই মধ্যে কোনো মূলধন আছে কিনা। এবং এই Capital I-এর আত্মবোধকে বাড়াতে হবে Communistic I-এর ভেতর দিয়ে—সকলের জন্য আমি আর আমার জন্য সবাই—এই সর্বগ্রাসী আত্মচেতনার ভেতর দিয়ে।

অবশ্য "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—আহা, আমিই সেই ব্রহ্ম"—এই ভাব-বিলাসিতার সাহায্যে মামুলি আত্মবোধের পদ্ধতি এখনো এদেশে বাতিল হয় নি, কিন্তু এই ভাবে আত্মচেতনার প্রসার যে কতদূর কাঁচা, তা নামজাদা সোহংস্বামীদের ল্যাজ চলকে দেওয়ামাত্রই টের পাওয়া যায়। তাঁদের খ্রীভিলেজে পা দিলে আর রক্ষে নেই! কিন্তু সে-কথা থাক, ব্রহ্মের জ্ঞান এবং তস্য শক্তি লাভ করেছেন বলে শোনা গেছে, নৈমিষারণ্যের যুগ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত, এবং হিমালয়ের গুহাচারী থেকে পণ্ডিচারী অবধি এমন বহুৎ আছেন—কিন্তু

---

* 'নবশক্তি'—৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় 'বসন্তের পত্র'—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

তবু এ-দেশের ঘাড় থেকে ভূত নামে না কেন? ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই কেন? কেন? যাঁরা স্পিরিচুয়াল আত্মবোধ লাভ করেছেন, তাঁরা আত্মশক্তির দ্বারা সংসারের কোন্ সমস্যাটা সমাধান করতে এগিয়েছেন? শ্রীঅরবিন্দ কি তাঁর স্পিরিচুয়াল শক্তি দিয়ে একজনও সাধারণ মানুষকে মেটিরিয়াল সহায়তা করতে প্রস্তুত? কখনই নন, একথা আমি জোর করে বলতে পারি, কেন না তাতে তাঁর ব্যক্তিগত পুঁজিতে হাত পড়ে। (আর টাকা-জিনিষটা পুঁজের মত হলেও পূজ্য।) সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তির Capital I-এর বোধকে জাগ্রত করে Socialistic I-এ দাঁড় করানো ছাড়া আজকের এই সার্বজনীন দুঃখের প্রতিকার নেই। এছাড়া কোনো সমাধান হবার নয়। অর্থনীতির Capital-কে যেমন সকলের সেবায় Society-র মধ্যে ছাড়িয়ে দিতে হবে, তেমনি আত্মবোধ ও আত্মশক্তির Capital-কেও। নিজ অন্ত প্রত্যয় তদ্ধিত প্রত্যয়ে পরিণতি পেলেই সেই সার্থকতা। সেই প্রকারণেই সকল দ্বন্দসমাসের সমাধান।

যাঁরা ব্রহ্মের তাবে কাতর আর ভারে কাহিল, সেই সব ব্রহ্মাতুরদের দিয়ে পৃথিবীর কোনো উপকার হবে না, কেন না তাঁরা আবার সমস্ত বোঝা ব্রহ্মের ঘাড়ে চাপিয়ে বসে আছেন,—তিনি যা করবেন তাই হবে, এই তাঁদের আইডিয়া। তার মানে, সেখানে আবার আর একটা বড়ো রকমের কর্তৃবাচ্য—বাবার বাবা-ism; আমরা ভরসা করছি মহাত্মার, মহাত্মার ভরসা Inner Voice; কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হবে, কিন্তু খোদ বিশ্বকর্মা একজন নামজাদা অকর্মা। ইতিহাসের নজির এই যে, ভগবানের দ্বারা কখনো কিছু হবার নয়, বিশেষ করে মানুষের কোনো ভালো। লেনিন যদি নিজের হাতে না নিয়ে ভগবানের ঘাড়ে কাজের ভার চাপিয়ে দিতেন, তাহলে রাশিয়ার প্রলিটারিয়েটদের দুঃখ-দুর্দশা দূর হতে আরো কত যুগ লাগতো কে জানে!

এটা সত্য যে আমাদের শক্তি, প্রেম ও সৌন্দর্যের অফুরন্ত উৎস অনন্ত থেকেই। কিন্তু এই অনন্ত নির্বিকার—সমুদ্র যেমন, আমি তার জলে ঘটি ভরতেও পারি, নাও পারি। সমুদ্রের নিজের কোনো গরজ নেই, ঘটি ভরতে হলে আমাকেই এগুতে হবে। এই অনন্ত উৎসকে exploit করার উপায় পণ্ডিচেরির মতো উর্ধ্বলোকের দিকে হাঁ করে থাকা না,—তা যদি হোতো, তাহলে এতদিন হাঁ করে থাকার ফলে শ্রীঅরবিন্দ যে ভগবদশক্তি হজম করেছেন, তাই দিয়ে আজকের জগৎসমাজের বিপ্লব ঘটিয়ে আমাদের হাঁ করিয়ে দিতেন! আকাশে বিদ্যুৎ আছে কিন্তু তার আলো ও শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে, আকাশের দিকে উর্ধ্ববাহু হয়ে থাকলে চলে না, সেই তড়িৎপ্রবাহকে যথারীতি চালাতে হয়। নইলে খালি খালি তড়িৎমন্ত্র জপ করে শুধু প্রতারিত হতে পারি। উপবাস বা উপাসনায় বিদ্যুতের মন গলে না,—তার প্রভু হয়ে তাকে সেবায় লাগালেই সে বাধ্য হয়। তেমনি অনন্তও,—আমারই ইচ্ছার বশে শক্তি এবং প্রেরণা যোগাতে সে বাধ্য; আমার এই-ইচ্ছাকে পূর্ণরূপে জাগ্রত ও প্রসারিত করার মানেই হচ্ছে I-এর Capital বাড়ানো, অন্য Capital I হয়ে দাঁড়ানো।

এ বোঝা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। ভগবানের ইচ্ছায় যুগ-যুগান্ত ধরে রাশিয়ার নরনারী নানা প্রকারে নিপীড়িত হয়েছে, কিন্তু Capital I লেনিন যখন বলল, না, এ রকম আর চলবে না, আমি এটা অন্য রকম ইচ্ছা করি, অমনি সেখানে ইতিহাসের চেহারা বদলে গেল। লেনিনের মতলবে ভগবান তাঁর মত বদলাতে বাধ্য হলেন।

অতএব দাঁড়াচ্ছে এই, 'ত্বয়া হৃষীকেশ-হৃদিস্থিতেন' ভাব নিয়ে অর্ধবাহ্য দশায় বসে

থাকলে ঘুচবে নিজের দুঃখ, না সংসারের, ভগবানের দাস হয়ে নয়, ভগবানকে দাস করতে পারলেই সেটা সম্ভব! আসলে অন্তর্গত অনন্তকেই ইচ্ছামত exploit করার উপায় আবিষ্কারের উপরই মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কিন্তু ভগবৎশক্তি পেতে হলে ভগবানের ধামা ধরে তা হবে না। তা সম্ভব ভগবানকে বাড়িয়ে নয়, খাটো করেও না,—ভগবানকে খাটিয়ে। যেমন, সুরেশবাবু বলেছেন।

"অন্নের পূজায় অন্ন মিলবে না, অন্ন-জগতের চাইতে উঁচু একটা জগতের অর্থাৎ প্রাণ-জগতের পূজায় তা মিলবে; আবার প্রাণ-জগতকেও পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হলে প্রাণ-জগতের চাইতে উচ্চতর জগতে যেতে হবে।"—তেমনি ভাগবত শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে ভগবানের পূজায় তা হবে না, ভগবানের ওপরে যেতে হবে। মানুষের শিল্পে, সভ্যতায় ও লোকযাত্রায় যা-কিছু উত্তম, সবই হচ্ছে খোদার উপর খোদকারি। সুরেশবাবুর কাছে হয়ত এসব ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে, কিম্বা হয়ত তিনি এতক্ষণে কানে হাত দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ জপতে সুরু করেছেন!

কিন্তু এটা যদি তাঁর কাছে ধাঁধার মতো না ঠেকে থাকে এবং শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীভগবানকে ডিঙিয়ে ভাববার দুঃসাহস তাঁর থেকে থাকে, তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন, রাশিয়া কেন ভগবান আর ধর্মকে বাতিল করল। এতদিন ধরে ভগবানের মার ওরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে কিনা! মানুষের দুঃখ দূর করতে যখন মানুষ ছাড়া কেউ নেই, তখন ব্যক্তির Capital I-কে জাগানো ছাড়া উপায় কি?—মানুষের অহঙ্কারই হচ্ছে মানুষের সভ্যতা, মানুষের শিল্প-সাহিত্য, মানুষের নিত্য নব সৃষ্টির প্রেরণা! কিন্তু এই অহঙ্কারও দুর্বিপাক আনে, যদি তা অন্যের অস্তিত্বের ঘাড়ে গিয়ে চাপে। তাই এই Capital I-এর দুর্গতি দূর করতে চাই তার অঙ্কিত প্রত্যয়, আর সেইখানেই আসে সোশ্যালিজম্।

আধ্যাত্মিক কৌশলে ব্রহ্মের যোগে Capital I বাড়ানোর যে অন্তর-গত উপায় আছে, নির্বিশেষ সকলের মধ্যে সেই নিজ্-অন্ত প্রত্যয় প্রসারিত না হলেই মারাত্মক; যেমন এদেশে এমন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু আছেন—যিনি ব্যবহারিক জগতে দস্তুরমতো অর্থপিশাচ, এমন রাজর্ষি আছেন—প্রজা-শোষণে যাঁর বাধে না, এমন ব্রহ্মবিদ্ আছেন—যাঁর কেবল ভূমাতেই সুখ নেই—ভূমিতেও ভুখ; এমন মহাপুরুষ আছেন যিনি ব্রহ্মলোকে বাস করেও তৃপ্ত নন, নিজের আশেপাশে তাঁকে গো-লোক তৈরি করতে হয়েছে। অতএব ব্রহ্মযোগে Capital I-এর যে-শোধন কিম্বা বোধন-পদ্ধতি, সেটা পাকা রকমের নয়, তাতে রং ধরে মাত্র, কিন্তু জিনিষটা right হয় না বলে ধোপে টেঁকে না। এই জন্যই কমিউনিজমের অপেক্ষা ছিল—এত যুগের অধ্যাত্মবাদে যা পারেনি, এতদিনে সাম্যবাদে তাই পারলো, মানুষের অহংবোধকে নির্বিষ এবং নির্বারিত করে—Capital I-এর সম্প্রসারণ ঘটিয়ে Capital We-এ। সত্য এবং কল্যাণ-বোধের অন্তরগতিই যথেষ্ট নয়, বাহিরের লোকযাত্রায় বহির্গতিতেই তার পরীক্ষা।

সুরেশবাবুর Capital I-এর প্রতি কটাক্ষ-পাতের জবাব দিতেই এতক্ষণ গেল, এইবার তাঁর আসল কথায় আসবো। রবীন্দ্র-জয়ন্তী ব্যাপারে আমি গত বছরে যে প্রবন্ধ লিখেছিলাম, সুরেশবাবুর 'হসন্তের পত্র' হচ্ছে তারই প্রতিবাদ। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ্য বা প্রতিপাদ্য যাই হোক না, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে defend করা। কোন্ রবীন্দ্রনাথকে? না, কবি রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু আসলে, আমার মূল প্রবন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কোনোই অভিযোগ ছিল না, যা ছিল তা বিশ্বভারতীর কর্তার উদ্দেশে। কাব্যের রবীন্দ্রনাথ আমার

বিস্ময়, আমার যা-কিছু আক্রমণ তা ছিল সঙ্ঘের রবীন্দ্রনাথের—অর্থাৎ সঙ্ঘবাদের বিরুদ্ধে ; কিন্তু সুরেশবাবু পাকা লোক, ভূয়োদর্শন হয়েছে তাঁর ; অর্থাৎ তিনি যা দেখেন সমস্তই ভূয়ো অথবা তিনি দেখেন ঠিকই, দেখাতে বা বোঝাতে চান অন্যরকম—অর্থাৎ যেমন তাঁর ভূয়োদর্শন, তেমনি ভূয়োপ্রদর্শন। তার প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর এই নবতম রচনার কেরামতিতে—তিনি সঙ্ঘের রবীন্দ্রনাথকে defend করেছেন কাব্যের রবীন্দ্রনাথকে খাড়া করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সঙ্ঘবাদের কোনো defence আছে না কি ? এ হেন capital eye না হলে আর সুরেশবাবুর কপালে এমন capital woe ঘটে !

কাব্যের রবীন্দ্রনাথ ও সঙ্ঘের রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্ত রবীন্দ্রনাথ ও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ, সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ ও BIG রবীন্দ্রনাথ—দুটো একেবারে আলাদা, এটা সুরেশবাবু বুঝতে চেষ্টা করুন ; চেষ্টা করলে এটা তাঁর কাছে ততটা হেঁয়ালী নাও ঠেকতে পারে। অনন্তের যোগে মানুষ সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ হওয়া আর BIG হওয়া এক নয়,—বড়ো হতে হলে অসংখ্যের যোগাযোগ চাই। আত্মসাক্ষাৎ করে মানুষ সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু বড়ো হতে থাকে আত্মসাৎ করে। অনন্ত প্লাস রবীন্দ্রনাথ প্লাস তাঁর প্রকাশ—রবীন্দ্রনাথের কবি হওয়ার পক্ষে এ-ই যথেষ্ট, কিন্তু এ সমস্ত মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ একক, একাকী, শুধু একমাত্র। কিন্তু যেখানে রবীন্দ্রনাথ বড়ো হতে চেয়েছেন সেখানে তাঁকে আরো ব্যক্তি সংগ্রহ করে সঙ্ঘ গড়তে হয়েছে এবং তাঁর একমাত্রার মূল্য বাড়াবার জন্যে আর সবাইকে শূন্য-মাত্রে পরিণত করতে হয়েছে ; অনন্তের যোগে মানুষ সম্পূর্ণ এবং একতম, কিন্তু সেই একতমের যদি বাজারদর বাড়ানোর গরজ থাকে, তাহলে শূন্যাত্মদের যোগাড়ে লাগতে হয়—কেননা একের আপেক্ষিক মূল্য শূন্য-বৃদ্ধিতেই বাড়ে। কবি যখন "অনন্তের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে" অক্ষুণ্ণের যোগে অনির্বচনীয়, তখন তিনি নিরাপদ : কিন্তু তখনই ভয়াবহ যখন "নাল্পে সুখমস্তি" বলে তিনি ভূমাধিকারী হতে বেরোন। বিশ্বের ধনযোগে ও জনযোগে সকলের চেয়ে বড়ো হবার বাসনা তাঁকে পেয়ে বসে। কেবল কবি হয়ে তখন তাঁর তৃপ্তি নেই, কবির আসন থেকে তিনি নেমেছেন ; রাজার সিংহাসনে ও রাজদণ্ডে তাঁর লোভ। এবং আজকের সাম্যবাদের যুগের আর সব রাজার ভাগ্যে যে দণ্ড লাভ হয়েছে, তাঁরও বরাতে তখন তা-ই—জগন্নাথের যে দুর্গতি, বলরামেরও ততদূর গতি। কেননা, তখন তিনি কেবলমাত্র Capital-I নন, রীতিমত capitalist—I-ই, সুতরাং যে-দণ্ড তাঁর জন্য ন্যায্য প্রাপ্য, তাও Capital হতেই বাধ্য। ক্যাপিটাল পানিশমেন্টই।

বিশিষ্ট ব্যক্তি যেখানে নিজের মধ্যে সংহৃত সেখানে তাঁর আদর মাত্র, কিন্তু যেখানে সঙ্ঘগত, কেবল সেইখানেই তাঁর বাজার দর। অবশ্য এই দর বাড়ানোর গরজ তাঁর একার নাও হতে পারে। সেখানে হয়ত এটা দুদিকেরই চাহিদা। Unit-এর যেমন শূন্য চাই, শূন্যদেরও তেমন unit-কে দরকার—উভয়ের দাম বাড়াতে উভয়েরই কদর ? কিন্তু তখন এই প্রশ্ন আসে যে-বস্তুত ওরা শূন্য বলেই কি unit-কে চায়, না, unit-কে আশ্রয় করেই ওরা শূন্যে দাঁড়ায় ; —অনেকটা "তাল পড়িয়া ঢিপ করে, কি ঢিপ করিয়া তাল পড়ে" কূট তর্কের মত। কিন্তু নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত তার যাই হোক, তাদের বর্তমান শূন্যাকার দেখে তারা যে শূন্যমাত্র এবং সঙ্ঘবাদের পরিণত ফল, তার প্রমাণ পেতে দেরী হয় না। তবে এই শূন্যমাত্রাদেরও একটা বাহাদুরি আছে যেটা তাদের বাজার দরের মূলে—তা' হচ্ছে unit-এর সঙ্গে ঠিকমতো নিজেদের খাপ খাওয়ানোতে। শূন্যরা ১-এর

ডানদিকে বসলেই—নিজের বাড়ন্ত শক্তি দিয়েও—তার গুরুত্ব বাড়ায় ; কিন্তু তারা বাঁদিকে বেঁকে দাঁড়ালেই গোলযোগ, কেননা তাহলে আর unity থাকে না, এমনকি unit-এরও তখন মূল নিয়ে মূল্য নিয়ে টানাটানি—দস্তুরমতো মানহানির দশা। সেটা একটা নিতান্তই **decimal** এবং **dismal** ব্যাপার।

সুরেশবাবু চেঙ্গিস খাঁ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তুলনা করে দু'জনের ভয়ানক পার্থক্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পার্থক্য যা-কিছু তা ডাল-পালায় এবং ফুলে-ফলে। মূলত কোনো মানুষের সঙ্গেই কোনো মানুষের বিভেদ নেই। উচ্চতম থেকে নীচতম, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, যতোরকমের মানসিক বৃত্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে সম্ভব, তা তথাকথিত বড়োদের মধ্যেও যেমন ছোটদের মধ্যেও তেমনি,—রূপের এবং ক্রমেরই যা-কিছু ব্যতিক্রম। চেঙ্গিস খাঁর মধ্যেরও রবীন্দ্রনাথ ছিল—তা বিকাশলাভ করেনি ; এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও চেঙ্গিস আছে—তিনি তার ভোল ফিরিয়ে নিয়েছেন। সত্যি বলতে, রবীন্দ্রনাথ ও চেঙ্গিস খাঁ সকলের মধ্যেই বিরাজমান, প্রকাশের ও পরাক্রমের যে বিভিন্নতা দেখি তা মিশ্রণ-ক্রমের তারতম্যে। আসলে সব মানুষের মধ্যেই আছে সব মানুষ—আদতে সবারই এক আত্মা কিনা, সেই জন্যই বোধহয়!

অবশ্যি, সহজ দৃষ্টিতে চেঙ্গিস খাঁর সঙ্গে এ-যুগের BIG মানুষের মস্ত একটা তফাৎ দেখা যায়, তা এই চেঙ্গিসের bigness-এর মূলে ছিল অসংখ্যের বিয়োগ—আর এঁর বেলা অসংখ্যের যোগ। কিন্তু এ-তফাৎ সামান্যই, সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে এই যোগ-বিয়োগের রহস্য অতীব স্পষ্ট—কেননা, চেঙ্গিসের হাতে যাদের প্রাণবিয়োগ হোতো, এখনকার এঁর হাতে তাদের আত্মবিলোপ হয় ; চেঙ্গিস মৃত্যুসাৎ করে নিস্তার দিতেন,, ইনি তাদের আত্মসাৎ করেও নিষ্কৃতি দেন না। যাদের ইনি অঙ্গীকার করেন, কেবল তাদেরই ইনি স্বীকার করেন, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের সীমা থাকে না, আর এইখানেই এঁর বাহাদুরি, যেহেতু তাদের ইনি বুঝতেও দেন না যে আসলে ইনি তাদের শিকার করেন। এঁর **spell**-এ **manslaughter man's laughter** হয়ে ওঠে। চেঙ্গিস খাঁ সরল এবং কঠিন ; ইনি মিষ্টিক, সেই কারণেই মিষ্টি। চেঙ্গিসের ছিল বলপ্রয়োগ, এঁর হচ্ছে ছলপ্রয়োগ—মারাত্মকতার প্রয়োগনৈপুণ্য এঁরই বেশি। চেঙ্গিস হত্যা করতো, বলতো deal ; ইনি হত্যা করেন, বলেন—I deal! আর নিহতরাও সেই কথায় সায় দেয়। ভেবে দেখুন, সেদিনের থেকে বিশ্বসভ্যতা একটুখানি এগিয়েচে তো, সুতরাং হত্যারও একটা মুখরোচক সভ্য সংস্করণ হবে নাকি? চেঙ্গিসের আমলে যে-দাওয়াই ছিল crude, তেতো একটা অ্যালোপ্যাথিক ব্যাপার—এখন তার হোমিওপ্যাথিক ডোজেই কাজ দেয়, স্পিরিটের মধ্যে ডাইলিউশন হয় বলে এ বরং আরো বেশি এফেক্‌টিভ।

সঙ্ঘ মানেই সাঙ্ঘাতিক। সঙ্ঘের যিনি কেন্দ্রমূল তিনি 'ঘ'-ঘ-এ ঘুঘু। বাকী সবাই সঙ্‌। সঙ্‌দের নিয়ে যাঁর আরাম তিনিই সঙ্ঘারাম, তাঁর কর্মই হচ্ছে সঙ্ঘীয়দের আত্মার আ-কার লোপ করে দেওয়া ; তার ফলে পুরুষরা পরিণত হয় হসন্তে এবং মেয়েরা খণ্ড-ৎ-যে। পদাশ্রিত চিহ্নমাত্র-অবশেষ চেহারা দেখলেই পুরুষদের চেনা যায়, মেয়েদের চিনতে হলে কালীয়দমনের পট স্মরণ করতে হবে,—সেখানে শ্রীকৃষ্ণ যেসব যুক্তকর অর্ধনারীর ঈশ্বররূপে বিরাজমান তাঁরাই আধুনিক খণ্ডিতাদের পৌরাণিক রূপ।

কেউ যদি নিজেকেই দোহনের লক্ষ্য করেন তাতে কোনো দুঃখ হয়না, কিন্তু তিনি অপরকে উপলক্ষ্য করলেই বিপদ ; অনন্তের ঐশ্বর্য যত খুশি তিনি লুঠ করুন আপত্তি

কার, কিন্তু অপরের দিকে নজর দিলেই বিপত্তি, নিজে আত্মস্থ হোন—সুখের কথাই; কিন্তু আর সবাইকে উদরস্থ করতে চাইলেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি—কেননা মানুষ-যম যখন আর-সকলের ব্যক্তিত্বকে হজম করে ক্রমেই মহামানব হতে থাকেন, তখন রাহুগ্রস্ত সে-বেচারাদের আধা-আত্মায় পরিণত হতে হয়। সেইসব হাফসোলের তখন তাঁর জুতোর তলায় পরিণত হওয়া ছাড়া গতি থাকে না। কর্তার জুতোয় ছাড়া হাফসোল আর দুনিয়ার কোন্ কাজে লাগে? নতুন অবস্থায় যখন কিছু পদার্থ থাকে তখন তার মচমচে আওয়াজ—সেটা কর্তার এবং কর্তৃত্বের পক্ষে তার কীর্তন; পুরানো অবস্থার বুলি অন্য রকমের, তখন সে কাদা ছিটোয় এবং কর্তার পতনে সাহায্য করে—কিন্তু যাই সে করুক, তার সারজীবন বিরাট একটা বিরাম চিহ্ন। তার ধারণা যে সে চলে কিন্তু তার গতিও নেই বুদ্ধিও নেই—তবে ক্ষতি-বৃদ্ধি আছে, কেননা কর্তার চলা হয় আর তার তলা ক্ষয়। ট্র্যাজেডি এই যে, সেই শূন্য-মাত্রার গর্বে সুরেশবাবুর হাসি ধরে না, কিন্তু তাঁর হসন্ত-রূপের কারুণ্যে আর কারু হাসি পাবার কথা নয়।

সঙ্ঘবাদের বিরুদ্ধে আমার যে-অভিযোগ তা কোনো বিশেষ সঙ্ঘের উদ্দেশে নয়, যা কোনো সঙ্ঘকে বাদ দিয়েও না। যে-কোনো উদ্দেশ্যেই হোক, কোনো হজমশক্তিওয়ালা লোককে কেন্দ্র করে যেখানেই সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে সেইখানেই এই দশা; সেইখানেই বিশিষ্ট ও পরিশিষ্টের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে, গুরুভারে শিষ্যদের সহজ আত্মবিকাশ রুদ্ধ। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ তো আসলে খাদ্য-খাদক—অনেকটা গরু ও শস্যের মধ্যে যে-সম্পর্ক।

কেউ কেউ হয়ত পণ্ডিচারী-জাতীয় সঙ্ঘের সমর্থনে বলতে আসবেন যে, এখানে উচ্চতর সত্যের আরাধনা হয়ে থাকে, এ হলো দার্শনিক বীক্ষণাগার, প্রয়োজন ছিল এর। কিন্তু সে-প্রয়োজন কার? শ্রীঅরবিন্দ ও সুরেশবাবু প্রমুখের প্রয়োজন বললে অর্থটা বুঝা যায়—কিন্তু মানবজাতির প্রয়োজন বললেই কথাটা গোলমেলে হয়ে ওঠে। কেননা বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটারীর সঙ্গে এই দার্শনিক ল্যাবরেটারীর প্রভেদ আছে,—বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানে যা আবিষ্কৃত হবে তা নির্বিশেষে সকলের কাজে লাগবে, তার উত্তরাধিকারী সমস্ত মানুষ; কিন্তু এঁদের বহিষ্কৃত সত্য সকলের জন্য তো নয়।

এডিশন যখন বৈদ্যুতিক আলো-কে পেলেন তখন সব মানুষের জন্যই পেলেন, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যদি কোন আলো পেয়ে থাকেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি; সেই এজমালিতে আর-কেউ ভাগ বসাতে পারবে না। নৈমিষারণ্য ও পণ্ডিচারীর অরণ্যে যাঁরা হাঁকছেন "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং" তাঁদের স্তোকবাক্যে খুব কম লোকই ভুলবে, কেননা আজ আর জানতে কারু বাকী নেই যে, তাঁদের এই চীৎকার চিন্ময় লোকের আমদানি হলেও, নিতান্তই এ আরণ্যিক রোদন! তাঁদের "আদিত্যবর্ণে" পৃথিবীর অন্ধকার দূর হবার নয়। সত্যেরও আবার রকমফের আছে; যেমন, যোগবলেই হোক আর চালাকির দ্বারাই হোক, কতকগুলি লোকের পক্ষে মাথা দিয়ে হাঁটা সহজ হলো—সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত সত্য, তা কখনই সার্বজনীন সত্য হতে পারে না। ঊর্ধ্বলোকের দিকে পদক্ষেপ করতে পারলে 'অভূতপূর্ব শক্তির অভ্যাগম' হওয়া সম্ভব, স্বীকার করি; কিন্তু ক্ষুদ্র-সাধারণ-আমরা চিরদিন মাটিতে পা দিয়ে চলতেই ভালোবাসবো!

পণ্ডিচারীর বিরুদ্ধে কেন আমার অভিযোগ এবং রাঁচির বিরুদ্ধে কেন নয়, তার কারণ, অপরের বুদ্ধির ওপর রাঁচির আশ্রমের কোনো প্রভাব নেই, তাছাড়া রাঁচি নতুন নতুন

রিক্রুটের চেষ্টা করে না। অবিজ্ঞাপিত পাগলা গারদের সুবিধা এই তারা বিজ্ঞাপন দিয়ে শিকার যোগাড় করতে পারে, আর বিশেষ করে এদেশে আধ্যাত্মিক পাগলামিটা যে ধরনের ছোঁয়াচে, তাতে রোগ ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না।

এ জাতির মেরু-মজ্জা থেকে আধ্যাত্মিক মানসিকতা দূর করা আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন—ঐ-মনোভাব আমাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা ও অকৃতার্থতার মূলে। "ভগবান আছেন এবং তিনিই বাঁচাবেন"—এই কুসংস্কার নিয়ে এ-জাতটা মরতে বসেছে; আর এইসব সঙ্ঘ সেই ধ্বংসের পথটা পিছল করছে মাত্র। সেদিন শ্রীঅরবিন্দেরই Mother নামে বিখ্যাত বইটা পড়ছিলাম—পণ্ডিচেরি থেকে কেমনধারা সত্যের আমদানি-রপ্তানি হয়, তার পরিচয়। তাতে ভগবানকে—কল্যাণময়ী জননীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তিনি পৃথিবীর সন্তানদের দুঃখ দূর করতে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত—এই কথাই বলা হয়েছে,—অল রাবিশ! এইসব সুখী মানুষেরা নিজেদের মনের মতো মিষ্টি ফিলজফি বানিয়ে বেশ মশগুল রয়েছেন—কিন্তু সাধারণের এইসব উচ্চাঙ্গের নেশা ধরলেই সর্বনাশ! ভগবান ভালো করেন—এই সত্য উত্তরায়ণে আর অরবিন্দাশ্রমে খাটতে পারে; কিন্তু এ-কে জাপানের ভূমিকম্প, আন্দামানে অসহায় বন্দীর মৃত্যু, আমেরিকার চেন-গ্যাঙ, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পরিবারের অনশনভাণ্ডোর সঙ্গে খাটাতে গেলেই মুস্কিল। তরোয়াল যাদের কাটে, তাদের সঙ্গে খাপ খায় না।

ভগবান এবং ধর্ম-সম্বন্ধে এঁরা যা বলেছেন বা বলতে চান, তা বিলকুল মিথ্যে—কেননা সত্য হবে আগুনের মতো, সব অবস্থায় সবার বেলাতেই সমান পোড়াবে। ভুয়ো সত্যের ভাণ্ডারীগিরি চিরদিনই কতকগুলো লোকের কাজ থাকবে, যেমন পিকেটিং-এর যুগেও অনেকে গাঁজার দোকানী থাকে নি—নেশা ধরানোই ছিলো এদের পেশা জীবনের Mission. কিন্তু এইসব ঈশ্বর-বিলাসী ধর্মপ্রাণ নিশ্চিন্ত লোককে আজ যদি বিত্তহীন ও পেট্রন্‌হীন করে নিরন্নের জগতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে আর কিছুতে না হোক অন্তত পেটের দায়ে তারা বুঝতে পারে যে, তাদের সত্যের ভেতরে কতটা ধান আর কি পরিমাণ চাল। যিশুখ্রীস্টকে যে কেন ক্রুশে দিয়েছিল, তা বোঝা আজ খুব শক্ত নয়—যে-আধ্যাত্মিক জড়বাদে জগদ্ব্যাপী জর্জরতার সূচনা হলো, গোড়াতেই তার জড় মারতে চেয়েছিল তারা। আমরা যে আজ নানাদিক দিয়ে নানাভাবে ব্যর্থ হচ্ছি, জীবন সংগ্রামে হটে যাচ্ছি, ভূতকে ও ভগবানকে এবং তাঁদের পার্থিব প্রতিনিধি কর্তৃব্যক্তোর থোড়াই কেয়ার করে উঁচু মাথায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে যে আমাদের মেরুদণ্ডে টান পড়ে, আমাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির অভাব এবং আমাদের পর-প্রত্যাশা—সবার চেয়ে যে পর, পরাৎপর, সেই ভগবানের প্রত্যাশা—এর গোড়ায় রয়েছে অন্ধ ভয় ও অন্ধ-আকুতি। রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের ফিলজফি হচ্ছে সেই অন্ধতার প্রোপাগাণ্ডা।

সঙ্ঘই এইসব প্রোপাগাণ্ডার মূলে শক্তি যোগায়। যে-নিষ্ফল দর্শন বই-এর পাতাতেই স্বাভাবিক মৃত্যুলাভ করতো, এইসব সঙ্ঘ শুধু তাকে বাঁচিয়েই রাখে না, নেশার মত তাকে করে তোলে আকর্ষণীয়। লোকে ভাবে এতগুলো মাথা যখন ভিড়েছে তখন ব্যাপার কিছু নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু মাথাগুলো যে সব ফাঁকি, সেটা তারা বাঁকিয়ে দেখে না—বহু শূন্যের যোগে অঙ্কটা আতঙ্কজনক বড়ো দেখায়। অবশ্য তারা সবাই কিছু সঙ্ঘে গিয়ে যোগ দেয় না, কিন্তু সঙ্ঘের মতবাদে তারা মনোযোগ দেয়। একটু একটু করে তাদের বিশ্বাস গজায়, কেন না বহুদিনের প্রচারে মিথ্যেটা তখন সত্যের আকার নিয়ে পাকা

হয়ে দাঁড়িয়েছে। রামকৃষ্ণ কথামৃতের কথায় এবং অমৃতত্বে যে আমরা বিশ্বাস করি, তার গোড়ায় বেলুড় মঠের অত বড়ো বিজ্ঞাপন। সঙ্ঘ এইভাবে সঙ্ঘীয়দের বাইরেও সর্বনাশ ছড়িয়ে থাকে।

এইজন্যই কৃষ্ণমূর্তিকে সেদিন আমি মনে মনে সাধুবাদ না দিয়ে পারি নি, যেদিন তিনি অত বড়ো order of the star ভেঙে দিলেন। তাঁর ফিলজফি আমি মানি আর নাই মানি, তাঁর শুভবুদ্ধিকে আমায় মানতে হলো। শ্রীঅরবিন্দকে আমার এই অনুরোধ, সে-বস্তু সত্য তা নিজের শক্তিতেই বাঁচে তাকে বাঁচাতে অন্য চক্রান্তের দরকার করে না—অতএব পণ্ডিচেরির শূন্যচক্র তিনি নির্ভয়ে ভেঙে দিতে পারেন, অবশ্যি যদি তাঁর ক্ষমতায় কুলোয়। শুনি যে তিনি যোগবলে ত্রিশূন্যে বিরাজ করেন, তা তিনি অবলীলায় আবহমান করতে থাকুন—অমন আরামের জায়গা আর হয় না। তার থেকে নামতে তাঁকে অনুরোধ করি নে। রবীন্দ্রনাথকে বলা বৃথা, কেননা ওটা তাঁর সখের জিনিষ, তবে মস্ত ভরসা এই যে, তাঁর তিরোধানের সাথে-সাথেই শ্রীবিশ্বভারতী ত্রিশূন্যে উঠে যাবে—যদি না তার মতিগতি ততদিনে বদলায়।

কোনোদিন যদি এখানে সোসিয়ালিস্ট স্টেটের প্রতিষ্ঠা হয়, তার প্রথম কাজই হবে দেশব্যাপী ছোট-বড়ো-মাঝারি যত সঙ্ঘ আছে সব ভেঙে দেওয়া : মানুষের মন থেকে False God এবং ভুয়ো philosophy দূর করা, দুয়ো করা, উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা যে, এ সমস্তই—"সব ঝুট্ হায়।" তারপরেই তার কাজ হবে হিমালয়ের একটা গভীর গুহা খোঁজ করে এদেশের যত গভীর গুহা খোঁজা করে এদেশের যত কিছু ধর্মগ্রন্থ—উপনিষদ, গীতা থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দের ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব—সমস্ত এক করে সেই গুহার মধ্যে করবে নিক্ষেপ। এ কাজটি যে কোনো [illegible] সার্থক হলো না, তখন তার একটা অন্তত পর্যাপ্ত হবে—নিজের অর্থ খুঁজে পেয়ে কৃতার্থ হবে। সেটি হচ্ছে—ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম।

হরিজন আন্দোলনের নব-দর্শন

অনেক উঁচুতে যিনি উঠেছেন, অনেক দূর অবধি তাঁর দৃষ্টি। সমতলভূমির সমান পাল্লায় দাঁড়িয়ে যারা হাতাহাতি করে আজকের সমস্যাই তাদের কাছে একান্ত, এই মুহূর্তের লাভ-ক্ষতিই তাদের একমাত্র,—সামনের শত্রুকে সরাতে না পারলে তার শান্তি নেই। কিন্তু মহৎ-দ্রষ্টার দৃষ্টি দেশ-কালকে অতিক্রম করে যায়—কেবল নিজের দেশ নয় বা দেশের বর্তমান নয়, সব মানুষের দেশ, সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তাঁর দৃষ্টি পরিধির আওতায়। আত্মায় যাঁর আসন, অদ্ভুত তাঁর আত্মীয়তা-বোধ, আমাদের ধারণার নাগালের বাইরে,—কেবল তাঁর মিত্ররাই তাঁর আপনার নয়, তাঁর শত্রুরাও তাঁর আত্মীয়। কেননা অনেক দূর পর্যন্ত তিনি দেখেছেন, অনেক কিছু তিনি দেখতে পেয়েছেন।

মহৎ-দ্রষ্টা মানুষকে নেতারূপে পাওয়া যেমন ভাগ্যের, তেমনি দুর্ভাগ্যের। আসন্ন সমস্যার সমাধানই যে-সময়ে আমাদের সবচেয়ে বড় কথা, সে সময়ে হয়ত তিনি এক শতাব্দী পরের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, যে মুহূর্তে স্বদেশের স্বার্থসাধনের মত সুযোগ হাজির, ভালোমন্দ যাহোক কিছু একটা করে ফেলার দরকার, তখন তিনি খতিয়ে দেখছেন,

স্বদেশের এই সুযোগের সঙ্গে সর্বদেশের এমনকি শত্রু দেশের পর্যন্ত কতখানি কল্যাণ-যোগ রয়েছে। চৌরীচৌরার প্রান্তরে অপরিহার্য স্বাধীনতাকে অবহেলায় বিসর্জন দিতে মহৎ-দ্রষ্টাই পারেন কেবল। লেনিন, মুসোলিনী, এমন কি হিট্‌লার (প্রথমোক্তের সাথে আর কারু নাম করা চলে না, যেহেতু লেনিন একজন যুগ-প্রবর্তক—একাধারে মহৎ-দ্রষ্টা ও মুহূর্ত-দ্রষ্টা) যা, অনায়াসেই করতে পারেন, গান্ধীর পক্ষে তা অসম্ভব।

অস্ত্রবলে দেশোদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু যদি সম্ভব হোতোও, তবুও মহাত্মা গান্ধী তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন। নন-ভায়োলেন্স-নীতি যে বিশেষ করে এই ভারতের জন্যেই তাঁর উদ্ভাবনা, একথা ভাবলে ভুল হবে, কেননা ভায়োলেন্সের সমস্যা কেবল ভারতীয় সমস্যা নয়—এ সমস্যা এ-যুগের অস্ত্রভার-পীড়িত রক্তাক্ত পৃথিবীর। অহিংসা-মন্ত্রের দ্বারা তিনি কেবল স্বদেশের নয়, সর্বদেশের মুক্তি চেয়েছেন, সকলের শান্তি, সর্বকালের কল্যাণ কামনা করেছেন—এইখানেই তিনি মহৎ-দ্রষ্টা। মুহূর্তের লাভ-ক্ষতির খতিয়ানে তাঁর হার স্বীকার করতে হলেও, ভবীকালের ইতিহাস অন্যরকম সাক্ষ্য দেবে। সার্থকতার স্বাক্ষর হয়ে উঠবে এই ব্যর্থতার পুঁজিই। পূজিত হবেন তিনি আগামীকালের মানুষের কাছে—এইজন্যেই।

তেমনি হরিজন-আন্দোলনেও তাঁর মহৎ-দৃষ্টির পরিচয়। অন্ত্যজদের উন্মুক্তি না হলে এ-জাতির উদ্ধার নেই, তার অন্তিমকাল আসন্ন—এই কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু হিন্দুজাতি এই বছরেই বা আগামী দশ-বিশ বছরের মধ্যে মরছে না, তার মৃত্যুদশা ঘনিয়ে এসেছে আজ থেকে দু'শতাব্দী পরে, মহাত্মা গান্ধী সেটাই দিব্য-দৃষ্টিতে দেখেছেন। সনাতনীদের মত হয়ত এই যে হিন্দুরা যেভাবে বাঁচিয়ে এক শতাব্দী রেখে এল, অস্পৃশ্যতার জন্যেই সে মারা যাবে, এ-কথা কেমন করে হতে পারে ? সে-সুদূর ভবিষ্যৎ তাদের কাছে কাল্পনিক, মহাত্মার কাছে তা প্রত্যক্ষ। তাঁর চশমার লং-সাইটে—দু'শ বছর পরের দশা তিনি দেখেছেন। কিন্তু আজ এই মুহূর্তেই আমাদের অন্ন চাই, বস্ত্র চাই,—আত্মসম্মান চাই—আজ থেকে দশ বছরের মধ্যে স্বাধীনতা—উঁহু—সমাজতন্ত্রী স্বায়ত্তশাসন না হলে প্রতিদিনের দুর্দশা থেকে আমাদের নিস্তার নেই। কিন্তু এই মুহূর্তের প্রয়োজনের কোনই ওজন নেই মহৎ-দ্রষ্টার কাছে, আজকের হাহাকার তাঁকে পীড়িত করে না। তিনি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীর হয়ে লড়াই করছেন, স্বদেশের স্বার্থ-সাধনেই তাঁর লক্ষ্যলাভ নয়, নিজের দেশের সমস্যার সঙ্গে সর্বদেশের সমস্যা-সমাধানেই তাঁর আনন্দ ; আত্মীয়-মিত্রের সঙ্গে অনাত্মীয়-অমিত্রের অনিষ্ট-মোচনেই তাঁর ইষ্ট-সিদ্ধি ; এই মুহূর্তের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দু'শ বছর পরের দুর্দশাকে তিনি দূর করতে চান। মহৎ-দ্রষ্টার স্বভাবই এই, এমনকি এটা তাঁর অপরাধও। অদ্ভুত শোনাতে পারে তবু একথা সত্য যে, মহৎ-দ্রষ্টার দূর-দৃষ্টি আপাততঃ তাঁর সমকালীনদের দুরদৃষ্ট দূর করতে পারে না।

তবু তাঁর যথার্থ-রূপেই মহাত্মাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আজ আমার অন্নাভাব, এটা খুবই বড় সমস্যা, তিন বছর পরে যদি আমার মৃত্যু ঘনিয়ে থাকে, সেটাও তার চেয়ে কিছু কম নয়। মহাত্মা শরমায় দিতে চান না, পরমায়ু দিতে চান—অসামান্য দানেই তাঁর অভিরুচি।

হরিজনদের অঙ্গীকার না করলে হিন্দুদের জনহানি হবে, এমনকি অঙ্গহানিও হতে পারে ; কিন্তু মহাত্মাজী বলছেন, কেবল তাই নয়—তাতে করে হিন্দুজাতির তথা ভারতের প্রাণহানি হবে। যে-ব্যবস্থায় এই দীর্ঘজীবী জাতি এতদিন টিকে এসেছে তাই মেনে চলে

তা কখনো টেঁসে যেতে পারে না, এই হলো সনাতনীদের জবাব। মহৎ-দ্রষ্টার ভবিষ্যৎ বাণীর মধ্যে নিছক দার্শনিক-তত্ত্ব ছাড়াও বৈজ্ঞানিক সত্য কিছু আছে কি না তার বিচার দরকার—কেননা তাঁর মহৎ-দর্শনের মর্মকথাটা এখনো অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়।

বড় বড় বংশধারা আপনা হতেই মরে আসে; যখনই সে বংশধারা বড় হয়ে ওঠে তারপরেই তার বিনাশের পালা। এক একটি মনুষ্যবংশ মহীরুহের মতো বিস্তৃত হতে থাকে—তার শ্রেষ্ঠ ফলকে উদ্ভিন্ন করার আত্মপর তপস্যা নিয়ে; যখনই সেই ফুল ফুটল বা ফল ধরল তখনই সেই বহুবংশবিস্তৃত বৃক্ষ-জীবনের চরম প্রত্যাশা পূর্ণ হয়ে গেল, তার একান্ত নিজের যে জিনিষটি জগতকে দেবার ছিল দেওয়া হয়ে গেল, তার কাজ শেষ হলো, দান ফুরোলো তার দাবীও ফুরালো—চিরকালের মানুষের কাছে চরম কথাটি বলা হয়ে গেল তার, তারপরেই তার পরম সমাপ্তি। সারা দুনিয়ার ইতিহাস হাতড়াবার দরকার নেই—ঘরের কাছেই ঘরোয়া খবর মিলবে। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, চিত্তরঞ্জনের বংশ নেই—রবীন্দ্রনাথের বেলাও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। যদিচ কোথাও কোনো কোনো প্রতিভাধরের পরেও দু'তিন পুরুষ দেখা গেছে, কিন্তু সেখানেও দেখা যাবে যে প্রতিভার রাজটীকা নেই পরবর্তীদের ললাটে, তাদের কোনোরকমে টিকে থাকা কেবল। ঈপ্সিত অভিব্যক্তিকে পূর্ণ-বিকশিত করার প্রয়াসে বংশধারার সমস্ত প্রাণ-শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়—তারপরেও যদি কিছু বা অবশেষ থাকে, তার মধ্যে প্রাণও থাকে না, শক্তিও থাকে না।

বিশেষ বংশধারার বেলায় যা সত্য বহু বংশধারার সম্মিলনী যে জাতি তার জীবনীতেও সেই সূত্রেরই প্রকাশ। সভ্যতার চূড়ায় যে জাতি উঠে গেছে, তাদের সম্বন্ধে ভাবনার কথা—আর কোনোই সম্ভাবনা নেই তাদের, দিন তাদের ফুরিয়ে এল। গ্রীস, রোম, মিশরের সভ্যজাতিদের কথা স্মরণ করা ভালো, যেহেতু স্বর্গতদের শব-ব্যবচ্ছেদ থেকে অদ্য মুমূর্ষুকে বাঁচাবার নিদান মিলতে পারে। গ্রীক রোমক সভ্যতাই বা নিকৃত হলো কেন, আর হিন্দু-সভ্যতাই বা অব্যাহতি পেয়ে গেল কী করে—এর মূল খুঁজতে গেলে আমরা দেখতে পাবো যে, নানা বর্ণে বিভক্ত হিন্দুরা কখনই গ্রীক রোমকদের মতো আপাদমস্তক একসাথে সভ্য হয়ে ওঠেনি, কাজেই তারা যেমন ফুলেছে তেমনি মরেছে, কিন্তু আমাদের সর্বাঙ্গ কোনোদিন একসঙ্গে কাঁপার সুযোগ পায়নি, এই হেতু সভ্যতার সেঁকো বিষ যেমন আস্তে আস্তে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়েছে—শেষের সেই বিষম দিনটিও তেমনি পিছিয়ে গেছে অনেক পরে। কিন্তু তাহলেও আমাদের জীবন-সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সেই সন্ধিক্ষণের বেশি আর দেরি নেই; এই তথ্য আজ ধরা পড়েছে মহৎ-দ্রষ্টার চোখে।

যে-ব্রাহ্মণরা হিন্দুসভ্যতার মাথা ছিল, তারা এখন টিকি-তে গিয়ে কেন টিকলো—কেবল টিকিতেই নয়, টাকাতেও বটে—তার কারণ বোঝা অতঃপর কঠিন হবে না। ব্রাহ্মণ-সভ্যতাও গেছে, ক্ষত্রিয়-সভ্যতাও গেছে—শক্তি ও মনীষীর আভিজাত্য এখন অব্রাহ্মণের পদতলে। আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষা ব্রজেন্দ্র শীল, শ্রেষ্ঠ কর্মশক্তি মোহনদাস গান্ধী—দু'জনের কেউই উচ্চবর্ণ নন। বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ—কেউই বামুন নন এঁরা। বামুনের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য, রঘুনাথ, রঘুনন্দনের সম্ভাবনা আর নেই। কেশব সেন ও শিশির ঘোষ, মতিলাল আর বিপিন পাল, গঙ্গাধর কবিরাজ আর মহেন্দ্র ডাক্তার, অশ্বিনী দত্ত ও মনীন্দ্র নন্দী, যতীন্দ্রমোহন ও যতীন্দ্র দাস, মাইকেল

এবং দীনবন্ধু; গিরিশ ঘোষ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর, লালচাঁদ ও অতুলপ্রসাদ, রাসবিহারী বোস এবং ঘোষ, যতীন বসু ও গোষ্ঠ পাল, জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র ও শরৎ বোস, মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন বোস, রাজনারায়ণ বোস আর রাজেন মল্লিক, নীলরতন এবং বিধান রায়, আমবেদকর আর নন্দলাল, প্রমথেশ বড়ুয়া ও সুরেশ মজুমদার, এন এন সরকার আর প্রেমেন্দ্র মিত্র—নিজের নিজের ক্ষেত্রে এক এক দিকপাল—এঁদের সবাই অব্রাহ্মণ। সাহিত্যে বা শিল্পে, জ্ঞানে কিম্বা মনীষায়, স্বার্থত্যাগে আর আত্মত্যাগে, কৃষ্টির ক্ষেত্রে কি সৃষ্টির ক্ষেত্রে—যাঁরাই বাঙালীকে বড়ো করেছেন, তাঁদের শতকরা পঁচানব্বই জনই প্রথম বর্ণের বাইরে।

কিন্তু হিন্দু সভ্যতাকে বাঁচতে হলে কেবল শূদ্রের প্রাণশক্তির পুঁজির উপরেই নির্ভর করে থাকা চলবে না তো—কেননা তাই-বা আর কত দিনের? উত্তম বর্ণের দিন যদি গিয়ে থাকে, মধ্যম বর্ণেরও তবে যাবার মুখে—অতএব হিন্দুর আজ বিশেষ করে দরকার তথাকথিত অধমবর্ণকে; অন্ত্যজকে অন্তরঙ্গ না করলে কালের করালগ্রাস থেকে তার রেহাই নেই। নতুবা যে-নিরুদ্দেশে গেছে গ্রীক-রোমক সেই দিকেই তারও দুর্গতি —জগন্নাথও যে-পথে বলরামও সেই পথে।

'পারিয়াও' যে সবদিক দিয়ে উচ্চবর্ণের শ্রেষ্ঠতমদের সমকক্ষ হতে পারে, একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আমি দেবো—এজন্য অবশ্যি আমি পুরানো পুঁথির পাতা উল্টাবো না, কবীর, নানক, দাদুকে ধরেও টানাটানি করতে চাইনে, সমসাময়িক এক মুচির ছেলের কথাই আমি এখানে বলবো—

তথাকথিত নীচকুলে, গরীব মুচির ঘরে দীননাথ দাসের জন্ম। গ্রামের পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়ার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু অল্পবয়সেই কলকাতার গোয়াবাগানে এসে জুতোর কারবার তাঁকে শুরু করতে হয়। কিন্তু সেই বয়সেই ব্যবসায়-প্রতিভার যে পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তা সামান্য নয়; সেই সময়ে ১২৭২ সালের বিখ্যাত আশ্বিনে-ঝড়ে চামড়া-বোঝাই এক বিলিতি জাহাজের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে, তখন তার জলমগ্ন চামড়া সস্তায় কিনে দীননাথ কিস্তি-মাৎ করেন। সেই থেকেই তাঁর ব্যবসা বেড়ে উঠতে থাকে। তারপরেই তিনি বিদেশী-ট্যান-করা চামড়া বর্জন করে এ'দেশী চামড়ার টান দেশান-এখানেই ট্যানিং-এর কারখানা পত্তন করেন। আজকাল অবশ্যি স্বচর্মপ্রিয়তা সুলভ—'স্বচর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরচর্মো ভয়াবহঃ', এই হচ্ছে এ-যুগের বাণী—কিন্তু সে-যুগে স্বদেশী-চর্ম-নিষ্ঠা যাঁরা দেখিয়েছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম। রাজা রাজকিষেণ স্ট্রীটে রাধা-গোবিন্দজীর মন্দির প্রতিষ্ঠাও তাঁর কীর্তির একটি—অনাহারী অতিথির জন্যে যে-দেবায়তন সর্বদাই মুক্তদ্বার, বোধহয় সারা ভারতবর্ষে এই হচ্ছে হরিজন-প্রতিষ্ঠিত একমাত্র দেবমন্দির। কিন্তু চর্ম-নিষ্ঠার জন্যও না, ধর্ম-নিষ্ঠার জন্যও নয়, তাঁকে আমি বড়ো বলছি তাঁর কর্মনিষ্ঠার জন্যই; তাঁর অগাধ ধনশক্তির সাহায্যে যে অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে ব্যক্ত করেছিলেন অসংখ্য জনসেবায়—নানান লোকহিতকর কাজে (ইস্কুল, হাসপাতাল, লাইব্রেরী, অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, পথকষ্ট মোচন ইত্যাদিতে)—সেইজন্যই তিনি মহৎ, দেশকল্যাণব্রতের ইতিহাসে যাঁরা কীর্তি রেখেছেন ও রাখবেন, তিনি তাঁদের সঙ্গে কীর্তিত হবেন।

এই সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনীর অবকাশে যে অসামান্য কর্মপ্রতিভা ও লোকহিতৈষণার পরিচয় আছে, তাই থেকেই অনুমান করা কঠিন হবে না যে এই অনালোকিত লোকের

অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত কূলে কূলে যে বিরাট প্রাণশক্তির স্রোত কুলকুল করে বইছে, এটা তার একটা ঢেউ মাত্র। যেখানেই, ভাগ্যক্রমেই হোক, পারিপার্শ্বিক সুযোগেই হোক বা পুরুষকারের বলেই হোক, বাইরের বাধা সরিয়ে কোনো অন্ত্যজ নিজের অন্তরকে উন্মোচিত করতে পেরেছে, সেখানেই প্রাণ-শক্তির এই বিস্ময়কর উদ্ভাসনা প্রত্যক্ষ হয়েছে।

পারিয়ার প্রাণের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, অনপচয়িত ; বিপুল সম্ভাবনা উন্মুক্তির অপেক্ষায় সেখানে উন্মুখ, উপর থেকে জগদ্দল পাষাণের বাধাটা সরিয়ে নিলেই হয়। মহাত্মার অচল-আয়তনের দ্বারমুক্তি-ঘোষণা আর কিছুই না, হরিজনের আত্মপ্রকাশনার পথ। ওদের মধ্যে বিপুল ও বিচিত্র প্রতিভা ফেটে পড়বার প্রতীক্ষায় রয়েছে, যখন ফাটবে বন্যার মত ফাটবে, দেখতে না-দেখতে আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে, রাজনীতিতে, সমাজ-দর্শনে, লোকযাত্রায়—এককথায় গোটা হিন্দুসভ্যতার মোটা পটভূমিতে নবজীবনের পূর্ণ প্লাবন নিয়ে আসবে।

অতীত-কীর্তির অজুহাত নিয়ে টিকব, মহাকালের কাছে এ আব্দার চলে না, বাঁচতে হলে ভবিষ্যতের মূলধন চাই। অচল-এর পরেই অধম—শুধু প্রথমভাগেই নয়, জীবনের সব বিভাগেই, অতীত আঁকড়ে বসে আছে বলে উচ্চবর্ণের হিন্দু, জীবনের সব ক্ষেত্র থেকে হটে যাচ্ছে, ক্রমশঃ হটে যাবেও তারা—যদি না সময়ের সঙ্গে হেঁটে যায়। সময়মত দু'-চারটে জোড়াতালি লাগিয়ে সময়োচিত হওয়া যায় না, আধুনিক-গ্লাসকেসে রাখা মিউজিয়মের জীবরা বর্তমানের সমসাময়িক নয়। ভবিষ্যতের মূলধন চাই—এই মূলধন আছে হরিজনদের। আর আছে ভারতীয় মুসলমানের। প্রতিভার মহাপ্লাবন তাদের মধ্যে ও প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। মোগল, পাঠান, তুর্কী, ইরাণীর যে-বংশধরেরা এদেশে আছেন, তাঁদের কথা আমি বলছি না, তাঁদের রক্তও ফুরিয়েছে বলেই মনে করি, কিম্বা হয়ত তাঁদের দিশা উচ্চ হিন্দুর মতো অতটা কাহিল না হতেও পারে ; আমার ভবিষ্যদ্বাণী এদেশী মুসলমানের সম্বন্ধে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হরিজন আত্মসাৎ করে সম্ভাবনার ঐশ্বর্যে হিন্দুকে সত্যিই যারা বে-দখল করেছে। সংখ্যা বাগিয়ে বা শঙ্কা জাগিয়ে মুসলমানেরা বড়ো হচ্ছে একথা বলা মিথ্যা কথা বলা—বড়ো না হয়ে পারে না বলেই তারা বড়ো হচ্ছে। আগামী শতাব্দীতে এদেশী মুসলমানের আর হিন্দুদের মধ্যে যারা অন্ত্যজ তাদেরই জয়জয়কার।

অতএব হিন্দুকে যদি জাতি হিসেবে বাঁচতে হয়, তাহলে হরিজনদের স্বীকার করতেই হবে, কেবল ছোঁয়াছুঁয়ির আওতায় এনেই নয়, সামাজিক আত্মীয়তার স্বীকরণে—বৈবাহিক আদান-প্রদানে—রক্তের অঙ্গীকারে এক হয়ে। বস্তুত, এই রক্তমিশ্রণের উপরেই উচ্চ হিন্দুর পুনরুজ্জীবন, নব-প্রতিভায়ন নির্ভর করছে। সার্বজনিক একাত্মীয়তা হলো হিন্দুসভ্যতার গোড়ার কথা, তাকে অস্বীকার করে টেকা যদি বা যায়, বাঁচা যায় না।

হর্সরেসের সঙ্গে হিউম্যান রেসের মিল এইখানেই যে, একই ঘোড়া কিছু বরাবর জেতে না—বাজির পর বাজিতে জিতে জিতে যায় না, ডিগবাজিও খায়, তেমনি একজাতের জয়যাত্রাও চলে না বরাবর। পরিশুদ্ধ রক্তের নির্জীবতা যতই বেড়ে চলে, অতীত কীর্তি আর গতানুগতিকতার বোঝা ততই তার গতিবেগ মন্দ করে—যেমন বিজয়ী ঘোড়ার হ্যাণ্ডিক্যাপ বাড়ার সাথে সাথে সে পিছিয়ে পড়তে থাকে, তখনই আসে পেছনের ঘোড়ার বাজি মারার পালা।

ইতিহাস মাঝে মাঝে নোটিশ না দিয়েই মোড় ঘোরে, যে ছিলো সবার পেছনে,

সে এসে পড়ে সবার আগে; পায়ের নীচে যার ঠাঁই ছিল, হঠাৎ দেখি তাকে ঘাড়ের ওপরে। এই ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়ে আর্য্য, মোগল ও পাশ্চাত্য সভ্যতার রথচক্র চলে গেছে, ইতিহাসের পাতায় তারই দাগ খুঁজে খুঁজে যে-মুহূর্তে সবাই আমরা মুহ্যমান তখনই মহৎ- দ্রষ্টা তার তৃতীয় নেত্রে মহত্তর সভ্যতার অভ্যুদয় লক্ষ্য করেছেন। হরিজন আন্দোলনে সেই মহৎ সম্ভাবনার সূচনা সেই আগামী সভ্যতার আগমনী তাঁর তৃতীয় নেত্রের ইসারা। কিন্তু আমরা কি সাড়া দেব?

শূদ্র না ব্রাহ্মণ?

সমস্ত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করা হোক, এই মর্মের একটা প্রস্তাব সম্প্রতি হয়েচে।

এই প্রস্তাবে আমার আপত্তি। পৃথিবীর কোথাও একদল মানুষ আছে যারা নরখাদক, সেই কারণে পৃথিবীর সব মানুষকে নরখাদক বলে ঘোষণা করা হোক—এই মতে আমি কিছুতেই সায় দিতে পারিনে। বরং আমার মতে, সম্ভব হলে, নরখাদকদেরই মানুষ করার পক্ষে চেষ্টা হওয়া উচিত।

'ইংরাজ—এই শব্দটি উচ্চারণ করলে পৃথিবীর আজ যে-কোনো প্রান্তে যে-কেহ সমঝদার লোক বুঝতে পারে যে, এই নামধেয় যে-জাতি, তারা বর্বরতার একটা সভ্যরকম রূপ দিতে পেরেচে; অত্যাচারকে শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে চালাতে পেরেচে এবং শোষণের ফলে শোষিতের হৃদে অবিমিশ্র আনন্দ দান করতে পেরেচে—এইরকম অসাধারণ প্রয়োগনৈপুণ্য আছে বলেই পৃথিবীর তারা অষ্টম আশ্চর্য্য। বর্তমান যুগে ইংরেজ যা সম্ভব করেচে সেই-বস্তু অতি-প্রাচীন যুগেই আমাদের ব্রাহ্মণেরা সমাধা করেছিলেন। এখনো তাঁরাও কিছু কম যান না—পৃথিবীর আদিম আশ্চর্য্য তাঁরা।

শোষণের জন্যই শাসন—এই সনাতন মূলনীতির মূলাধার ব্রাহ্মণ। শোষণকে প্রচ্ছন্ন করতে হলে শাসনকে একটা আদর্শের নামে খাড়া করতে হয়, অতীতকালের ব্রাহ্মণরা ডিপ্লোম্যাসির এই গূঢ়-তত্ত্ব ভালো করেই জানতেন। ভারত যে একদা সভ্য ছিল অর্থাৎ বর্বরতাকেও লজ্জা দিতে পেরেছে—সেকালের বামুনেরাই তার প্রমাণ।

'ও'—এই একাদশ বর্ণকে অনুনাসিক সুরে উচ্চারণ করলে যে প্লুতস্বরের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটলে শূদ্রের বিষম দশা! তা যদি শূদ্রের কণ্ঠ থেকে বেরোয়, তাহলে তার জিভ কেটে ফেলতে হবে এবং যদি কানের ভেতরে ঢোকে তাহলে তার কর্ণকুহরে সীসে গলিয়ে ঢালার সুব্যবস্থা। বামুনদের সভ্যজনোচিত শাসন-নীতির এমন বহুতর দৃষ্টান্ত মনুসংহিতার পাতায় পাতায়। জলদস্যুদের যে-সব বংশধর আধুনিককালে সভ্য হয়ে উঠেচে শাসন-নীতির দিক দিয়ে 'দেববংশসম্ভূত' পৌরাণিক ব্রাহ্মণদের এখনো তারা লজ্জা দিতে পারেনি।

শোষণ-নীতির দিক দিয়েই পেরেচে কি?

আমি বলি, আজ্ঞে না।

ইংরেজরা রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতিকে জড়ীভূত করবার চেষ্টা করেচে বটে, কিন্তু প্রায়ই তার জোড় ভাঙে—তখন দ্বিধাগ্রস্ত দুই নীতির আপনা-আপনির মধ্যে ঠোকাঠুকি

বেঁধে যায়। কিন্তু সেকালের ব্রাহ্মণ ধর্মনীতির সঙ্গে অর্থনীতির যে-সমন্বয় সাধন করেছিলেন তা আজো অক্ষুণ্ণ রয়েচে—তাঁরা সেই প্রাচীন যুগে যে শোষণ-যন্ত্রের স্থাপনা করে গেছেন তার যন্ত্রণাহীন চক্রতলে নিষ্পিষ্ট হতে আজো আপনা থেকেই লোক এগিয়ে আসে। সত্যি দিব্যদর্শন ছিলো বইকি তাঁদের। কেননা, এই মানুষ-পেষা-কল চালিয়ে তাঁদের বংশধরেরা যে চিরকাল ধরে করে খাবে, এটা তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁদের দূরদৃষ্টির বলেই এই সেদিন পর্যন্ত বামুনরা নিজেদের দূরদৃষ্টিকে ঠেকিয়ে এসেচে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাকসো আদায়ের যে 'শিডিউল' তাঁরা সেকালে বেঁধে গেছেন একালে এমন কোনো আর্থনীতিক মাথাই নেই যে তার সমান একটা কিছু বানাতে পারে। বারো মাসে তের পার্বণ, নিত্য-নৈমিত্তিক পূজার্চ্চনা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, চন্দ্র-সূর্য- গ্রহণ—এসব তো লেগেই রয়েছে—বরাবরের ব্যাপার। কিন্তু এসব উপলক্ষে পৌরোহিত্য করবে কে?—বামুন। দান করবো কাকে?—বামুনকে। দানের বৈচিত্র্যই-বা-কতোরকমের! সোনা-রূপো হাতী-ঘোড়া কাপড়-চোপড় বাসন-কোসন থেকে সুরু করে কাহন কাহন কড়ি পর্যন্ত—যার যেমন সাধ—যথাসাধ্য!

শুধু কি দান? তার সঙ্গে গণ্ডেপিণ্ডে ভোজন! নেহাৎ কম হলেও অন্তত 'দোয়া-দম্পতিকেও' তো খাওয়াতে হবে? এবং ভোজনের সঙ্গে দক্ষিণাটাও নগদ! অথচ দাতার পুলক ধরে না। অপাত্রে এই নির্বিচারদানের কোনো যুক্তি হয় না, কিন্তু দাতার মনে কোনোই প্রশ্ন নেই। এই কায়মনোবাক্য দানের ফলে তাঁর অক্ষয় স্বর্গবাস কায়েম হচ্ছে! শোষণের ফলে তোষণের সৃষ্টি করার অদ্ভুত এই প্রতিভা, আমি শুধু ভাবি, সে-যুগে এ-সম্ভব হলো কি করে? এ-যুগের ট্যাকসো আদায়ের একালের রকম-কায়দার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অবাক হতে হয়—কানুনের হেরফের থাকলেও কায়দায় এরা এতই অনুরূপ যে, মৌলিকতার দিক নিয়ে রূপের মিল অণুমাত্র হলেও লৌকিকতায় এরা সমগোত্র। ইতিহাসের মতো, সভ্যতাও কি খোল-নলচে বদলে বদলে আসে নাকি?

এবং আরো বিস্ময় এই যে, আওরঙজেবের বহুপূর্বে জন্মগ্রহণ করেও মানুষের ওপর ট্যাকসো আদায়ের যে-বিধিনিষেধ তাঁরা বের করেছিলেন তা যেমন বিচিত্র, তেমনি অপূর্ব; এমনি কি এ-বিষয়ে পরবর্তী আওরঙজেবকেও তাঁরা টেক্কা মেরে গেছেন। মনে করুন, কোনো ভাগ্যবান ভারতভূমিতে জন্মালেন। ছ'দিনের দিন তাঁর ষেটেরা পুজো, ছ'মাসে অন্নপ্রাশন, ছ'বছরে উপনয়ন,* তারপরে বিয়ে, তারপরে তাঁর বংশবৃদ্ধি এবং সর্বশেষে তাঁর শ্রাদ্ধ!—এর সব উপলক্ষেই বামুনদের ট্যাকসো দিতে হবে। এমনকি, মরেও খাজনা এড়িয়ে ফাঁকি দেবার যো নেই। অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ যে একদা জন্মেছিলেন, তার জন্যে অতি-আধুনিক প্রপৌত্রকে প্রতি বছরে ট্যাকসো দিতে হয়। শ্রাদ্ধ গড়ায় অনেক দূর।

বণিকবৃত্তি বা ব্যবসা-বুদ্ধিতেই কি তাঁরা কম ছিলেন? এমন অপবাদ তাঁদের কোনো শত্রু, এমন কি আমিও দিতে পারবো না। বিনা পুঁজিতে লিমিটেড বা আনলিমিটেড কোম্পানি গড়ে যে-সব কারবার অতি পুরাণকালে তাঁরা ফেঁদে গেছেন, আজ অব্দি

---

* শূদ্রের না হলেও ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এদের উপনয়ন হোতো—ব্রাহ্মণেতর সবাইকে আমি শূদ্রের মধ্যে ধরেছি, যেহেতু তাঁদের বংশধরেরা সবাই আজ শূদ্র। অবশ্যি বামুনের ছেলেরও পৈতে হোতো—নিজেদের নিয়ম নিজেরাই তো নাকচ করতে পারেন না;—এইজন্যে তাঁরা নিজেদের বেলা 'যাকড় মারলে থোকড় হয়'-এইভাবে নিয়মের পিঠরক্ষা করতেন।

তার একটাও দেউলে হয়নি, বরং লভ্যাংশে বেড়েই চলেছে দিন-দিন। এই গুরুগিরির ব্যবসাটাই কি কম ফলাও? কিঞ্চিৎ শব্দব্রহ্মের বিনিময়ে বংশানুক্রমে কান মলে কাঞ্চনমূল্য আদায়। বিনা ট্রেডমার্কেই এই ব্রহ্মের ব্যবসা চলে! তীর্থ, মঠ, গুরু, আর মোহন্ত—এদের উপায়ের কাছে ফোর্ড-রকফেলার সাহেবের আয়ও কিছু না।

সভ্যতার দুটো দিক, একদিকে তার হীনবৃত্তি আর একদিকে তার উন্নতি। একদিকে সে বর্বর—নিজে বাঁচবার জন্য অপরকে মারতে তৈরি সে; বিধাতার দেওয়া দুটো হাত আলিঙ্গন করার পক্ষেই যথেষ্ট, অপরকে শাসন ও শোষণ করার জন্য তাই সে এখানে আরো ছ'টা হাত সৃষ্টি করে সেজেছে অক্টোপাশ; এখানে তার কূট চাল ও নখদন্ত-চালনা কখনো প্রকাশ্যে কখনো প্রচ্ছন্ন। ইউরোপীয় সভ্যতার এইদিকে আছে বার্কেনহেড, ডায়ার—এদের মতো লোকেরা।

কিন্তু সভ্যতার আরেকটা দিক আছে যেখানে তার উন্নতি, যেখানে তার ঐশ্বর্য, যেখানে সে অপরকে দিতে উন্মুখ, যেখানে সে অপরকে বাঁচালে ভাবে আমি বাঁচলুম, যেখানে অপরে অসম্পূর্ণ থাকলে তার নিজের পূর্ণতা নিরর্থক মনে হয়; যেখানে সে বলে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ তেনাহং কিম্ কুর্যাম্। ইউরোপীয় সভ্যতার এদিকটায় আছেন ইউরোপের দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক, শিল্পী-কবি-মনীষীরা। সভ্যতার এই অংশটাই অপরাংশকে অসম্পূর্ণতার লজ্জা, এ অগৌরব থেকে মোচন করে, তার ভারকেন্দ্র স্থির রাখে, সভ্যতাকে যাতে সভ্যতা বলেই সন্দেহ হয়—এমন বিভ্রম-রচনার চেষ্টা করে।

কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রাচীন সভ্যতায় আমরা কেবল প্রথম গোত্রেরই পরিচয় পাই—যেখানে সে আত্ম-প্রসাদের জন্য দু'হাতে বাড়িয়ে কেবলি নিয়েছে; কিন্তু সেই আত্মপ্রসাদের জন্য যেখানে দু'হাতে দিতে হয়, সভ্যতার সেই ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের দেখি অতি কদাচ। একেবারেই-যে দেখিনে তা নয়, কেননা বামুনদের মধ্যেও কখনো কখনো মানুষ জন্মাতে পারে।

এইজন্য ব্রাহ্মণ-সভ্যতার একদিকে যেমন মনু, পরাশর, পরশুরাম প্রভৃতিকে দেখিতে পাই—যারা দোর্দণ্ড প্রতাপে দোহন করেছে, শাসন করেছে, নির্বিচারে হত্যা করেছে ও চক্রান্ত করেছে; তেমনি অপরদিকে বাল্মীকি ও বেদব্যাসের মতো অপরাজেয় স্রষ্টার সন্ধান পাইনে। এইজন্য সভ্যতার যে একাংশে বামুনের একচ্ছত্র, সেখানে তারা যা রেকর্ড রেখে গেছে, এ অবধি বহু বহু সভ্যজাতি প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেই রেকর্ডের কাছাকাছিও ঘেঁষতে পারেনি। ব্রাহ্মণ পরশুরামের সঙ্গে ম্লেচ্ছ ডায়ারের তো তুলনাই চলে না, হত্যা-নৈপুণ্যে পরশুরামের কড়ে আঙুলের যোগ্যতাও ডায়ারের নেই।

ব্রাহ্মণ-সভ্যতাই যদি ভারতীয় সভ্যতার শেষ কথা হোতো, তাহলে তেমন দুর্দিন পৃথিবীর আর কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণপ্রাধান্য এড়িয়ে উঠতে না পারলেও তার সভ্যতাকে পেরিয়ে যা উঠেছিল, তাই হচ্ছে হিন্দুসভ্যতা—এই সভ্যতারই দিগ্‌ব্যাপ্ত কিরণের মধ্যে ব্রাহ্মণের কলঙ্কও অনেকটা শোভার মতোই দেখাচ্ছে। এই সভ্যতা আসলে ব্রাহ্মণেতর জাতির সৃষ্টি।

ব্রাহ্মণ-সভ্যতার দুটি পুঁজি, মনুর শত কাল আর পরশুরামের পরশু; পেনাল কোড আর রেগুলেশন লাঠি। কিন্তু হিন্দু সভ্যতার মধ্যেই আমরা পাই ভারতের দর্শন, কাব্য, শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য—তার ঐশ্বর্যের সহস্রমুখী উৎসার! তার মধ্যেই আমরা পাই, দস্যু বাল্মীকির রামায়ণ, জেলেনীর ছেলে বেদব্যাসের মহাভারত। যে উপনিষদের

পর্বে আমরা মশগুল তারও বেশির ভাগ ক্ষত্রিয়ের রচনা। আয়ুর্বেদ, রসায়ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও অব্রাহ্মণেরই প্রতিভা!

এই হিন্দুসভ্যতায় ব্রাহ্মণের দান অতি সামান্যই, বলতে গেলে ব্রাহ্মণের থেকে যতটা এ নিয়েছে—বর্ণ-বিচার, স্পর্শদোষ আর 'ন-স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—তাই এর কলঙ্ক। ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রভাবিত না হলে এ সভ্যতা আরো প্রাণবান, আরো বেগবান, আরো বীর্যবান হতে পারতো—বিশ্ববিজয় করতো এ -সভ্যতা। ভারতীয় এই সভ্যতায় অনার্যের দান আছে, বৌদ্ধের দান আছে, মুসলমানের দান আছে। এর স্রষ্টাদের মধ্যে এককালে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হয়ত ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব নেই, বিপুল শূদ্রশক্তি আত্মসাৎ করেছে তাঁদের। শূদ্রের দ্বারাই এই সভ্যতার সৃষ্টি ও পুষ্টি, এজন্য আমি একে বলবো শূদ্রসভ্যতা এবং এইজন্যই এ বিরাট, এই এর মাহাত্ম্য—ব্রাহ্মণসভ্যতার চেয়ে ঢের ঢের বড়ো—এই হিন্দুসভ্যতা। ব্রাহ্মণ না জন্মালেও এ হোতো এবং ব্রাহ্মণ লোপ পেলেও এ থাকবে। বরং বামুনের প্রাধান্য লোপ পেলে এই সভ্যতার প্রাণশক্তি পূর্ণ-মুক্তি পাবে; বৌদ্ধযুগে যেমন হয়েছিল তেমনি ভারতের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য আবার সহস্রদলে আত্মপ্রকাশ করবে।

হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের প্রভাব কী উপায়ে ঘোচানো যায় তাই আজকের সমস্যা। আজকের সমাজের ওপর আজকের বামুনদের, বামুন বলে কোনো প্রভাব আছে, এ আমি মনে করিনে। যে-ব্রাহ্মণ এখনো এর কাঁধে বসে কণ্ঠরোধ করে রয়েছে তা অতীতের কঙ্কালমূর্তি—তার কালকবল থেকে মুক্ত করা মানে একে অতীতের কবল থেকে বিমুক্ত করা। এবং এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির আর যে উপায়ই থাক, সমস্ত হিন্দুকে বামুন বলে ঘোষণা করা সে-উপায় নয়। কেননা প্রথমত, তাতে সমস্ত হিন্দুরা তথা বামুনের মানহানি; দ্বিতীয়ত, যে-বস্তুর বিলোপ বাঞ্ছনীয় এবং বস্তুত যা মরতে বসেছে তাকেই শুধু মর্যাদা দেওয়া নয়, জীইয়ে তোলা।

তাই, ঘোষণা যদি করতেই হয়, অব্রাহ্মণনির্বিশেষে সবাইকে শূদ্র বলে ঘোষণা করাই ভালো, কেননা শূদ্র বামুনের চেয়ে মহত্তর জাত! 'মহত্তর' বললাম বলে কেউ যেন না মনে করেন যে, বামুনদের, জাত হিসেবে, আদৌ, আমি মহৎ বলে মনে করি। কিন্তু মহৎ বলে মানি আর নাই মানি, নিপুণ বলে তাঁদের আমি মানবো। যে-অশ্বমেধের ঘোড়া দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল, তার মুখে লাগাম লাগিয়ে তাকে ময়লা-টানা গাড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়ার মধ্যে মহত্ত্ব না থাক, নৈপুণ্য যথেষ্টই। যে শূদ্র-ভারত একদা বৌদ্ধযুগে আপন আত্মার পূর্ণ প্রকাশকে ধরে রাখতে না পেরে, নিজের কূল ছাপিয়ে, অর্ধেক পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে তার আদর্শের সাম্রাজ্য-বিস্তার করতে চেয়েছিল, তাকেই আবার অন্ধকূপের মধ্যে টেনে কোণঠাসা করে আনা এবং কেবল ইচ্ছামাত্র তার গতিরোধ নয়, ইচ্ছামতো তাকে দিয়ে ব্রাহ্মণ্যের সমস্ত ময়লা টানানো সামান্য বাহাদুরি নয়। মুষ্টিমেয় ইংরেজ যে-কৌশলে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে শাসন করে, মুষ্টিমেয় বামুনের কেরামতি তার চেয়ে একটুও কম নয়। ইংরেজের সম্মুখে আছে সঙ্গীন বন্দুক, কিন্তু বামুনের মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক,—অশুদ্ধ হলেও কিছু যায় আসে না, নিছক বিসর্গের বুলেট দিয়ে যে সাম্রাজ্য আদিযুগ থেকে এ পর্যন্ত সে রক্ষা করেছে, ভূগোলের মধ্যে তার বিস্তার দেখা না গেলেও ভূলোকের দীর্ঘতম কালের ইতিহাসকে তা আচ্ছন্ন করে দীর্ঘতম কালের ইতিহাসকে তা আচ্ছন্ন করে রইলো। মানুষের দুর্গতির এতদূর গতি আর হয় না।

এই জনাই মনে হয় যে, ভারতের ইতিহাসের গতি বদলাতে হলে আগে বামুনের একটা বিধি করা দরকার। অমৃতসরে ডায়ার ভারতের লোককে কী করে বুকে হাঁটাতে পারলো, ভাবতে গিয়ে আমরা চমৎকৃত হই। সরীসৃপকেই বুকে হাঁটানো যায়, মানুষকে না। যুগ-যুগান্তর ধরে যে-জাতি সূত্রগুচ্ছ দেখলেই বুক দিয়ে মাটি আশ্রয় করেছে, সঙ্গীন দেখলে সে যে আরো অনায়াসে তাই করবে এ তো আশ্চর্য কিছু নয়। কেননা, সঙ্গীন ব্রহ্মশাপের চেয়েও সঙ্গীন এবং তার গুঁতো সূতোর চেয়ে একটু শক্তই! বামুনকে কাঁধ থেকে নামাতে না পারলে এ জাত কোনোদিনই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। মনুর স্বত্ব লোপ না পেলে এদেশে মনুষ্যত্বের বিকাশ হওয়া অসম্ভব। সেটা হবে হাওয়ার কেল্লায় আকাশ-কুসুম।

এ জাতির প্রাণশক্তি যে সহস্র ধারায় উচ্ছলিত হয়ে ওঠে না, তার কারণ, সামান্য সঙ্কীর্ণ পথেও আপনাকে প্রকাশ করবার সুযোগ তার নেই—এইজনাই কোনদিনই তার নিজেকে জানা ও নিজেকে পাওয়া হলো না। পৃথিবীর কাছেও সে অচেনা থেকে গেল। মনের সহিত মনের সংস্পর্শ ও সংঘর্ষের ফলেই চেতনার ভাণ্ডারে শক্তির সঞ্চয় সম্পূর্ণ হতে থাকে—সেই শক্তির সাহায্যেই মানুষ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বা সমাজের ক্ষেত্রে জাতি হিসেবে বা ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে। আমাদের সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার সব ক'টা পথই রুদ্ধ।

আমরা নারীকে বলি দেবী, তাকে সমকক্ষ মানুষ বলে ভাবতে পারিনে। অবশ্য নারীকে আমরা নিখুঁত রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে, সবরকম আপদ-বিপদের আঁচ থেকে রক্ষা করেই চলি, কিন্তু আগে খোঁড়া করে রেখে তারপর তাকে মাথায় করে বয়ে নিয়ে বেড়ানোয় দাক্ষিণ্য প্রকাশ পায় না। বিধাতার দেওয়া পা থেকে বঞ্চিত করে কাঁধের ওপর স্থান নিয়ে ভাবতে পারি যে তাকে উচ্চাসন দিলুম, কিন্তু দুনিয়ার দরবারে সে পঙ্গুত্বই হয়ে গেল। মাঝে থেকে আমাদের পা দু'টোয় বিপদ এই হলো যে, তারা মনে করে স্থিরভাবে বহন করাই তাদের কাজ, চলা তাদের নয়।

আমরা মানুষকে দরিদ্র করে রাখি এবং সেই দরিদ্রকে ডেকে বলি, তুমি নারায়ণ; সেটা তাকে স্রেফ উপহাস! তার দারিদ্র দূর করার চেষ্টা আমাদের নয়—সেটা বজায় রাখাই কায়েমী নারায়ণ সেবার অঙ্গ বলে বোধহয়। আমরা মুখে বলি, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম; কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের ছায়া মাড়ালেও আমাদের নাইতে লাগে। তারা যে বামুনের তুল্যই মানুষ, এ কথা আমরা ভাবতেই পারিনে। মানুষমাত্রেই ব্রহ্ম, সে ঠিক; কিন্তু তাই বলে কি তারা ঐ বামুনের সমান? ব্রাহ্মণ যেন ব্রহ্মেরো বড়ো!

এইভাবে নারীর সঙ্গে পুরুষের, নিম্নস্তরের সঙ্গে উচ্চস্তরের, মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলায় অর্থগত, সমাজগত ও ধর্মগত হাজারো রকমের বাধা। অথচ চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সঙ্গ যদি সহজ না হয়, অবাধ না হয়, বিচিত্র না হয়, তবে আমাদের সম্পূর্ণতাই বা আসবে কোন্ পথে, সার্থকতাই বা পাবো কোন্ ফাঁকিতে? মিলনের রহস্যই যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো রহস্য, দেবার ও পাবার ঐ একটিমাত্রই তো প্রণালী।

এযুগের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথ খুলে দেওয়া, চওড়া করা; সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এরই ওপর। রাষ্ট্রনীতিক দিক দিয়ে, আর্থনীতিক দিক দিয়ে, —নানা আদর্শে ও নানানভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টাই আজকের কাজ। এইজনাই যে-কারণে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে আমরা চাই সকলের ধনসাম্য, রাষ্ট্রীয়

ব্যবস্থায় সকলের সমানাধিকার, সেই কারণেই সামাজিক ক্ষেত্রে চাই সকলের একীকরণ। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন যাতে সহজ ও সুন্দর হয়, আমাদের সকল চেষ্টার মূলে সেই প্রেরণা।

কিন্তু সূত্রের দর বাড়িয়ে সবাইকে সূত্রধর বানিয়ে দিলেই এই একীকরণ সম্ভব হবে না, কেননা সাম্যের প্রতীক ব্রাহ্মণ নয়, সে হচ্ছে ভেদের মূর্তি। সবাইকে শূদ্রত্বের মর্যাদা দিয়ে বরং সেটা সম্ভব। ব্রাহ্মণের অতীত কলঙ্কিত এবং ভবিষ্যৎ শূন্যাকার—তার প্রাণশক্তি নিঃশেষিত, তার আদর্শের ক্ষেত্র এতই সঙ্কীর্ণ যে, সেখানে কেবল তাদেরই ধরে, ধরিত্রীর সমস্ত মানুষের ঢোকার পথ আর সেখানে নেই। এই ভারতের স্রষ্টা শূদ্র, এর আদিম অধিবাসী শূদ্র, এর সভ্যতা শূদ্রসভ্যতা। ব্রাহ্মণের দিন ফুরিয়ে এসেচে, বামুনের আগেও এই ভারতে শূদ্র ছিল বরং শূদ্রই পরে থাকবে; কেননা এর প্রাণশক্তি প্রচুর—অফুরন্ত এর সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজের মাথা নয়, তার টিকিমাত্র, পৌরাণিক দুশ্চিহ্ন লোপ পেলে তার একমাত্র ক্ষত এই হবে যে, তাকে ভয়ঙ্কর আধুনিক দেখাবে।

কেউ হয়ত ভেবেই আকুল হবেন, বামুন যদি গেলো তবে ব্রহ্মচর্চা করবে কে! একদল লোক ব্রহ্মসেবা, আরেক দল শক্তিসেবা এবং তৃতীয় দল পদসেবা করলে তবেই-না হবে আদর্শ সমাজ। কিন্তু আহা, আজকের মানুষ যে সম্পূর্ণ হতে চায়,—ব্রহ্মবিদের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, বৈশ্যের ঐশ্বর্য, শূদ্রের শ্রম—সবাতেই সে চায় সমান অধিকার;—ভাগাভাগি হিসেবে আধখানা মানুষ হয়ে তার সুখ নেই। মনুষ্যত্বের পূর্ণতার জন্য যদি ব্রহ্মচর্চার প্রয়োজন থাকে, তাহলে সে প্রয়োজন প্রত্যেক মানুষের—কোনো বিশেষ শ্রেণীর ওপর তার বরাত দেওয়া যায় না। দিলে যা হয় তা ব্রহ্মচর্চা নয়, ব্রহ্মচর্চাড়ি—কেননা এই জিনিষই একজনে পাকিয়ে সকলের পাতে পরিবেশন করতে পারে।

কেবল বিভিন্ন জাতির সভ্যতা আত্মসাৎ করেই হিন্দুসভ্যতা বিরাট হয়নি, বিভিন্ন জাতির রক্তের সঙ্গেও এর মিশ্রণ ঘটেছিল। অনার্য্য, শক, হূণ, দ্রাবিড়ের সঙ্গে যথেষ্ট আর্য্যরক্ত মিলিত হয়ে হিন্দুর দেহ গড়েচে, বৌদ্ধযুগের তো কথাই নেই, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক, কৌলীন্য প্রথার ফলে, বামুনের সঙ্গেও এই শূদ্র-রক্তের নেপথ্য-মিলন ঘটেছে। অদূর ভবিষ্যতে মুসলমান ও খৃষ্টানকে আত্মসাৎ করে এই শূদ্রসভ্যতা আরো মহত্তর হবে। মিলনের পথে, মহিমার পথে আপনাকে সম্পূর্ণ করবে। অচলায়তন ভেঙে মুক্তিপথ রচনার দায়িত্ব তার। ভারতের সভ্যতা বিপ্রবর্ণ নয়, শূদ্রবর্ণ; ভারতের ভবিষ্যৎও তাই!

বিজ্ঞানের সার্থকতা

দিলীপকুমার রায় 'উত্তরা'র পৃষ্ঠে প্রচণ্ড রকমের একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেছেন; আঠেরো-পৃষ্ঠা-ব্যাপী তাঁর বিরাট দক্ষিণা—"বিজ্ঞানের ট্র্যাজেডি"!

লেখাটির মর্মভেদ করে "পূরবী সুরে দ্বিজেন্দ্রলালের সেই করু। গানটি" বার বার আমাদের মর্মভেদ করচে—

"হাহা মশাই আমরা সবাই পড়েছি
এক ভাবনায়,
ভেবে দেখলাম আমাদের আর বেঁচে
কোনই লাভ নাই!"

কেননা শ্রীদিলীপকুমার গবেষণা করেছেন বিজ্ঞান সম্বন্ধে—এর চেয়ে বিজ্ঞানের অতি বড়ো ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে?

দিলীপকুমারের আঠারো পৃষ্ঠার বক্তব্য আঠারো কথায় দাঁড়ায় এই—

"মানুষকে মুক্তি দেওয়া বিজ্ঞানের কাজ নয়। সে কাজ কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, শঙ্কর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রমুখ মহামানবদের।"

উপরে যে কয়জন মহাপুরুষের নাম করা হলো, তাঁরা সকলেই ধার্মিক এইজন্যে যে, এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই এক একটি ধর্ম মোচন করে মানুষের মুক্তির ব্যবস্থা করে গেছেন। সেই ব্যবস্থার ফলে বহু বহু লোক যে সদ্য সদ্য মুক্তিলাভ করেছিল, ইতিহাসে তার নজির আছে।

ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের এইখানে বিরোধ। মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেয়ে বড়ো কথা মানুষকে সম্পূর্ণ করা; বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে মানুষকে সম্পূর্ণ করা।

কিন্তু যুগ-যুগান্তর ধরে মহাপুরুষেরা মানুষকে ধর্মপ্রাণ করার যে মহৎ চেষ্টা করেছেন, তা নিষ্ফল হবার নয়। ধর্মসংস্কার আমাদের মজ্জাগত। আমরা মানুষকে সম্পূর্ণ করতে চাইনে, সটান মুক্তি দিতে চাই।

এই সংস্কারবশে বিংশ শতাব্দীর মানুষও বিজ্ঞানকে "নূতন ধর্ম" রূপেই গ্রহণ করেছিল এই ভাবে যে এর সাহায্যে অনেক মানুষের অত্যন্ত সহজে সদ্যমুক্তি ঘটবে। সে-যুগে মানুষ ধর্মের দ্বারা নরহত্যা করতো কিম্বা নরহত্যার দ্বারা ধর্ম করতো, এযুগে বিজ্ঞানের দ্বারাই সেই কাজ সে সম্পন্ন করতে চাইল। ধর্মের মার বড়ো মার! ফলে সে যুগের ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রের ওপরেও টেক্কা মেরে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ধর্মযুদ্ধ ঘটে গেল সেদিন—উনিশ শো চোদ্দয়।

কিন্তু বিজ্ঞানের কাজ তো মানুষকে ধার্মিক করা নয়, মানুষকে সম্পূর্ণ করা। কি করে সম্পূর্ণ হওয়া যায় যদি জানে, তাহলেই মানুষ সম্পূর্ণ হতে পারে। পাওয়ার একমাত্র বাধা হচ্ছে না-জানা, এই কারণেই Knowledge is power. জ্ঞান যতক্ষণ কয়েকজনের অধিকার্য ততক্ষণ তা জ্ঞান; কিন্তু যখন তা সকলের অধিকারে—সবার সেবায় লাগার যোগ্যতা লাভ করেছে, তখন তার পরিণতি ঘটেছে বিজ্ঞানে। যেমন জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ভালো—এই জ্ঞান বরাবরই মুষ্টিমেয় লোকের ছিল; কিন্তু যেদিন এই জ্ঞান কেবল ব্যাপক নয় সর্বসাধারণের ব্যবহার্য হলো, সেদিনই এর বিজ্ঞান রচিত হলো।

মানুষকে উদ্ধার করার বাসনা সকলেরই হয়। মহাপুরুষদেরও হয়। কিন্তু ভাগবতশক্তির মহাজন যাঁরা, তাঁদের গলদ এইখানে যে, তাঁরা আধডজন মানুষকে উদ্ধার (?) করেই ভাবেন না যে, সমস্ত মানুষের উদ্ধার করলেন। তাঁরা বলেন, মুক্তি দিলেই হলো না, তার অধিকারী-অনধিকারী আছে। তাঁদের ভাগবতশক্তির সাধনাও ঐ ধারায়—পৃথিবীর মুষ্টিমেয় লোকের জন্য—যারা ভক্ত, যারা অধিকারী। তাঁদের সম্মুখে যেতে এইজনাই বাধে যে, তাঁদের সম্মুখে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ নেই—আছে কয়েকটি মস্ত অ-মানুষ বা অতি-মানুষ।

যাঁরা রাষ্ট্রশক্তির বা অর্থশক্তির মহাজন তাঁদেরো ঐ পন্থা। তাঁরাও বলেন, অর্থ বা ক্ষমতার অধিকার সব মানুষের হতেই পারে না,—তা থাকবে ঐ দুয়েক ডজনের হাতে। কেননা ক্ষমতা ও অর্থ যদি সকলের হাতে ছড়িয়ে যায়, তাহলে ক্ষমতার কোনো অর্থ থাকে না এবং অর্থের ক্ষমতাও লোপ পায়।

কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য, বিজ্ঞানের সম্মুখে রয়েছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ—সর্বদেশের ও সর্বকালের। বিজ্ঞান যে তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে, তার ফলভোগী পৃথিবীর আপামর সাধারণ। তারা ভক্ত হোক বা না হোক বিশ্বাসী হলো বা নাই হলো। বিজ্ঞান মুক্ত হাতে দেয়, কিছুই মুঠোর মধ্যে রাখে না—তার ষোল আনা অধিকারী সবাই। এডিসন যে মুহূর্তে বৈদ্যুতিক আলোক আবিষ্কার করলেন, সেই সময়েই সেই আলো পৃথিবীর সকলের বরাতে এল। জগদীশচন্দ্র যে মৃতসঞ্জীবনী লাভ করেছেন, সে-মৃত্যুঞ্জয় তাঁর একার নয়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের। বিজ্ঞানের চিন্তা নির্বিশেষ মানুষকে নিয়ে—এইখানেই তার সার্থকতার বীজ।

দিলীপকুমার হয়ত বলবেন, এডিসনের ইলেকট্রিক আলোর সুবিধা এখনো মুষ্টিমেয়ের অধিকারে, এখনো সকলের ঘরে এই আলো জ্বলেনি। জ্বলেনি যে তার কারণ সমাজের অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। পদ্ম ফুটলে তার সুরভি তার মধু উপরের মহাজনেরাই বেঁটে নেন, মধু-র ভাগ যাঁদের মধুর ভাগ তাঁদের। যারা নিচে পাঁকের মধ্যে জীবন কাটিয়ে যায়, তার ছিটেফোঁটাও তাদের ভোগে আসে না।

তবু একথা সত্য বিজ্ঞান যা-কিছু আবিষ্কার করেছে বা করবে, একদিন না একদিন সমস্ত মানুষের অধিকারে তা আসবেই—কেননা এই আসার পথে অধিকার-ভেদের কোনো রহস্যময় বাধা এখানে নেই। আর, এইখানেই আশা। বিদ্যুতের আলোও সকলের ঘরে জ্বলবে, অক্ষয় যৌবনও সকলের হবে, ইচ্ছামৃত্যুও হবে সবার। তার সূচনাও দেখা গেছে ইতিমধ্যেই—পৃথিবীর মধ্যে যে দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজ-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছে, সেই দেশে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে যাতে রাশিয়ার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎবাতি জ্বলে, রাশিয়ার সার্বজনিক রাষ্ট্রে তার ব্যবস্থা হয়েছে। পুষ্পকরথ কেবলমাত্র কুবেরের জন্যই ছিল কিন্তু বিজ্ঞানের বাষ্পরথ যখন চলল, তখন সমস্ত মানুষকে নিয়েই চলল।

মানুষকে মুক্তি দেওয়া সহজ, যে-কোনো মহাপুরুষই তা দিতে পারেন। তত্ত্বমসি—এই তত্ত্বমসীর দ্বারা বা অসির দ্বারা বসিয়ে দেবার যা অপেক্ষা! আমি মুক্ত—সোহহং—এই বোধ মাথায় গজালেই হলো কিম্বা গজালের মত হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে দিলেই হয়। এ কাজ মহাপুরুষেই পারেন, কেননা তাঁদের এ-বোধ অতি সহজেই গজায়—যখন মহাপুরুষেও পারেন না, তখন পারে গাঁজায়। আর সত্যি বলতে গাঁজাতেও যেমন মজা, মজাতেও তেমনি মহাপুরুষ!

কিন্তু মানুষকে সুন্দর করাই কঠিন। দেহে মনে জীবনে নিখুঁত সুন্দর ... মহাপুরুষদের তা অসাধ্য। কখনো কদাচিৎ এক-আধ জন মানুষ দৈবাৎ এই সম্পূর্ণতা পেয়েছে। এতদিন বিধাতার খেয়ালের ওপর তা নির্ভর করতো, বিধাতার অনিচ্ছুক হাত থেকে সেই দায়িত্ব বিজ্ঞান নিজের হাতে নিয়েছে এখন। এখন আর বিধাতার পরোয়া না, মহামানবদের তো নয়ই—সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ হবে, এই পরোয়ানা আজ বিজ্ঞানের।

সম্পূর্ণতার গোড়ায় দুটো কথা। এক সম্পূর্ণ হওয়া, আরেক চরিতার্থ হওয়া ; সম্পূর্ণ হওয়া মানে Complete হওয়া, আর চরিতার্থ হওয়ার অর্থ Fulfilled হওয়া। সম্পূর্ণ হতে হলে তার গোড়ায় মানুষকে হতে হবে দেহে সুন্দর, মনে সরস, মস্তিষ্কে বিচারক্ষম ; আর তা হতে পারলেই, তারপর থেকে তার সর্বতোপ্রকাশের পথ সহজ, অবাধ ও স্বচ্ছন্দ। অখণ্ড সুষমায় লীলায়িত তার জীবন—তার জীবলীলা।

সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সুন্দর অবয়ব, বৈজ্ঞানিক

ব্যায়ামের দ্বারা দৈহিক সামর্থ্য দেওয়া সম্ভব। আজই যদি দেহবিজ্ঞানকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যায়, তাহলে 'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে' একটিও দুর্বল কুশ্রী মানুষ থাকবে না, কেবলমাত্র সুন্দর সমর্থ নরনারীর বিচরণক্ষেত্র হবে এই বসুন্ধরা। বিজ্ঞানের সাহায্যে মাত্র তিন পুরুষে পুরুষের এই সৌন্দর্যবিধান সম্ভব যা তিনশো মহাপুরুষের কম্মো নয়।

মস্তিষ্ককে বিচার-বিশ্লেষণে শিক্ষিত ও সক্ষম করে তোলার বৈজ্ঞানিক প্রণালী আছে; বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির সেই সুযোগ প্রত্যেককেই দেওয়া যেতে পারে। মানুষের মনস্তত্ত্বও আজ বিজ্ঞানের নখদর্পণে—মনোবিকলনের দ্বারা মনের সবরকম বিকার ও বিকৃতি আজ দূর করা যায়। মানুষের চিত্ত আর অবচিত্ত-লোকেও বিজ্ঞানের সন্ধানী আলো পড়েছে—মানুষের ইচ্ছাশক্তির মূলে ও সৃজন-প্রতিভার উৎসমুখে যে পরম রহস্য নিহিত, তাও অচিরে নিরাবৃত ও নির্ধারিত হবে, তাতেও কোনো ভুল নেই।

মানুষের মনকে সরস করবার, বিকশিত করবার ভার নিয়েছে সাহিত্য। সব কালের রস, সবকিছুর বোধ সঙ্গে নিয়ে সব দেশের মানুষের সহিত সে সচল। বিজ্ঞানের সঙ্গে তার আত্মীয়তা এইখানে যে সাহিত্যও সমস্ত মানুষের জন্যে। মানুষকে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা যেমন বিজ্ঞানের, তাকে চরিতার্থ হবার প্রেরণা দেওয়াও তেমনি সাহিত্যের। মানুষের সহিত মানুষের মিলনের রহস্যের মধ্যেই মানুষের চরিতার্থতার চাবি। সাহিত্য এই মিলনের পথকে মুক্ত করছে, প্রশস্ত করছে, বিচিত্র করছে—মিলনের প্রশস্তি-গানেই তো সাহিত্য। অবশ্য এই চরিতার্থতার পথে বিজ্ঞানের সাহায্য অনেকখানি—তবু এই গর্ব সাহিত্যিকের যে মানুষের সম্পূর্ণতা সাধনের কাজে সেও বৈজ্ঞানিকের সহযোগী। সমকক্ষই।

বিজ্ঞানের কবল থেকে ভগবানও যে নিষ্কৃতি পাবেন, একথা আমি মনে করিনে। শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত সব মহাপুরুষই মানুষের সহিত ভগবানের যোগসাধনের প্রয়াস পেয়েছেন। দিলীপকুমারের মতে, ভারত চিরদিনই ভগবানকে প্রিয়তম হতে প্রিয়ই মনে করে এসেছে, চিরদিনই অর্জুনের ভাষায় বলতে চেয়েছে—

"পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্!"

কিন্তু হলে কি হবে, সোঢুম্-দেবের হৃদয়ে আমাদের জন্য চিরদিনই No Room! কান্নাকাটি করেও ভগবানের দিক থেকে কোনোদিনই কোনো response পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে ভগবানের কোনো responsibility যা responsibility আছে, এরকম লক্ষণও এ পর্যন্ত তিনি দেখান নি। পৃথিবী দূরে যাক, ভারতকেও যে তিনি কোনোদিন প্রিয়তম মনে করেছেন, এমন পরিচয় মেলে না, বরং বারম্বার প্রহারের দ্বারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনকে ভ্যাবাচ্যাকাগ্রস্ত ধনঞ্জয়ে পরিণত করবারই তাঁর প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছে।

কিন্তু অতিভক্তের অন্ধ ভক্তিকে এড়িয়ে যেতে পারলেও, বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁর [illegible] নেই। বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরীতে ভগবান যেদিন আবিষ্কৃত হবেন, সেইদিনই এই [illegible] [illegible]ানের সত্যিকারের মুক্তি ঘটবে। ভাগবতশক্তি বলে সত্যই যদি কোনো শক্তি থেকে থাকে, একদিন-না-একদিন তাকে বৈজ্ঞানিকের পর্যবেক্ষণে পড়তেই হবে। এবং বৈজ্ঞানিকেরই পর্যবেক্ষণে,—কোনো মহাপুরুষের ভাবদর্শনে নয়। তারপরে বৈদ্যুতিক শক্তিকে মানুষ যেমন নিজের কাজে লাগিয়েছে, ভাগবতশক্তিকেও সেইরকম সে মানুষের সেবায় লাগাবে—সেই-শক্তিকে লক্ষ লক্ষ ভাগ করে, বৈদ্যুতিক শক্তির মত সকলের

সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারায়। কিন্তু সেটা সম্ভব ভগবানের দরজায় উপোস মেনে নয়, ভগবানকেই পোষ মানিয়ে, কব্জা করে। এককালে মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা সে চেষ্টা যে হয়নি তা না, কিন্তু দেখা গেল অনুমন্ত্রণায় হবার নয়। তার ফলে ব্যক্তিক লাভ যদি কারো কিছু হয়েও থাকে, সে-সিদ্ধি সার্বজনিক হয়নি, আর সবার যদি না হলো তো কার হলো? 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' ভগবানকে 'নাই' দেওয়া যায়, আদর করে মাথায় পরে ঠাঁই দেয়াও যায়—কিন্তু সর্বসাধারণের বাজারে এনে—বাজারদরে পাবার পর। তখন হয়ত ভগবানকেই শ্রীঅর্জুনের ভাষায় বলতে হবে—

"হে মানুষ, পিতা যেমন পুত্রকে দেখে, সখা যেমন সখাকে দেখে, প্রিয় যেমন প্রিয়াকে দেখে, তুমিও যেন আমাকে সেই চোখে দেখো।"

কে জানে, সেই শুভদৃষ্টির প্রতীক্ষায়, মহাপুরুষদের আশা-ভরসা ছেড়ে দিয়ে ভগবান এখন বৈজ্ঞানিকেরই মুখ চেয়ে রয়েছেন কি না!